লেখন

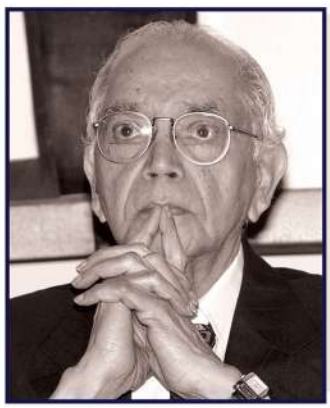

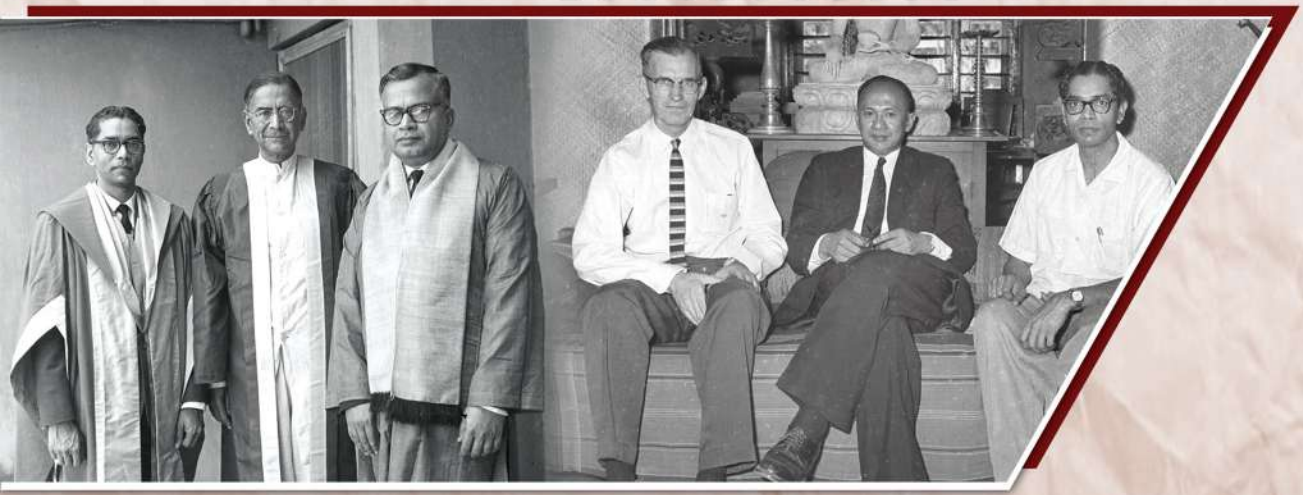

ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট ক্লাব

প্রকাশ বর্ষ ২০২৩-২০২৪

লেখন

ইন্ডিয়ান স্টাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট ক্লাব
৬৬ তম সংখ্যা
প্রকাশ বর্ষ ২০২৩ -২৪

প্রকাশক :

শ্রী অমিত কুমার দাস

সাধারণ সম্পাদক

আই এস আই

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রক :

পি . পি . ইউনিট,

রিপ্রোগ্রাফি ও ফটোগ্রাফি ইউনিট,

পাবলিক রিলেশন্স ইউনিট

ইন্ডিয়ান স্টাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট ক্লাব

২০৩, বি টি রোড , কোলকাতা - ৭০০১০৮

কার্যকরী সমিতি ২০২৩-২৪

সভাপতি

ড. সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

সহসভাপতি

শ্রী রবীন্দ্র কুমার

সাধারণ সম্পাদক

শ্রী অমিত কুমার দাস

সহ-সাধারণ সম্পাদক

শ্রী স্বরূপ কুমার মণ্ডল

কোষাধ্যক্ষ

শ্রী সঞ্জীব দে

সাংস্কৃতিক সম্পাদক

শ্রী শঙ্কর প্রসাদ দত্ত

ক্রীড়া সম্পাদক

শ্রী সঞ্জয় চক্রবর্তী

সদস্য-সদস্যা বৃন্দ

শেখ মহম্মদ শরীফ, শ্রী অজয় কুমার দাস, শ্রী জয়দেব চন্দ, শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ, শ্রী সত্যজিৎ দাসগুপ্ত, শ্রী নয়ন চন্দ্র মাঝি, শ্রী শতদ্রু ঘোষ, শ্রী অমৃত রায় ও শ্রী অনিত্য সুন্দর মান্ডি

লেখন উপসমিতি
২০২৩ -২৪
৬৬ তম সংখ্যা

লেখন উপসমিতি

শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ - আহ্বায়ক

শ্রী সোমনাথ দাস

শ্রী অরিন্দম ঘোষ

ড. অতনু বিশ্বাস

ড. নীলাদ্রি শেখর দাস

ড. তপন কুমার মণ্ডল

শ্রীমতী মোনালি মিত্র পালধী

শ্রী প্রবীর কুমার দাস

শ্রী সমীরণ দাস

শ্রী সুব্রত দাস

শ্রী তাপস বসু

শ্রী দেবব্রত কর্মকার

ড. মৃনাল কান্তি দাস

ড. স্বাগতম দাস

শ্রী শান্তনু বাগ

শ্রী উমেশ সাউ

ড. পার্থ প্রতিম মহান্ত

শ্রী গোপাল মন্ডল

শ্রী সত্যজিৎ দাসগুপ্ত

শ্রী শঙ্কর প্রসাদ দত্ত

শ্রী অনিত্য সুন্দর মান্ডি

শ্রী অমিত কুমার দাস

সম্পাদনা উপসমিতি
২০২৩ -২৪
৬৬ তম সংখ্যা

সম্পাদনা উপসমিতি

ড. নীলাদ্রি শেখর দাস - সভাপতি

শ্রীমতী মোনালি মিত্র পালধী

ড. তপন কুমার মণ্ডল

ড. অতনু বিশ্বাস

শ্রী অমিত কুমার দাস

শ্রী তাপস বসু

শ্রী সত্যজিৎ দাসগুপ্ত

শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষ - আহ্বায়ক

ড. সৌম্যনেত্রা মুনশি

ড. পার্থপ্রতিম মোহন্ত

শ্রী শঙ্কর প্রসাদ দত্ত

ড. স্বাগতম দাস

শ্রী সমীরণ দাস

শ্রী শ্যাম কুমার সাউ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :-

রিপ্রোগ্রাফি ও ফটোগ্রাফি ইউনিট, লাইব্রেরী

প্রচ্ছদের ছবি সংগ্রহ :-

রিপ্রোগ্রাফি ও ফটোগ্রাফি ইউনিট, লাইব্রেরী

সভাপতির কলমে...

'লেখন' এর ৬৬ তম সংখ্যা প্রকাশিত হল। বেশ কয়েক বছরের ব্যবধানের পর এবছর আই.এস.আই. ক্লাবের সদস্যরা আবার সবার কাছে "লেখন" কে পৌঁছে দিতে পেরেছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এর জন্য লেখনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যুক্ত সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আই.এস.আই. ক্লাব বছরের বিভিন্ন সময় নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলোর আয়োজন করে থাকে। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে ঘরে বাইরের কিছু স্বনামধন্য শিল্পী ও ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহন করে থাকেন। এর একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব যে কর্মীদের ও ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পড়ে তা একটু নজর করলেই বোঝা যায়।

আই.এস.আই. ক্লাবের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান "Wards Activities" কর্মীদের সন্তান-সন্ততিরা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে থাকে। এরও একটা সুফল আমাদের চোখে পড়েছে।

এই ক্লাবের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ হল রক্তদান শিবির আয়োজন করা, যা বছরে একবার এই প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহন প্রশংসনীয়। এর ফলে আই.এস.আই.-এর কর্মচারী ছাড়াও সমাজের অন্যান্য মানুষ সমানভাবে উপকৃত হন।

এই প্রতিষ্ঠান গবেষনা, শিক্ষকতা, সাহিত্য চর্চা, সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ও খেলাধূলা ইত্যাদির মাধ্যমে যে একটি সার্বিক সুস্থ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা করে চলেছে, তাতে আই.এস.আই. ক্লাব ও লেখন-এর যে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

"লেখন" পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক এই কামনা করি।

সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

সভাপতি

সম্পাদকের কলমে...

আই. এস. আই. ক্লাব তার ৬৬ তম বছরে পদার্পণ করল। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমাদের ক্লাবের কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মীদের এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা ও আন্তরিকতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্লাবের কর্মকাণ্ডে আই. এস. আই.-এর প্রশাসনিক সহযোগিতা ছিল সত্যিই অতুলনীয়। অন্যান্য বছরের মতো এই বছরেও ক্লাবের মুখপত্র **'লেখন'** প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

ক্লাবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সকল সদস্য, বিশেষত ছাত্র-ছাত্রী এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের নানাবিধ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলা এবং প্রতিভা বিকশিত করার সুযোগ তৈরি করা। অল্প সময়ের মধ্যে কার্যকরী সমিতির সদস্যরা তাদের অভিজ্ঞতা এবং একাগ্র প্রচেষ্টার মাধ্যমে ক্লাবের সমস্ত অনুষ্ঠানে নতুন মাত্রা যোগ করতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের এই ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস কতটা সফল হয়েছে, তার মূল্যায়ন করবেন আপনাদের মতো শুভানুধ্যায়ীরা।

আমরা অত্যন্ত তৃপ্ত যে, বিভিন্ন স্তরের কর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ এবং 'লেখন'-এ তাদের অবদানে ক্লাবের কর্মকাণ্ড সমৃদ্ধ হয়েছে। বিগত বছরের 'লেখন'-এর প্রতি পাঠকের সমাদর আমাদের উৎসাহিত করেছে। এ বছরের সংখ্যায় সদস্যদের সাহিত্যচর্চা, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ এবং নানা রচনার মাধ্যমে 'লেখন'-এর মান আরও উন্নত করার চেষ্টা করেছি। আমরা আশা করি, বিষয়বস্তু ও মুদ্রণের মানের ক্ষেত্রে **'লেখন'** তার দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে।

সম্পাদকের দপ্তরে জমা পড়া সব লেখা স্থানস্বল্পতা বা অন্যান্য কারণে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। যদি কোথাও বানান ভুল বা অন্যান্য ত্রুটি থেকে থাকে, তবে তা মার্জনীয়। আমরা আশা করি, আগামী সংখ্যায় আরও উন্নত ও সার্থক রচনায় 'লেখন' সমৃদ্ধ হবে।

শ্রী অমিত দাস
সম্পাদক

কৃতজ্ঞতা স্বীকার.....

"লেখন" ৬৬ বছরে পদার্পণ করল। পৃথিবী জুড়ে করোনা মহামারী (Covid-19) চলছিল। বিগত কয়েক বছর ধরে আমরা আর্থিক অনটনের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছি। তাই আমরা যথা সময়ে বার্ষিক "লেখন" প্রকাশিত করতে পারিনি, তার জন্য আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। এই সময়ের মধ্যে আমরা যে সমস্ত সহকর্মীবৃন্দকে হারিয়েছি তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি ও তাদের পরিবার বর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

প্রতি বছরের মত এবারেও ক্লাবের রক্তদান শিবির, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ,খেলাধুলো, বিজয়া সম্মিলনী ও আলোচনা সভার আয়োজন করেছি। এছাড়াও আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করেছি। শ্রদ্ধেয় Swami Sarvapriyananda মহারাজের–এর Motivational talk আয়োজন করেছি। আই. এস. আই.-এর ছাত্র-ছাত্রী, সমস্ত স্তরের কর্মীবৃন্দ ছাড়াও সমাজের অন্যান্য গুনিমানুষের অংশগ্রহন উল্লেখযোগ্য ছিল। বছরের একদিনের বনভোজনের আয়োজন করা, যা ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মীদের পরিবার বর্গের যোগদান অত্যন্ত সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন করা হয়েছে। এই সহযোগিতা এবং অনুপ্রেরনা যদি অক্ষুন্ন থাকে, তাহলে আগামী দিনেও আমরা ক্লাবের মধ্যে দিয়ে আরও অনেক কিছু পাবো।

ক্লাবের সারা বছরের যে কর্মসূচী নিয়েছি এবং তা যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করেছি। "লেখন" পত্রিকার মধ্যে কিছু অনিচ্ছকৃত দোষ-ত্রুটি থাকলে আমাদের মার্জনা করবেন।

পরিশেষে, যে সমস্ত সহকর্মী তাদের মূল্যবান সময় দিয়ে "লেখন" কে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের সকলকে ক্লাবের তরফ থেকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

বিশ্বজিৎ ঘোষ	**শংকর প্রসাদ দত্ত**	**অমিত দাস**
লেখন আহ্বায়ক	সাংস্কৃতিক সম্পাদক	সাধারন সম্পাদক

সূচীপত্র

GLIMPSES OF THE LIFE AND THE WORK OF C.R.RAO (1920-2023)	Probal Chaudhuri	11
প্রফেসর সি আর রাও - আলোকচিত্রের এক নিবেদিতপ্রাণ	তাপস বসু	16
বন্দীর দ্বন্দ্ব	অমিত বিশ্বাস	18
শব্দের সরোবর	অমৃত রায়	23
শৈশবের স্মৃতি	অমৃত রায়	24
ফের শহরে	অনির্বাণ চক্রবর্তী	26
থাকবো আমি গল্প হয়ে	অনীশ চক্রবর্তী	27
Impediments of the Imperial Institute	Anushka De	29
রূপকথার গপ্পো	অর্ঘ্য মন্ডল	31
জিয়নকাঠি	অরিন্দম ঘোষ	36
উপহার	অরিন্দম ঘোষ	37
কিছু পুরাতন স্মৃতি	আশীষ কুমার চক্রবর্ত্তী	50
শ্যামবাজার	আশিস কুমার চক্রবর্তী	71
The Essential Role of Museums & Archives in Research	Avik Kumar Das	75
দুপুরবেলায়	অভিরূপ সরকার	77
Influence of the 'Holy Trio' of the Ramakrishna Order on a Student's Life: A Personal Reflection on Spirituality in Everyday Living	Ayoti Banerjee	78
অন্য মহাভারত	ভবতোষ চন্দ	81
নিউ নর্মাল	দীপাঙ্কনা ব্যানার্জী	105
জীবনের অন্দরমহল	দীপরঞ্জন পাল	107
অনন্ত আলোকমালা	নীলাদ্রিশেখর দাশ	115
भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रो. प्रशांत चंद्र महालनोबिस एवं समाज के प्रति उनके अवदान	प्रशांत तिवारी	120
জীবন্ত ঈশ্বর	প্রিয়জিৎ সেন	128
উত্তরণের পথে - শূন্য থেকে এক	রবীন্দ্র নারায়ণ দাস	130
ISI: সেকাল – একাল	সন্দীপ মিত্র	138
Sights and Sounds of Japan	Sarbani Palit	142
ইচ্ছে	সৌমেন্দ্র নাথ ভূঁইয়া	155
Night	Soumyanetra Munshi	156
Was	Soumyanetra Munshi	158
একটি প্রকৃতি পর্যটন শিবিরের গল্প	সৌভিক তরফদার	161
জন্ম এবং মৃত্যু	শুভময় মৈত্র	163
বহুরূপী	সুচিত্রা বালামী	167
The issue of Identity in Asian-American Diasporic Fiction with special reference to Bharati Mukherjee	Suman Rudra	169
বিশুদ্ধ গণিত ও যন্ত্রমেধা : এক নতুন মেলবন্ধনের গল্প	স্বাগতম দাস	175
বৃত্ত	তন্ময় দাস	182
Poems and Songs and Much More: Celebrating Womanhood	Soumyanetra Munshi	189
মূলস্রোত	কৌশিকী রায়	192

अधिकार और समावेश महिलाओं की जंग की कहानी	केशव सावर्ण	196
Juggling Responsibilities and Shaping the Society: A Tribute to All Working Mothers and A Call for Societal Change	Neelarka Roy	199
তোমাকে দেখেছি যেমন	সত্যজিৎ নস্কর	203
Silenced Wings: Echoes of Women's Struggles	Sevantee Basu	204
ফটোগ্রাফি ও কৃত্রিম বুদ্ধি সৃজনশীলতার ভবিষ্যৎ		206
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪	তাপস বসু	
Results of 69th & 70th Annual Athletics Sports		211
LIST OF BLOOD DONORS, 2023-24		229

GLIMPSES OF THE LIFE AND THE WORK OF C.R.RAO (1920-2023)

Probal Chaudhuri, Statistics and Mathmetics Unit

C.R.Rao was born on 10th September, 1920, in Huvvina Hadagalli, now a small town in Karnataka, but originally in the Madras Province of British India. His father C.D. Naidu was an inspector of police and his mother Lakshikanthamma was a housewife. Rao was the 8th child of his parents and following a general custom in South India, as mentioned by Rao himself in his autobiography, he was named Radhakrishna after Lord Krishna, who, according to the mythology, was the 8th child of his parents.

Rao graduated with a degree in Mathematics from Andhra University in 1940, but failed to obtain a scholarship to do research in the same university because his application came in late. He then came to Calcutta (now Kolkata) to appear for an interview for the position of a mathematician at the army survey unit, and was not selected for that job either. While in Calcutta, he stayed in a South Indian hotel and met one Subramaniam, who took him to Indian Statistical Institute (ISI), which was then located in a couple of rooms in the physics department of the Presidency College. Later, when Calcutta University started a Master's degree programme in Statistics in 1941 under the headship of Prasanta Chandra Mahalanobis, Rao joined that as a student. He passed the MA degree examination in 1943 with a first class and secured the first rank. Rao was one of the first five students, who graduated from Calcutta University with a Master's degree in Statistics.

In one of his autobiographical essays, Rao gave an entertaining description of that postgraduate degree programme that is worth quoting here. "*None of the teachers had any experience in*

teaching Statistics and, further, they were as ignorant as the students in some areas of Statistics. As there were no textbooks on Statistics, the teachers had to learn by reading original papers and then teach. The courses given in the first two years benefitted the faculty as well as the students."

Rao joined ISI as a statistical apprentice in 1943 with a salary of Rs. 250 per month and decided to settle down in the city of Calcutta. He started teaching soon after joining the institute, and it was in the course of his interactions with the students that he co-invented his famous Cramér–Rao Lower Bound and Rao–Blackwell Theorem.

At ISI, one of Rao's several responsibilities was the analysis of anthropometric data on different castes and tribes collected during the decennial census of the Indian population in 1941. In 1946, J.C.Trevor, a Cambridge University anthropologist, requested ISI to depute a scholar, who would analyse some anthropometric data collected by the Cambridge University Anthropological Museum. Rao was deputed, and he arrived in England in August 1946. According to Rao, he sailed for England by a steamship named *Andes* that was carrying mostly Italian prisoners of the Second World War from Mumbai to Naples. The Italian soldiers were captured in Africa and detained in India.

Soon after arriving in Cambridge, Rao took admission as a research scholar at King's College. This was in addition to Rao's assignment at the Anthropological Museum at Duckworth Laboratory at Cambridge. Ronald Fisher was the Balfour Professor of Genetics at Cambridge at that time. Rao requested Fisher, whom he met in 1944, to accept him as a PhD student. Fisher agreed and suggested that he should work in the genetics laboratory to gain experience with breeding of mice for linkage studies.

On the other hand, Rao's assignment at the Anthropological Museum involved analysis of measurements taken of skeletal materials excavated by a British expedition in the ancient graves in Jebel Moya in North Africa. According to Rao, he kept himself busy in Cambridge dividing his *"time between bones and stones at the University Anthropological Museum and mice at Whittingham Lodge, the official residence of the Balfour Professor of genetics converted into a genetics laboratory"*.

The general theme of Rao's PhD research was discriminant analysis using multivariate data, and it was deeply connected with Fisher's work on discriminant analysis. Towards the end of his two-year-long stay at Cambridge, Rao met H.E. Daniels, who asked him to submit a discussion paper to the Royal Statistical Society based on his PhD research. The paper that was submitted by Rao was titled *"The Utilization of Multiple Measurements in Problems of Biological Classification"*. Rao's paper was accepted for a discussion at the Royal Statistical Society, and it was read before the Research Section of the society in 1948. It was also published in the *Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Methodological)* in the same year.

Rao extended Fisher's discriminant analysis for more than two populations. He also established the Bayes risk optimality of Fisher's linear discriminant function for multivariate Gaussian populations. Another significant part of Rao's paper is the development of a graphical tool for visual representation of multivariate populations by projecting them into some appropriate lower dimensional spaces so that observations from different populations cluster into groups of similar populations.

Rao's 1948 paper is a fundamental contribution in discriminant analysis that has influenced several generations

of research in multivariate statistics. While discussing his PhD research, Rao once wrote, *"For my PhD thesis, I wanted a theoretical topic. I asked Fisher to suggest some problem on which I could work. He said: 'Problem must be yours and I shall help you if I can'. I wrote my PhD thesis on classification problems extending Fisher's work on the discriminant function to more than two populations, which arose in my work at the museum. I did not take much help from Fisher. Finally, when I showed him the thesis, he said, 'The problem was worth investigating'."*

After returning to India from Cambridge in the August of 1948, Rao joined the Indian Statistical Institute as a professor, when he was only 28 years old. At that time, ISI was getting reorganised as the Government of India agreed to give a recurring grant to support the research and training activities of the Institute. Prior to this government grant, ISI depended mainly on money earned through project work involving large scale sample surveys. Rao was appointed the Head of the Research and Training School of ISI, and he created an internationally renowned teaching and research programme in statistics. After the death of Mahalanobis, Rao was made the Director and Secretary of ISI, a designation which Mahalanobis had as the Chief of the Institute. He gave up that position in 1976 and was appointed as the Jawaharlal Nehru Professor of ISI. Rao gave up this professorship and retired from ISI in 1984. In 1985, he became a National Professor.

Other distinguished positions that C.R.Rao held included Distinguished Professorship at University of Pittsburgh and the Eberly Professorship at Pennsylvania State University, both in the US. In 2002, Rao established the C.R.Rao Advanced Institute of Mathematics, Statistics, and Computer Science in Hyderabad.

Rao's contributions to statistical theory and applications have become part of the undergraduate and postgraduate curricula in statistics, econometrics, electrical engineering, and many other disciplines at most universities worldwide. His work has had a profound influence on the theory and application of statistics in diverse fields.

Rao was the recipient of many prestigious awards, including the US National Medal of Science awarded by the President of the US, and the Padma Vibhushan awarded by the Government of India. He was a Fellow of the Royal Society, and served as the President of the International Statistical Institute, the Institute of Mathematical Statistics, and the International Biometric Society.

Rao passed away in Buffalo, New York on 22nd August, 2023.

****

প্রফেসর সি আর রাও - আলোকচিত্রের এক নিবেদিতপ্রাণ

তাপস বসু, রিপ্রো ফোটো ইউনিট, লাইব্রেরী

প্রফেসর সি আর রাও সম্পর্কে কিছু বলার সাহস আমার নেই। এখানে আমি তাঁর আলোকচিত্রের প্রতি গভীর ভালোবাসা নিয়ে কিছু স্মৃতি ভাগ করতে চাই। আমার আইএসআই-তে যোগদানের দিন থেকে শুরু করি এই গল্প।

২০০০ সালের মে মাসে আইএসআই-তে যোগদান করি। এর আগে সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলাম, তাই আইএসআই সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান ছিল এবং প্রফেসর সি আর রাও-এর নামটাও শুনেছিলাম। যখন আইএসআই থেকে নিয়োগপত্র হাতে পেলাম, "রাও" শব্দটি দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম। তখন ভাবতেই পারিনি যে এটি প্রফেসর সি আর রাও নন, বরং প্রাক্তন পরিচালক প্রফেসর এস বি রাও-এর স্বাক্ষরিত নিয়োগপত্র।

আইএসআই-তে যোগদানের পর থেকেই মনে এক দুর্বল ইচ্ছে জেগেছিল—একবার যদি প্রফেসর সি আর রাও-এর সাথে দেখা হয়। বহুদিন পর সেই সুযোগ আসে। সেবার আমি একটি কনফারেন্সের ছবি তুলতে গিয়েছিলাম। সেখানেই প্রথম তাঁকে সামনে থেকে দেখি। মনের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে যেই ছবিটি ছিল, বাস্তবের তিনি তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ভাবতে পারিনি তিনি এতটা সাধারণ মানুষ। তাঁর উপস্থিতি অতি সাধারণ হলেও তাঁর ব্যক্তিত্বের ব্যাপ্তি ছিল বিশাল।

ছবি তুলতে গিয়ে দেখি, যখনই আমি শাটার ক্লিক করছি, তিনি যেন হালকা থমকে যাচ্ছেন। কিছুদিন পর বুঝলাম, তাঁর ফটোগ্রাফির প্রতি এক গভীর আকর্ষণ ছিল; ক্যামেরার ঝলকানির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভেতরে এক অনন্য বদল লক্ষ্য করতাম। এরপর ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। তখন উপলব্ধি করি, ফটোগ্রাফির প্রতি তাঁর ভালবাসা কতটা গভীর।

তিনি বাংলায়ও অনর্গল কথা বলতেন, যা দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। প্রথম আলাপেই তিনি আইএসআই-র পুরনো দিনের ছবিগুলোর সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হলেন, এমনকি যখন তিনি পরিচালক ছিলেন বা পি সি এম-এর সময়ের ছবি

রয়েছে কি না তাও জানতে চাইলেন। একদিন তিনি হঠাৎ আমাদের ইউনিটে এসে পুরনো ছবিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তির নাম এমনভাবে উচ্চারণ করলেন, যেন তাঁর মনের মণিকোঠায় সবই অক্ষরে অক্ষরে লেখা আছে।

তাঁর আগ্রহ দেখে একদিন তাঁর বিভিন্ন ছবি দিয়ে একটি অ্যালবাম তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিই। অনেক ভাবনার পর অ্যালবামটি সম্পূর্ণ করি এবং তা আইএসআই লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রাখি। কিছুদিন পর তিনি তাঁর পরিবারসহ কলকাতায় এলে তাঁকে সেই অ্যালবামটি উপহার দিই। তাঁর মুখের সেই খুশি, সেই আবেগ, আমি আজও ভুলতে পারি না। তাঁর পরিবারের সকলেও খুশিতে একেকটি কপি নিয়ে গেলেন।

পরবর্তীতে তাঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। গত বাইশে আগস্ট ২০২৩, তাঁর প্রয়াণ সংবাদ পাই। শুনেছি, তাঁর সহধর্মিনীও কিছুদিন আগেই আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আমাদের আইএসআই-এর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কফিনবন্দি তাঁর শেষ ছবিগুলো দেখে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। আশা করি, যেখানেই থাকুন, ভালো থাকবেন, আর আকাশ থেকে আমাদের রিপ্রো ফোটো ইউনিটের সব ছবিগুলো হাসিমুখে দেখতে থাকবেন।

"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে,
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে হৃদয়ে
রয়েছ গোপনে।"

****

C.R. Rao: Warm and Treasured Memories of a Legend

T Kitagawa, Kyushu University, Japan with P C Mahalanobis, C R Rao and other ISI workers during his visit to ISI in December 1957

A. N. Kolmogorov with C.R. Rao and P.C. Mahalanobis at the Special Convocation on 28.04.1962

P.C. Mahalanobis delivering Annual Review at the Second Convocation.
L-R: B.P. Adhikari, S. Chaudhuri, C.R. Rao, A. Linder, S.N. Bose

S.N. Bose delivering presidential address at the Second Convocation on 14.04.1963

P.C Mahalanobis and C.R Rao with the awardees at the Fifth Convocation

Sixth Convocation. L to R: Harry Campion C.R Rao, S.N Bose, P.C Mahalanobis and others

The Special Convocation on 18.12.1974. L to R: C.R Rao, R.C Bose, Mrs. Mahalanobis, J Neyman and Mrs. Rao

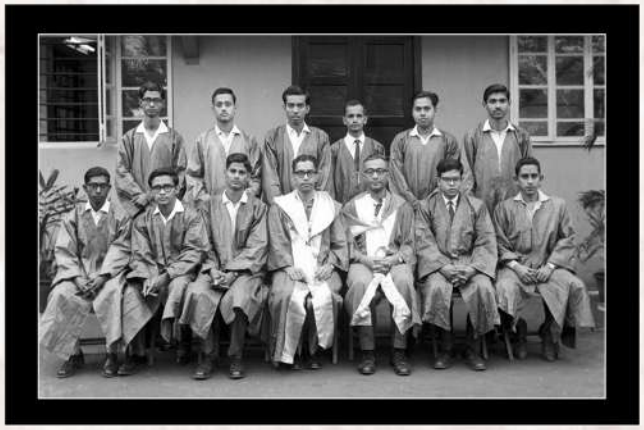

Dr. C R Rao present in annual sports in 1974

C.R. Rao: Warm and Treasured Memories of a Legend

বন্দীর দ্বন্দ্ব

অমিত বিশ্বাস, এস. কিউ. সি এ্যন্ড ও আর, চেন্নাই

তানিয়া এবং মারিয়া মিলে স্বাধীনতা ব্যাংকের সঙ্গে জালিয়াতি করেছে বলে মিডিয়া এমন প্রচার চালিয়েছে যে প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষ দুপক্ষই একথা বিশ্বাস করে দুজনের কঠোর শাস্তি দাবী করে চলেছে। পুলিশ তাদের গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক অনেক চেষ্টা করেও তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করার মতো বিশেষ কোনো প্রমাণ জোগাড় করতে পারেনি। সুতরাং তাদের নির্ভর করতে হবে অপরাধীদের স্বীকারোক্তির উপর। দুজনকে দুই ভিন্ন কুঠুরিতে রাখা হয়েছে, স্বভাবতই তাদের একের অপরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

এখন স্বীকারোক্তির অভাবে অন্য একটি স্বল্প অভিযোগে তাদের খুব বেশী হলে এক বছরের দণ্ড দেওয়া যেতে পারে। যদিও কৃত অপরাধটিতে দশ বছর পর্যন্ত কারাবাস হতে পারে। এমতাবস্থায় একে অপরের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার উপর পুলিশ এবং উকিলপক্ষ সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সুতরাং স্বাধীনতা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তরফে এক চতুর অভিশংসক (prosecutor) উকিল বা কৌঁসুলি আলাদাভাবে তাদের দুজনের সামনেই নিম্নলিখিত প্রস্তাব রাখলেন।

তোমার কাছে দুটি বিকল্প আছে। তুমি নীরব থাকতে পারো অথবা অন্যের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হতে পারো। তুমি যদি রাজসাক্ষী হও এবং তোমার সহযোগী যদি নীরব থাকে, তাহলে পুলিশ তোমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনবে না এবং তোমার সহযোগী পূর্ণ সাজা, অর্থাৎ দশ বছর কারাবাস করবে। কিন্তু একইভাবে যদি তোমার সহযোগী রাজসাক্ষী হয় এবং তুমি নীরব থাকো, তাহলে তুমি পূর্ণ সাজা ভোগ করবে, তোমার সহযোগী মুক্তি পাবে। যদি দুজনেই একে অন্যের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দাও, তখন যদিও দুজনেই সাজা পাবে কিন্তু আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে তোমরা নূন্যতম সাজা পাবে এবং তাড়াতাড়ি জামিনের বন্দোবস্ত করা হবে। কিন্তু যদি তোমরা দুজনেই নীরব থাকো, প্রশাসনের কোনো উপায় থাকবে না, আগ্নেয়াস্ত্র রাখার

স্বল্প অভিযোগ এনে অল্প সাজার পরে দুজনেই মুক্তি পাবে।

নীচের ছকটিতে তানিয়া এবং মারিয়ার সাজা দেওয়া হলো (তানিয়া, মারিয়া) এই অনুসারে। দেখলেই, নীচের অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে, বোঝা যাবে।

তানিয়া☞মারিয়া/👇	রাজসাক্ষ্য	নীরব
রাজসাক্ষ্য	5, 5	0, 10
নীরব	10, 0	1, 1

এমতাবস্থায় দুজনেই উভয়সঙ্কটে পড়লেন এবং তাদের দ্বন্দ্ব হয়ে দাঁড়ালো এটাই যে, অন্যজন যাই করুক না কেন, এককভাবে, রাজসাক্ষী হওয়াটাই তার পক্ষে লাভজনক, নীরব থাকার তুলনায়। অদ্ভুত ব্যাপার এটাই যে, দুজনেই রাজসাক্ষী হলে, তার ফল দুজনেই নীরব থাকার তুলনায় যথেষ্ট খারাপ। দ্বন্দ্ব এটাই যে এককভাবে যা সুবিধাজনক মনে হয়, তার তুলনায় সমষ্টিগত সুবিধা প্রত্যেককে বেশী সুবিধা এনে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

তানিয়া নীরব থাকার তুলনায় রাজসাক্ষী হলে তার সাজা কমবে ১০ থেকে ৫ বছর (যদি মারিয়া রাজসাক্ষী হয়) অথবা (যদি মারিয়া নীরব থাকে) এক বছর জেলের তুলনায় মুক্তি পাবে। সু তরাং মারিয়া কি করবে তা অজানা থাকার পরিপ্রেক্ষিতে তানিয়ার পক্ষে রাজসাক্ষ্য হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত।

বন্দীর দ্বন্দ্ব একটি হতবুদ্ধিকর পরিস্থিতি তৈরী করে দুই বন্দীর কাছে, ধাঁধাটি তুলে ধরে ব্যক্তিস্বার্থ এবং সমষ্টিগত স্বার্থের সংঘর্ষ। সমাজে এমন বহু পরিস্থিতি থাকে যেখানে ব্যক্তিস্বার্থ সম্পূর্ণ যৌক্তিক বলে মনে হয়, কিন্তু সমষ্টিস্বার্থ হয়তো সমষ্টির প্রত্যেককে আরো লাভজনক বিকল্প দিতে পারতো। ভারতীয় রাস্তার যানবাহন চলাচলের ব্যাপারটাই দেখা যাক। যখন কোনো ট্রাফিক সিগন্যাল লাল থাকে, তখন পরে আসা বহু ছোটোখাটো বাহন চালকেরা চেষ্টা করে থাকেন, যেন তেন প্রকারেন একে ওকে পাশ কাটিয়ে, কোনো ফাঁক ফোকর দিয়ে গলে সকলের আগে গিয়ে দাঁড়াতে, সে যদি স্টপ লাইন পেরিয়ে দাঁড়াতে হয় তাও সই। এতে যে রাস্তা খোলা আছে তার ট্রাফিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ওই বরাদ্দ সময়টুকুতে যত যানবাহন যেতে পারতো, তা সম্ভব হয় না। (sub-optimal) যখন সিগন্যাল লাল থেকে সবুজ হয়, ততক্ষণে, সামনে জ্যাম হয়ে যাওয়ার কারণে, আপনি

যে রাস্তায় আছেন সেখানেও যানবাহন চলাচল শুরু হয় আস্তে এবং গতি বাড়াতে সময় লাগে। আমরা প্রায় প্রত্যেকেই প্রতিদিন, এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে থাকি বন্দীর দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে।

লকডাউন বা কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় যে বাজারে থেকে খাবার দাবার উধাও হয়ে যায় এবং কিছু ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে খাবার মজুত করেন, এটাও এই একই প্যারাডক্স এর কারণে।

নিপীড়ক কোনো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেও আমরা এই একই দ্বন্দ্বে ভুগি। প্রতিবাদ করলে, নিপীড়ন বাড়তে পারে, এই আশঙ্কা আমাদের বিদ্যমান নিপীড়ন সয়ে যেতে বাধ্য করে। সবাই মিলে প্রতিবাদ করলে যে আমাদের নিপীড়ককে আমরা পরাস্ত করতে পারি, এই বিকল্পটি আমাদের কাছে যৌক্তিক মনে হয় না। আমরা সকলেই বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন কুঠুরিতে বন্দী। মুক্তির একমাত্র উপায় যে কোনো পস্থিতিতে সমষ্টিগত স্বার্থের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সমষ্টিগত শপথ, এবং তা মেনে চলা, যাতে অন্য সকলের আস্থা জন্মায় এবং তারাও একই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রাণিত হন।

মানুষের এই আপাত স্বার্থপরতার যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, তাই প্রমাণ করেছিলেন, জন ন্যাশ, যিনি ১৯৫০ সালে মাত্র বাইশ বছর বয়সে একটি ২৮ পাতার থিসিস লিখে জমা দেন প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে এবং পরবর্তী কালে এই কাজকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। এর ফলস্বরূপ ১৯৯৪ সালে তিনি অর্থবিজ্ঞানে নোবেল সম্মানে অভিষিক্ত হন। 'এ বিউটিফুল মাইন্ড' সিনেমাটি মনে আছে নিশ্চই? এই বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল লেখকের, এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে। হয়তো জানেন যে ইনি বেশ কিছুকাল, অন্তত কুড়ি বছর মানসিক অবসাদ তথা স্কিজোফ্রেনিয়াতে ভুগেছেন। ২০১৫ সালে ন্যাশ এবং তার স্ত্রী নিউ জার্সিতে একটি পথ দুর্ঘটনায় মারা যান।

প্রশ্ন রয়ে যায়, জন ন্যাশের তত্ত্বের বিরুদ্ধে গিয়ে, সব সময় সমষ্টিগত চিন্তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে, আমরা কি সেই সুখকর ফল ভোগ করতে পারবো? নাকি আমরা ওই

ভিন্ন কুঠুরিতে বন্দী থেকে, দ্বন্দে ভুগে, নিজেদেরই স্বার্থপরতার স্বীকার হবো? একথা মনে হতেই পারে যে ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়াম সাম্যবাদের বিপক্ষে একটি পুঁজিবাদী চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ। এ বিতর্কে আমাদের অবস্থান যেখানেই হোক না কেন, এর বৈজ্ঞানিক দিক নিয়েই এই আলোচনা।

একে অপরের স্বার্থপরতার স্বীকার হওয়ার থেকে বাঁচার জন্য সরকার বা পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা বিশেষ কিছু জায়গায়, নিয়ম প্রণয়ণ করে থাকেন, যাতে আপনার সুপ্ত বাসনা থাকলেও, আপনি নিজের স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় অপরকে স্বীকার বানাতে না পারেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাতে পারে, আমাদের রেশন ব্যবস্থা। সেখানে আপনি আপনার প্রয়োজনের তুলনায় বেশী কিনতে পারবেন না। এই রকম রেশন ব্যবস্থা জল বিতরণের ক্ষেত্রে এমনকি নোটবন্দীর পরে ব্যাংক থেকে টাকা তোলার ক্ষেত্রেও আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি।

পন্ডিচেরীর ওই ফন্দীবাবু বিরাট ব্যবসায়ী। তিনি এক বেসরকারি ব্যাঙ্কে গিয়ে বললেন, আমি আপনাদের ব্যাঙ্কে অনেক টাকা রাখতে চাই এবং তাও অনেকদিন ধরে। এর থেকে সুখবর ব্যাঙ্ক ম্যানেজার শিকারবাবু কোনোদিন শোনেননি। এবার বোধ হয় তার পানিসমেন্ট পোস্টিং শেষ হয়ে বাড়ীর কাছের ব্যাঙ্কে পৌঁছে গেলেন। তিনি উৎফুল্ল হয়ে বললেন, নিশ্চই, নিশ্চয়ই স্যার, এই ফর্মটাই শুধু সই করে দিন। আমরা বাকিটা ভর্তি করে নেবো, স্যার। ফন্দীবাবু তখন বললেন, যে তার শর্ত আছে। শিকারবাবু একটু দমে গিয়ে জানতে চাইলেন, হ্যাঁ, বলুন স্যার।

ফন্দীবাবু : আমাকে কিন্তু এক শতাংশ বেশী সুদ দিতে হবে।

শিকারবাবু : হ্যাঁ, স্যার। লং টার্ম এফ-ডিতে তো তো আপনি এক শতাংশ বেশীই পাবেন।

ফন্দীবাবু : না, আমাকে তার থেকেও এক শতাংশ বেশী দিতে হবে।

শিকারবাবু কাচু মাচু মুখ করে বললেন, তা কি করে হয় স্যার! আমাকে তো কোম্পানির কাছে পুরো ব্যবসাটার হিসাব দিতে হবে....

ফন্দীবাবু : তাই তো বলছি, অন্য ছোটোখাটো খুচরো বিনিয়োগকারীদের সুদ

একটু কমিয়ে দিন।। টোটালটা মিললেই তো হলো।

শিকারবাবু, কঠিন মুখ করে সাফ জানিয়ে দিলেন, না স্যার, তা করতে পারবো না! আমার হাত পা বাঁধা!

ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের এই হাত পা বেঁধে দেওয়াটাই, সমষ্টিগত স্বার্থের পক্ষে প্রণয়িত একটি নিয়ম, যা লঙ্ঘন করে আপনি নিজের স্বার্থে, ন্যাশ ইকুইলিব্রিয়ামের দিকে পা বাড়াতে পারবেন না।

লেখক পরিচিতি: ড. অমিত বিশ্বাস ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটের চেন্নাই কেন্দ্রে কর্মরত। আই-এস-আই-এর সঙ্গে তার সম্পর্ক শুরু হয়েছিল ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে B.Stat(Hons) কোর্সের ছাত্র হিসাবে। এই সম্পর্কে তারপর আর কোনো দিন ছেদ পড়েনি। পারিপার্শ্বিক সমাজে তিনি অবদান রেখেছেন এবং রাখতে চান, তবে তা নীতির বিনিময়ে নয়। বাংলা এবং ইংরাজী দুই ভাষাতেই তিনি লিখে থাকেন কল্পকাহিনী তথা তথ্য ও সমাজবিজ্ঞানভিত্তিক সাহিত্য। ছাত্রাবস্থায় তিনি ISI Club এর Executive Committee র সদস্য ছিলেন এবং ফিল্ম সাব-কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

****

শব্দের সরোবর

অমৃত রায়

তোমার স্মৃতির রঙে রঙিন এ জীবন,
শৈশবের আলপথে হারিয়ে যাওয়া দিনের ডাক,
প্রকৃতির কোলে বসে যে গল্পগুলো বলেছিলাম,
সেগুলোই আজ শব্দ হয়ে ফিরে আসে বাক্।

পথের ধুলোমাখা গন্ধে মন জুড়ে বসে,
এক ফোঁটা শিশিরের মতো স্নিগ্ধতা আনে বুকে,
চেনা গাছের ছায়ায় বসে শুনি,
সেই সুরে মাখা জীবনের কথা অতি নীরবে। -

নদীর ধারে বসে ভাবি, কেমন ছিলাম একদিন,
সেই শিশিরের মতো নিস্তরঙ্গ, সরল,
আজও সেই স্রোত বয়ে চলে চুপিসারে,
হৃদয়তটে বাজে স্মৃতির সুমিষ্ট ঝংকারে।

প্রকৃতির কোল থেকে শিখেছি মায়ার পাঠ,
পাখিদের ডাকে মিশে আছে ব্যাকুলতা,
পাহাড়ের কোল থেকে ওঠা সোনালী আলোয়,
আজও দেখি স্বপ্নের সাজানো হাতছানি।

লিখে চলি নিরন্তর, এই শব্দের সরোবর,
ভালোবাসা, বেদনা, হাসিকান্নার মিশ্রণ-,
তুমি হয়ে আছো এই কাব্যের অদৃশ্য আলো,
তোমার স্মৃতি ।"লেখন" ভরা গল্পে সৃষ্টি করেছি-

শৈশবের স্মৃতি

অমৃত রায়

শৈশবের দিনগুলি হাওয়ার মতন,
মিষ্টি বাতাসে উড়ে যাওয়া সোনার প্রহর,
মায়ের কোলে ভরানো স্বপ্নের ঘুম,
বাবার কাঁধে উঠেই আকাশ ছোঁয়ার মরশুম।

হলুদ রোদ্দুরে খেলে যেতাম সারাদিন,
দিদার গল্পে ছিল সবুজ স্বপ্নের বিন্দু বিন্দু চিন।
ছোট ছোট পায়ে হাঁটার নতুন স্বপ্ন,
জীবনের পথে প্রথম দৃঢ় পদক্ষেপের চুম্বন।

দোলনায় ঝোলা ছেলেবেলার দুপুর,
পিছনে দৌড়ায় ছায়ার মত ছোট ছোট সুর।
বন্‌ধুরা ছিল, পাড়ার মোড়ে খেলাধুলোর জয়গান,
সেই দিনের হাসি, সেই দিনের প্রিয় গান।

মাটির গন্ধে মাখা আমাদের ছোট্ট সেই গ্রাম,
কাঁচা রাস্তার পথ, খেলার মাঠের ছলনাময়ী ধাম।
খুব ছোট ছোট শখ, কাঁচা আমের মধুর স্বাদ,
সোনালি রোদে নরম দোলায় শৈশবের প্রশান্তির বাদ।

কখনো মেঘে ঢাকা অজানা স্বপ্নের ছায়া,
তবু চোখে ছিল খুশির ঝলমল করা মায়া।

বৃষ্টির ধারা আর কাদা মাখা দিন,
সেইসব স্মৃতি হৃদয়ে আজও অমলিন।

শৈশবের সেই স্মৃতি আজও হৃদয়ে বেজে ওঠে,
সেই আনন্দে মোড়ানো দিনের সুখের গান কানে বাজে।
আজ বড় হয়েছি, ব্যস্ততার পথচলা,
তবু মনের কোণে শৈশবের সুরে বেজে চলে ভালোবাসা।

****

ফের শহরে

অনির্বাণ চক্রবর্তী, এস.আর.এফ., এ.এস.ইউ

ফের শহরে হোক না শুরু ডাকবাক্স, রঙিন খামের চিঠি
আমি লিখব প্রেমপত্র, পড়বে তুমি, হাসবে মিটিমিটি।
ফের শহরে হোক না শুরু দানব ডবল ডেকার,
তুমি আমার 'বেলা' হবে, আমি আবার বেকার।

ফের শহরে হোক না শুরু, টেলিফোনের সারি,
তোমায় আমি ফোন করবো, যখন ফাঁকা বাড়ি।
ফের শহরে হোক না শুরু, ট্রামের লোহার আওয়াজ,
তোমার সাথে শহর ঘোরা, রোজ বিকেলের কাজ।

ফের আকাশে রামধনু হোক, তোমার হাতে হাত,
তোমায় নিয়ে কবিতা হোক, একটা গোটা রাত।
ফের শহরে বর্ষা আসুক, চাতক ভিজুক আবার
বাগান ভরা প্রজাপতি, অপেক্ষাতে তোমার।

ফের শহরে তোমায় নিয়ে ছোট্ট নতুন বাসা,
এই শহরে আবার শুরু হারানো ভালোবাসা।

****

থাকবো আমি গল্প হয়ে

অনীশ চক্রবর্তী, এস. আর. এফ, এস. এম. ইউ.

যারা কেবল লিখতে জানে;
আমার জীবন, তোমার সকাল,
পোষা বেড়াল, হিসেব খাতা
গল্প করে বলতে জানে।
খুঁজে আনো তাদের কজন,
বসুক তারা উঠোন জুড়ে
সামনে থাকুক হাতের পাখা,
এক ঘটি জল, সেজের বাতি।
তাদের সাথেই দুহাত মুড়ে
বসবো আমি, সব'টা নিয়ে;
সবটা আমার, সবটা তোমার,
যতটা এই শহর জানে।
যতটা সেই রাজা-রাণীর
সময় থেকে দু-এক ফাটল
ফোকর গলে জমাট বেঁধে আমার প্রাণে।
লিখবে ওরা অনেক হাতে,
বলার আমার সহস্র মুখ,
বলবে শরীর, ছুটবে দুচোখ
তোমার ঠোঁটের চলার সাথে।
লেখার অনেক যুদ্ধ দেবো।
কাগজ দেবো, দেবো মানুষ,
স্মৃতির পথের পাকদণ্ডী
রাখবো সটান। আগুনখেকো

স্বপ্ন রেখে করবো সজাগ, করবো বেঁহুশ।
তা বেশ হবে।
বাঁচার ঘরের আগলগুলো নিকেশ হবে।
লিখবে ওরা গল্প তোমার,
পাঁচালী গান, ছন্দে গাঁথা
ছন্নছাড়া রোদের মতো আদর করে।
তাতেই আমি যুদ্ধে যাবো।
অস্ত্র ছাড়াই, পায়ে হেঁটে।
হারবো অঢেল, জিতবো কিছু
যেমন তুমি জিতবে ভাবো
তেমন করেই, গতর খেটে।
জীবন তো ঠিক ফুরিয়ে যাবে।
থাকবে কালি, থাকবে সাদা।
থাকবে যারা লিখতে জানে।
থাকবে যাদের বলার বাকি।
থাকবো আমি গল্প হয়ে,
গল্প আবার ফুরোয় নাকি?
****

Impediments of the Imperial Institute

Anushka De, M. Stat.

Bewildered and awe-struck by the venerable and publicly acclaimed indigenous institutes of the country, the young malleable minds persevere to achieve the ostensibly pinnacle of human education. They toil day and night for years, often relinquishing physical, mental and social well-being. The end goal becomes the sole purpose of the very human existence! Hours of labour and mental excursion are followed by the D-day which will determine the journey ahead. Some pass, some retry and some change their paths. Those entering the imperial institutes are often lionized by their friends and family, put up on a pedestal and made to realize the smooth life ahead.

With hopes now to materialize, they become part of the institutes, expecting high-quality education, encountering renowned academicians and researchers and befriending peers with similar preoccupations. Little did they know that the place may be predominated by cantankerous old men gravely engrossed in floccinaucinihilipilification. The vainglory nature of the pedagogues often transcends to their students who thereafter suffer from a superiority complex and face troubles in adapting to newer dynamic environments. Nevertheless, they gain high-quality education as per the on-paper syllabus and perhaps some practical understanding. Locally their training may stand out from the remaining, but globally they at times experience identity crisis. The lack of flexibility combined with the futile arrogance in reality leads nowhere.

For the youth to possess all the positive qualities, open-mindedness, adaptability, sincerity, team spirit and thus bearing a scintillating personality

it is imperative to create and sustain a similar environment among all the stakeholders of the institute. Then and only then the spirit of “e pluribus unum” would continue to prevail and flourish the society at large.

****

রূপকথার গপ্পো

অর্ঘ্য মন্ডল, লাইব্রেরী

।। ১ ।।

রাজকন্যে রাজপুত্তুরকে বলল, এই, তুই আমার কুলের আচারে হাত দিয়েছিস কেন রে? ওটা কি ব'স্মা তোর জন্য বানিয়েছে?

রাজপুত্তুরও কম যায় না- আর তুই যে কাল রেকাবির মিষ্টিগুলো একাই খেয়ে নিলি, আমাকে একটাও না দিয়ে, তার বেলা কিছু হল না, না?

নেবই তো, রাজকন্যের সপ্রতিভ উত্তর, নিজে আগের দিন আমার ডলপুতুলটাকে কোথায় লুকিয়ে রেখে সারাদুপুর ভোঁস ভোঁস করে ঘুমিয়ে- রাখব না! পাল্টা রাজপুত্তুর- আমার পেটকাটিটাকে কলের ঘরের পিছনে লুকিয়ে রেখে কে মামাবাড়ি পালিয়েছিল শুনি?

বেগতিক বুঝে রাজকন্যে রাজপুত্তুরের নাকে এক খিমচি মেরে সোজা ব'স্মার ঘরে। গুরুজনরা বুঝলেন, আর একটা মহাপ্রলয়ের হাত থেকে বাড়িটা আজকের মত রেহাই পেল।

।। ২ ।।

রাজকন্যের মুখ ভার। স্কুলে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। নাম দেওয়ার জন্য হুলুস্থূল, কারণ প্রথম স্থান দখল করতে পারলে নতুন বাজারে আসা গোটা লীলা মজুমদার রচনাবলীটাই নাকি তার কপালে নাচছে। এমনটাই বিশ্বস্ত সুত্র থেকে পাওয়া খবর। কিন্তু এক মাসের ওপর চেষ্টা করেও নৃপতি বিম্বিসার যে কোনো দৈবগুণে রাজকন্যের মুখ থেকে "নৃপতি বিম্বিষাঁড়" হয়ে বেরোচ্ছে, তা খোদায় মালুম। ভরসা দেওয়ার জন্য হাজির আমাদের বীর রাজপুত্তুর।

আরে দূর, সারগুলো তো এক-একটা ষাঁড়ই। তুই একটু আগেই বুঝে গেছিস, এই যা। থাপ্পড় মারবার জন্য হাতটা বাড়ালেও রাজপুত্তুরের চকিত ক্ষিপ্রতায় তা

লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, একটা হালকা দীর্ঘশ্বাসও যেন বেরিয়ে পড়ল রাজকন্যের মুখ দিয়ে।

ধুর, এইসব কবিতা বলা-টলা আমার দ্বারা হবে না। আমি ওই-। মনখারাপকে আর ওগরাতে না দিয়ে রাজপুত্তুর এগিয়ে এলো, শোন, এত ভাবিস না। চ, কাকাই একটা নতুন টিনটিন এনেছে। কালকেই শেষ করে দিয়েছি। এবার তুই ওটা পড়ে ফেল শিগগির। হাসিমুখে সমাধান বীর রাজপুত্তুরের। তবে সতর্ক সেনানায়কের মতো চেতাবনি দিতেও ভুলল না, তবে আগের বারের মতো হ্যাডককে যদি কুলের আচারে চান করিয়েছ-। সঙ্গে সঙ্গে মুখ কুঁচকে রাজকন্যে, ইস্‌স্‌!

।। ৩ ।।

রাজপুত্রের মুখ বড় গম্ভীর। ততোধিক মুখ ভার রাজকন্যারও। প্রথম সেমেস্টার ঠিকঠাক উতরে গেলেও দ্বিতীয় সেমেস্টারে দর্শনশাস্ত্রের মাহাত্ম্য হাড়ে-মজ্জায় টের পেয়েছে রাজকন্যা। অবশ্য টের পেয়েছে ক্লাসের আরো অনেকেই। কিন্তু স্কুলের শেষ পরীক্ষায় ওরকম চমকে দেওয়া রেজাল্টের পর এই পরিণতি শুধু তাকে কেন, চেনাপরিচিত সকলকেই একটু ঘেঁটে দিয়েছে। রাজপুত্রের অবশ্য সেই সমস্যা নেই। ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চেনা ছকে একবার কায়েমী হতে পারলে আর যাই হোক, সেমেস্টার ক্লিয়ার করা খুব একটা সমস্যাবহুল ব্যাপার নয়। কিন্তু তাই বলে রাজকন্যার বিপদে সে পাশে না দাঁড়িয়ে অন্য বন্‌ধুবান্ধবদের নিয়ে ফুর্তি করবে, এ চিন্তারও অতীত।

কী হবে? রাজকন্যা চিন্তাভারাক্রান্ত। বাবা বলেছিল যা নাম্বার আছে, আরামসে যে কোনো কলেজে ফিজিক্স বা অঙ্কে নাম এসে যাবে। আমিই জোরজার করে ফিলোজফিটা নিলাম। আর তার জন্যে কি বাক্যিবাণ সকলের। আর্টস্‌ নিয়ে পড়লে মেয়েকে নাকি বাড়ির কাজের মাসি হয়ে দিন কাটাতে হবে, হ্যানা-ত্যানা। শেওড়াফুলির পিসি, বরাপেটার মাসি, মায় তাঞ্জাভুর থেকে দূর সম্পর্কের কাকু অবধি জ্ঞান দিয়ে গেল, মেয়েটার পিত্তের দোষ আছে, একটু সামলাও। আর এখন-! প্রায় ডুকরে ওঠে রাজকন্যা। অত ভাবিস না,

একটু সেমেস্টারই তো একটু ঘেঁটেছে। পরেরগুলোয় ভালো করে উতরে দিস। আরে আমাদের দেবাশিসদা-

সান্ত্বনা দিতে চাওয়া রাজপুত্রকে ঝটিতি থামিয়ে রাজকন্যা যেন ফোঁস করে উঠল, রাখ তোর দেবাশিসদার কথা, ওই তো তোদের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পড়া, পরীক্ষার আগের একমাস ঝেড়ে কাপড় খুলে নোট মুখস্থ করে সকলে লাইন দিয়ে এইট্টি পার্সেন্ট। আমাদেরটা আর কী বুঝবি তোরা! এমন মিসাইলেও স্থিতধী আমাদের রাজপুত্র। পাহাড় উঁচু, এবড়োখেবড়ো হতেই পারে, কিন্তু তাকে ডিঙোনোর উপায় বার করতে হয় নিজেকেই। অতএব, গলার মডিউলেশনকে একটু পালটিয়ে, শোন, যা হয়ে গেছে, ওটা বাদ দে, মনটাকে হালকা কর। ক্লাসগুলোকে এনজয় কর, বাকিটা এমনিই ম্যানেজ হয়ে যাবে। আরে তুই আর যাই হোক, খেদো রামা-শ্যামা নোস, আমাদের স্কুলের-।

থাক, রাজপুত্রকে থামিয়ে রাজকন্যা, আর ওই কথা মনে করিয়ে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিস না। এমনিই-।

চা খাবি? হঠাতই প্রসঙ্গ পালটায় রাজপুত্র। কিছুটা যেন অবাক রাজকন্যাও, চা? সবিস্ময় প্রশ্ন তার।

হ্যাঁ, চা। খুব শান্ত গলায় উত্তর দেয় রাজপুত্র। খুব ভালো একটা দোকান হয়েছে ওই লর্ডস মোড়ে। হেঁটেই যাওয়া যাবে বোধহয়।

হেঁটে! এখান থেকে? তোর কি সত্যিই মাথাখারাপ? কথা বন্ধ হয়ে যায় রাজকন্যার। হঠাৎ রাজকন্যার হাতটা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে অভয় দেয় রাজপুত্র, আগে হাঁটতে তো শুরু কর। তারপর দেখা যাবে।

।। ৪ ।।

রাজপুত্র বেশ উদাস। রাজকন্যাও কিছুটা। তবে এমন নয় যে উদাসীনতা পুরোপুরি ব্যাগবন্দী করে ফেলেছে তাকে। সামনে দুটো কফির কাপ, ঠান্ডা হওয়ার হাত থেকে

পরিত্রাহী নির্বাণ চাইছে। কিন্তু সে নির্বাণ আদৌ মিলবে কিনা, সে বিষয়ে সদুত্তর আপাতত বিশ বাঁও জলে।

তুই কি তাহলে দিল্লীতেই আপাতত-

রাজপুত্রের মুখের কথা সবেগে কেড়ে নিয়ে রাজকন্যা,

আরে পিএইচডি কি আমি বাড়িতে বসে করব নাকি? ক্যাম্পাসে না থাকলে আসল আলাপ-আলোচনাগুলো থেকেই তো বাদ পড়ে যাব। তাছাড়া-।

তাছাড়া ওতো এখন চন্ডীগড়েই পোস্টেড। তোদের কানেকশনটা তাহলে-

রাজপুত্রের পেলব খোঁচায় একটু যেন রাঙাই হল রাজকন্যা, তা ঠিক নয়, আবার- ইচ্ছে করেই যেন কথাটা শেষ করল না সে। হাওয়া বুঝতে পেরে রাজপুত্রও এবার কফির কাপকে সাদরে ঠোঁটে আপ্যায়ন করল। কিছুক্ষণ কথাও বন্ধ রইল যেন কী একটা অজানা অজুহাতে।

এবারে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল রাজকন্যা, তোকে এরকম একটা জায়গায় কেন পোস্টিং দিল ভাই? ভূ-ভারতে কি আর কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া ছিল না কাজ করার জন্য?

থাকবে না কেন? কিন্তু কোম্পানির যা মর্জি। প্রোমোশন নেবে, আর কিছু স্যাক্রিফাইস করবে না, তা কি হয় বাবু? হালকা হাসিতে প্রত্যুত্তর রাজপুত্রের।

এবার মুচকি হেসে প্রসঙ্গ পালটালো রাজকন্যা, তাহলে কি এবার আমাদের নবাবজাদা সত্যি সত্যিই একা থেকে দোকা হতে চলেছেন? কাকিমার তাহলে শেষমেশ-

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সপ্রতিভ জবাব রাজপুত্রের, এই সেটলমেন্টের অবসেশন কবে নামবে বলতো তোদের মাথা থেকে?

।। ৫ ।।

কী হল বলতো? কিছুই যেন বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

এগুলো বোধহয় ঠিক বোঝাও যায় না। আমরা কে যে কী চাই-

এই, এরকম অ্যারিস্টটলমার্কা কথাবার্তা একদম বলবি না তো। কিছু একটা হলেই হয় দেবদাস, নয় সক্রেটিস, আর কিছু না হলে অগতির গতি সন্ধেবেলায় টিভির চেয়ারে-

আচ্ছা, চুপ করলাম। তুইই বল তাহলে।

আমি আর কী বলব...আমি যেন কোথাকার কোন হনুমন্ত সিং, আর তুই এসে আমাকে সাধছিস, পরামর্শ নিবি বলে। ধুর, কী সব ভেবেছিলাম, আর-

এক কাজ করবি?

কী বল।

তুই ছোটবেলায় কী একটা পাহাড়ে নিয়ে যাবি বলতিস না, দোতং পাহাড় না কী যেন।

তোর মনে আছে!

পাহাড়টা রয়েছে রে এখনও?

এ আবার কী বোকা বোকা কথা! পাহাড় কি কর্পূর নাকি যে উবে যাবে?

কিন্তু তোরটা তো ঢপ হতেই পারতো, তাই না?

নাঃ, এই একটি ব্যাপারে অন্তত আমি কোনোদিন তোকে ঢপ দিতে চাইনি। পাহাড়টা আজও আছে; একটু খুঁজতে হবে, এই যা।

কদ্দিন লাগবে খুঁজতে?

তুই কদিনের মধ্যে চাস?

মুচকি হাসি।

চ।

।। ৬ ।।

সূর্য অস্ত যেতে শুরু করলে তার লাল আভার সঙ্গে পাহাড়ের সবুজ রং মিশে একটা অদ্ভুত মায়াবী রূপ ধারণ করে। সেই মায়ায় অবগাহন করার মতো ফুরসত মানবজাতির খুব একটা হয় বলে মনে হয় না। তবু কিছু মানুষ, পথ ভুলে হলেও, এই মায়াতেই নিজেদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিতে চায়। আর চায় অজানায় মিলিয়ে যেতে, বাস্তবে যেটা ঘটানো খুবই দুরূহ একটি ব্যাপার।

সূর্যের শেষ আভা ছড়িয়ে যাচ্ছে দিগন্ত জুড়ে। আর তাকে সারা গায়ে সাপটে জড়িয়ে নিচ্ছে একটা ত্রিভুজ, হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে যার বড়ই অনীহা, একমাত্র উৎসাহ তার শুধু বাঁচতে চাওয়ায়।

ঋণঃ সোহন আলী

****

জিয়নকাঠি

অরিন্দম ঘোষ, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট

সিঁড়িভাঙ্গার অংকটা, যার না-মেলা উত্তরের
মেঘলা আকাশটা সাতরঙা রামধনুর মায়ায়,
মিতালির অভিসন্ধি করে মেঘরঙা রোদ্দুরের
জিয়নকাঠির স্পর্শে চিলেকোঠার চাবি হারায়!

মনখারাপের ঘুড়িটা, পাখা মেলেও ভোকাট্টার
মাঞ্জার সুতোতে সম্পর্কের নীলাকাশ গোটায়,
ভোরের স্নিগ্ধতা মেখে গভীর চোরাবালির
দোটানায় ভেসে জিয়নকাঠির টানকে ডোবায়।

কুয়াশার শিশিরবিন্দু, মরীচিকা ঝরে পড়ার
অলস দুপুরে চিলেকোঠায় পসরা সাজায়,
বসন্তের কোকিলের মতো একমুঠো ভালবাসার
আবেগে সুপ্ত মনুষ্যত্বের জিয়নকাঠি বোলায়!

****

উপহার

অরিন্দম ঘোষ, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট

(১)

"ও বাবা, ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে! কিছু খাবার কিনে দাও না।"

"অ্যাই ছোঁড়া, হাত ছাড়! হাত ধরবি না; বলছি, একদম ভালো হবে না...", বিরক্ত হয়ে হাতটা ছাড়াতে যেতেই একজোড়া রক্তচক্ষুর সামনে পড়ল অভিমন্যু। তারপরেই তার দিকে ধেয়ে এল সেই মোক্ষম তির, যার উত্তর সেই পৌরাণিক মহাভারতের অভিমন্যুর কাছেও ছিল না; তাই হয়ত চক্রব্যুহ থেকে বেরোতে পারেনি সে।

তোমার যে বিয়ে হয়ে গেছে আর একটা ছেলেও আছে, এ কথাটা তো আগে বলোনি! অভির জবাবের অপেক্ষা না করেই গট্‌গট্‌ করে হেঁটে খানিকটা পথ একাই এগিয়ে যায় সেঁজুতি। রাগে তার কপালটা দপ্‌দপ্‌ করছে। এলাকায় জনপ্রিয় পল্‌টুদার চায়ের দোকানের আশেপাশে বেশ একটা ভিড় জমে গেছে। উৎসুক জনতা ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করছে।

"বিশ্বাস করো, ওই বখাটে ছোঁড়াটা ফাজলামি মারছে...", দৌড়ে গিয়ে আরো কিছু বলার চেষ্টা করল অভিমন্যু। কিন্‌তু তার আগেই সেঁজুতি তার গাড়িতে উঠে বসল। একরাশ কালো ধোঁয়া অভিমন্যুর মুখ কালো করে দিল। পিছন ফিরে দেখল সেই ছোট্ট ছেলেটা তখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"কী খাবি? দিলি তো কেসটা জন্ডিস করে!"

"একটা ছ টাকার বাপুজী কেক কিনে দাও।"

হাতে বাপুজী কেকটা নিয়ে তৃপ্তিভরে খেতে খেতে বলল পচা, "তুমি কিন্‌তু লোক হিসাবে খুবই পরোপকারী। একদম চাপ নেবে না, সেঁজুতিদিকে আমি সময়-সুযোগ পেলে সব বুঝিয়ে বলব।"

এরপর আর সেই পল্‌টুদার চায়ের দোকানে দাঁড়ালো না সে। একছুটে দৌড়ে পালালো। গল্পদাদুর বাড়ি যাওয়ার সময় এসে গেছে। তিন কূলে কেউ না থাকলেও এই একটা মানুষের সান্নিধ্য তাকে শক্তি

যোগায়। ওনার অনুপ্রেরণায় সে অবৈতনিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে আর নিয়মিত হাজিরাও দেয়।

পড়ন্ত বিকেলের লালচে-কমলা আভা লেগে আছে আকাশের গায়ে। সূয্যিমামা টুপ করে ডোবার তালে আছে। দোতলার চিলেকোঠার ঘরে বসেছে আজ গল্পদাদুর আসর। তিন্নি, বিনু, ভোম্বল, মৌ, রনি, রিকি, মিস্টি, পচা, বাবাই- কে নেই সেখানে! পুরো পাড়া ঝেঁটিয়ে কচিকাঁচাদের দলের জমায়েত ঘটেছে এই গল্পদাদুর আসরে।

হঠাৎ শোনা গেল, হ্যাঁ- হ্যাঁ- হ্যাঁ- চ্চ- ও- ও- ও...

যথারীতি ভোম্বলের তারস্বরে 'হ্যাঁচ্চো' শুনে মাথাটা গরম হয়ে গেল তিন্নির। ওর মধ্যে বেশ একটা নেত্রীসূলভ আচরণ ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হচ্ছে এই বয়সেই।

"ওই উজবুক, আস্তে হাঁচতে পারিস না? ঐ অপয়া হাঁচি দিয়ে দিলি তো দিনটাকে অশুভ করে। আজ দেখবি, গল্পদাদু আর ভালো গল্প বলবে না!"

"আরে একটু হাঁচা-কাশা তো শরীর-স্বাস্থ্যের পক্ষে সুসংবাদ। বোঝা যায় যে, ভিতরের সব কলকব্জাগুলো ঠিকঠাক আছে...", বলতে বলতে হাতে বড়ো এক বাটি মুড়ি নিয়ে প্রবেশ ঘটল গল্পদাদুর। অবশ্য, নামেই গল্পদাদু, গল্পদাদু নামটা শুনলেই পেটের মধ্যে যে সাদা দাঁড়িওয়ালা বয়স্ক মানুষের ছবিটা সুড়সুড়ি দিয়ে ভেসে ওঠে, গল্পদাদুকে মোটেও সেরকম দেখতে নয়! এখনো পেটানো চেহারা, সম্পূর্ণ কালো চুল, মুখের বত্রিশখানা দাঁত শোভাবর্ধন করছে। এমন কী মুখের দাড়ি-গোঁফও সবসময় কামানো। কেউ বলে গল্পদাদুর আসল বয়স পঞ্চাশ, আবার অনেকে বলে সত্তর। তবে উনি যে বেশ বড়ো-সড়ো কোনো কেন্দ্রীয় সংস্থায় চাকুরী করতেন, এ'নিয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই!

ওরা মুড়ির বাটির উপর সবাই মিলে হামলে পড়ল হানাদার চেঙ্গিস খাঁর সিপাহীদের মত। খানিক পরেই শোনা গেল, ভ্যাঁ- অ্যাঁ- অ্যাঁ! আর দেখা গেল কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে আসছে ছোট্ট বিনি। বিনি প্রথম শ্রেণীতে পড়ে, সবচেয়ে ছোট আজকের এই আসরে। নাকের ও চোখের জলে মিশিয়ে কেঁদে-কেটে কী বলল কে জানে, কিন্তু গল্পদাদু ঠিক বুঝতে পারলেন!

গল্পদাদু হাঁক পাড়লেন, "এই তি-ন্-নি, বিনির জন্য মুড়ি নিয়ে আয়।" তিন্নি দৌড়ে এসে বিনির মুখে একমুঠো মুড়ি ভরে দিল।

গল্পদাদু বললেন, "কাড়াকাড়ি করে খেলে ভালোবাসা বাড়ে বৈ কমে না! শুধু তোরা বড়োরা একটু খেয়াল রাখবি, যার পেটের যা সামর্থ্য তা অনুযায়ী যেন খাবার পায়! আমাদের সমাজ এই সূত্র মেনে চললে কবেই ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য মুছে যেত!" তিন্নি এবার একটু আদুরে গলায় বলে বসল, "দাদু, আজকে কিন্তু ফাঁকি দিলে খেলব না, আ-পুলিশ! তোমার গল্প জলদি শুরু করো!"

গল্পদাদু মিষ্টি করে তিন্নির গাল টিপে আদর করলেন। তারপর যোগ করলেন, "আমি তোদের গল্প বলি না রে মা, নিজের আহরণ করা বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা শোনাই! যখন তোরা অনেক বড়ো হবি, আর মানুষের মতো মানুষ হবি; তখন নিশ্চয়ই বুঝবি, বুড়োটা কী কী সব হাবিজাবি বিদ্যা তোদের শেখায় নেহাতই গল্পের ছলে!"

রনিও অধৈর্য্য হয়ে উঠল, "না-না, দাদু! নতুন গল্প চাই, আমাদের সবার দাবী মানতে হবে…মানতে হবে।" গল্পদাদু হেসে বললেন, "আরে কালকেই তো তোদের 'ক্রিসমাস ডে'! আজকেই রাত বারোটার পর তোদের জন্য আসল সান্টাক্লজ আসবে! আজকে তোরা সবাই মিলে আলোচনা করবি আর প্রত্যেকে কী কী উপহার চাস সান্টাক্লজের কাছে তার একটা লিস্ট তৈরী করবি।"

মিষ্টি মুচকি হেসে বলল, "দাদু, আমি জানি, রিয়্যেল সান্তাক্লজ হরিণে-টানা স্লেজ গাড়ি করে মেরু প্রদেশের বরফ ডিঙ্গিয়ে আসে। কিন্তু আসলে সান্তাক্লজ বলে কেউ নেই, তাই না দাদু?"

গল্পদাদু কৌতুক করে একটু চোখ টিপে মিষ্টির দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখাই যাক না, আজ রাতে তোদের ডাকে আসল সান্তাক্লজ আসে কি না! তোরা সবাই মিলে মন থেকে যদি চাস, তাহলে তো ম্যাজিক হতেও পারে! যাক, ভালো করে শুনে নে। আমি প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা করে খাম রেখেছি, তোরা প্যাডের কাগজে লেখার পর সেগুলোকে ঐ বিশেষ খামে রেখে আঠা দিয়ে বন্ধ করে দিবি। আমার একটা জরুরী কাজ বাকি আছে, খুব শীঘ্রই মিটিয়ে আসছি!"

(২)

"ন-ম-স্কা-র ম্যাডাম! আমার কাজই হল উ-ন্ন-য়-ন করা, তাই নামও উ-ন্ন-য়-ন ক-র!"

মাথা নত করে করজোরে নমস্কাররত মানব মূর্তিটির দিকে একরাশ বিতৃষ্ণা নিয়ে তাকাল লগ্নজিতা। তারপর তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হেনে টেবিলের কাগজপত্রগুলোকে তাড়াহুড়ো করে গোছাতে লাগল সে।

এই আগন্তুকের তার বিদ্যালয়ে আসার হেতু সম্পর্কে লগ্নজিতা অজ্ঞাত নয়। শুধু একে অন্যের ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিচ্ছিল। অবশ্য এই মুহূর্তে সে এই কক্ষে একা আর পার্শবর্তী প্রগতি সংঘ ক্লাবের সম্পাদক উন্নয়ন করের সঙ্গে রয়েছে চারজন কুখ্যাত সমাজবিরোধী সাগরেদ, যাদের নাম অনেক আগেই পুলিশের খাতায় উঠে গেছে।

উন্নয়ন কর এবার যেন খানিকটা বিরক্ত হলেন। পানের পিকটা বিদ্যালয়ের দেওয়ালেই ফেলে ভুবনমোহিনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ইন্-চার্জের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার কাজ-ই হল উ- ন্ন-য়-ন করা, তাই নামও উ-ন্ন-য়-ন ক-র! আমার দেওয়া নোটিশ ছেলেরা দেওয়ালে চিপকে দিয়েছে, কালকের মধ্যে এই ই-শ্-কু-ল বিল্ডিং খালি করে দেবেন। এইখানে ক্লাবের মাঠ আর বিল্ডিং ভেঙে শপিং মল বানাবো আমি.... এলাকায় উন্নয়নের প্র-গ-তি বিস্তার হবে!"

এমনিতেই বারবার একই কথা বলার মূদ্রাদোষ থাকায় ভদ্রলোককে খুব একটা পছন্দ করে না লগ্নজিতা। এবার এই বাড়াবাড়ি আটকাতেই সে বলল, "আপনি আইনত সরকারী বিদ্যালয়ের জমি বেদখল করতে পারেন না। আর তাছাড়া মাঠটাও আমাদের সীমানার মধ্যেই। সে আপনি যতোই ক্লাবের ছেলেদের দিয়ে দেওয়াল তোলা আটকে রাখুন!"

লগ্নজিতার গলার স্বর যেভাবে চড়া সুরে উঠল, তাতে মনে হয় না, যে সে সেই মুহূর্তে একা তা তার মনে ছিল। অবশ্য বর্ষীয়সী শিক্ষিকা প্রতিমাদি প্রায়াশই ছুটি-ছাটা নেন। কারণ ওনার অবসর নেওয়ার সময় কাছাকাছি এসে গেছে।

"তোরা ফ্যালফ্যাল করে দেখছিস কী ? আমার কাজই হল উ-ন্ন-য়-ন করা, তাই নামও উ-ন্ন-য়-ন ক-র! যা যা.... মাঠের

ছোঁড়াছুঁড়িগুলোকে বাড়ি ভাগিয়ে দে। বেশী খেললে নে-কা-প-ড়া হবে না....", পরিপাটি গোঁফটা পাকিয়ে নিয়ে হুকুম করলেন উন্নয়ন কর। তার সাগরেদরা হুকুম তামিল করতে মাঠে যে ছোট ছেলেমেয়েরা খেলছিল, তাদের দিকে এগিয়ে গেল। উন্নয়ন কর এবার সরাসরি লগ্নজিতাকে চোখেচোখ রেখে মাপলেন।

"জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে যুদ্ধ! হুঁ....কত যে এল আর কত যে গেল! আমার কাজই হল উ-ন্ন-য়-ন করা, তাই নামও উ-ন্ন-য়-ন ক-র! এলাকার সব বিদ্বজনরা আমার এই মহান কাজে আমার সঙ্গে আছেন।"

এতক্ষণে লগ্নজিতা চক্রবর্তী কাজ শেষ করে চোখ তুলে তাকাল, যেন কোনো ঘৃণ্য নরকের কীট ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

"আপনার নামে আমি পুলিশ আর লোকাল কাউন্সিলারের কাছে কমপ্লেইন করব। এভাবে আপনি আমায় থ্রেট দিতে পারেন না....", বলেই স্কুলের বাইরে বেরিয়ে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল, "সবাই স্কুলের ভেতরে চলে এসো। টিফিন ব্রেক আজকের মতন শেষ।"

ব্যাপারটা ঠিক হজম হচ্ছিল না উন্নয়ন করের। যাওয়ার আগে আরেকবার শাসিয়ে দিয়ে গেলেন, "আমার কাজ-ই হল উ-ন্ন-য়-ন করা, তাই নামও উ-ন্ন-য়-ন ক-র! কথা দিলাম যে পুলিশ আর কাউন্সিলারের চোখের সামনেই এই বিল্ডিং বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেব। আপনি কি-স্-স্যু করতে পারবেন না। উন্নয়নের মহাযজ্ঞে আপনাকেও সামিল হতে হবে!"

আরও কিছুক্ষণ ভদ্রলোক থাকলে হয়তো তাকে বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করত! লগ্নজিতা আরেকবার চিঠিটা খুলে দেখল। তার অন্য বিদ্যালয়ে 'ট্রান্সফার অর্ডার' এসে গেছে কয়েকদিন আগেই। তার চিন্তায় এল, শুধু শুধু এই ছোট্ট ছেলেমেয়েগুলো আর এই বিদ্যালয়টাকে ভালোবেসে এখনো নতুন বিদ্যালয়ে কাজে যোগ দেয়নি সে। কিন্তু এভাবে আর ক'দিন সে একা যুদ্ধ করবে? স্থানীয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা কী এগিয়ে আসবে না এই অন্যায়ের বিরূদ্ধে লড়াইয়ে তাকে সাহায্য করার জন্য?

নীরবে অশ্রুবিন্দুটিকে মুছে ফেলল সে। মনে পড়ল, বাবা বেঁচে থাকতে বলত,

‘ন্যায়ের পথ যতোই কষ্টের আর পরিশ্রমের হোক না কেন, তুই কোনো দিন প্রলোভিত হয়ে ন্যায়ের পথকে ছাড়বি না। তাতে হয়তো তোর সাময়িক দুঃখকষ্ট বেশী মনে হবে, কিন্তু পরবর্তী কালে নিজের বিবেকের কাছে দংশন খাবি না।’

আম পাতা জোড়া জোড়া/
মারবো চাবুক চড়বো ঘোড়া/
ওরে বুবু সরে দাঁড়া/
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া/
পাগলা ঘোড়া খেপেছে/
চাবুক ছুঁড়ে মেরেছে/
অল রাইট ভেরি গুড/
মেম খায় চা বিস্কুট….

সবারই মনোযোগ ঐ বিশেষ 'চা' শব্দটার উপর, কারণ গোনার সময় যার ভাগ্যে 'চা' আসবে সে আউট। আর বাকীদের নিয়ে আবার গোনা চলবে। শেষে যে থেকে যাবে, সেই হবে 'চোর'; তাকে বাকী সবাইকে খুঁজতে হবে।

বাবাই শেষ অবধি 'চোর' হল। ওকে চোর বানাতে পেরে ষষ্ঠ শ্রেণীর মনিটর থেকে আপামর স্টুডেন্ট সবাই আল্লাদে আটখানা। কারণ, ওকে কিছুতেই চোর বানানো যেত না। ঠিক গুনে গুনে জায়গা অদল-বদল করে চোট্টামি করে পিছলে বেরিয়ে যেত!

ওকে পিছন ফিরে একশো অবধি গুনতে বলে সবাই মিলে দৌড় লাগাল। লুকানোর জায়গা আগেই ঠিক করা ছিল। খোলা মাঠের চারপাশে অনেক গাছগাছালি ছিল, আর তাছাড়া অন্য কিছু গোপন জায়গাও ছিল। ক্রিকেট বলটা হারিয়ে গেলেই লুকোচুরি খেলা চলতো।

হঠাৎ করেই গোল বাঁধল, সবুজ সংঘের ক্লাবঘর থেকে মুচুদা বেরিয়েই হাঁক-ডাক শুরু করলো, “চল্-চল্, তোরা সব মানে মানে কেটে পড়। কাল থেকে মাঠের চারধারে দেওয়াল তুলে টাইলস্ বসানো হবে আর মঞ্চ প্রস্তুত করা হবে। প্রাকৃতিক গাছ কেটে কৃত্রিম গাছ আর পাখি বসানো হবে। এলাকার সম্মানীয় এম.পি. সাহেব কদিন পরেই এইখানে সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্বোধন করতে আসবেন। এলাকার সংস্কৃতিমনস্ক মানুষজনের জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ….”

“কিন্তু চুমুদা আমরা খেলব কোথায়? বুড়ো-হাবড়াদের কথা না ভেবে একটু আমাদের কথাটা ভাবো!”

বাবাই-এর মুখে আরো কথার খই ফুটতো কি না জানা নেই। কিন্তু এটুকু শুনেই মুচুদার দাঁত কিড়মিড় আরম্ভ হয়ে গেল। আমরা মুচুদার নামটা উল্টে 'চুমুদা' বলে ডাকতাম। অবশ্যই আড়ালে-আবডালে! বাবাইটা অবশ্য চিরকালই ঠোঁটকাটা। একবার রেলের পুলিশ স্টেশনের পাশে গজিয়ে ওঠা মাঙনাদার দোকান ভাঙছিল। তো বাবাই দৌড়ে গিয়ে মাঙনাদাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে ছিল, "ও মাঙনাদা, পুলিশকাকুকে তোমার দোকান ভাঙতে লাগিয়েছো কেন?" এই শুনে মাঙনাদা লাঠি নিয়ে বাবাইকে তাড়া করেছিল। তারপর আমরা কীভাবে সেবার বাবাইকে বাঁচিয়ে ছিলাম, সে বলতে গেলে আর একটা গল্প হয়ে যাবে।

"ত্-ত্-ত্-তো-রা আমাকে নিয়ে ম্-ম্-ম্-মজা করছিস ?"- এই বলে ক্লাবের একটা উইকেট নিয়ে তেড়ে এলো মুচুদা। মুচুদা ক্লাস নাইনে চারবার 'লাড্ডু' খাবার পর সারা দিনরাতই ক্লাবে বসে ক্যারম পিটায়। অবশ্য এটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা! মুচুদা রেগে গেলেই তোতলাতে শুরু করে। এখন অবশ্য পার্টিবাজি করে ভালোই কামাই করে। শোনা যায় যে পাড়ার উঠতি প্রোমাটাররা মুচুদাকে গুরু মানে!

ততক্ষণে সবাই দলবল মিলে বাবাইকে বাঁচাতে এসে গেছে। অবশ্য তার আগেই হঠাৎ করে আবির্ভাব ঘটল রণদার, হাতে বিদ্যুৎ-বাহিত-মশানিধনকারি যন্ত্র! যথারীতি কারো অনুমতির তোয়াক্কা না করেই রণদা লাফ দিয়ে উঠল মুচুদার ঘাড়ের উপরে, পটাপট করে শুধু কয়েকটা আওয়াজ হল, আরো কয়েকটা মশা সাবাড় হল ওনার মহান হস্তে! অবশ্য পাগলারা যে কারো অনুমতি নেয় কি না, তা রীতিমতো তর্কসাপেক্ষ ব্যাপার-স্যাপার! যেতে যেতে রণদা গর্জে গেল, "আজ গিন্নিকে দেখিয়ে দেব! আমি অকর্মণ্য নই...পরশুরামের শিষ্য আমি...সমস্ত মশককূলের বিনাশ হবে আমার মহান হস্তে!"

তারপর আর কী? 'লুকোচুরি' ছেড়ে 'চোর-পুলিশ' খেলা চলল। পুলিশরূপী মুচুদা কোনো চোরকেই ধরতে পারল না। সবাই ছিলাম বিশাল মাপের দৌড়বীর তো, তাই! ভাগ্গিস, মুচুদা একা ছিল! ও হ্যাঁ, ভাগ্গিস, পাড়ার বিখ্যাত পাগলা রণদা হামলে পড়েছিল! শোনা যায়, রণদার গিন্নি নিজের বাড়ি চলে যাওয়ার পর কেমন যেন হয়ে যায় রণদা। সারাদিন খালি মশা মেরে বেড়ায় আর করগুণে কীসব হিসাব করে।

অথচ অংকে নাকি দারুণ মাথা ছিল রণদার!

সবাই চলে যাওয়ার পর গল্পদাদু ওরফে বিনয়কৃষ্ণ সান্নাল খামগুলো নিয়ে বসলেন। দুজনকে উনি আসতে বলে এসেছেন ঠিক রাত সাড়ে এগারোটার সময়। ওরা অবশ্য কথার খেলাপ করার পাত্র নয়। গল্পদাদুর সম্মানার্থে জানপ্রাণ লড়িয়ে দেওয়ার বান্দা।

খামগুলোকে সব খুলে ফেললেন তিনি। দেখা গেল, বেশীর ভাগ কচিকাঁচাদের ভোট গেছে দু'টি মারাত্মক বিষয়ের দিকে- চোখে জল এসে গেল গল্পদাদুর। উনি অবাক হয়ে ভাবলেন, এই অবুঝ নির্মল মনের শিশুরা যেখানে বুঝতে পারছে, কোনটা সঠিক আর কোনটা অন্যায়। সে'খানে পরিপক্ক নাগরিক সমাজ বুঝতে পারছে না অথবা বুঝেও না বোঝার মিথ্যা অভিনয় করেযাচ্ছে!

"দাদু....ও গল্পদাদু...."

"আয়, পচা ভেতরে আয়...."

"দাদু, এই ভদ্রলোক আপনার ঠিকানা খুঁজছিলেন!"

"শোন্ পচা, কাজটা দায়িত্বের বলে তোকেই দিলাম। তিনটে খাম দিচ্ছি। প্রথমটা ব্রুস লি, দ্বিতীয়টা ভীম সেন আর তৃতীয় খামটা লগ্নজিতা দিদিমনিকে দিবি।"

তারপর খামগুলো নিয়ে পচা চলে যেতেই উনি জগদীশবাবুকে বসতে বললেন। জগদীশবাবু ওনার হাতে একটা বড়ো-সড়ো আকারের প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "একটা সান্তাক্লজ, একটা পেত্নী আর একটা ভূত-সাজার কস্টিউম আছে। তুই একটু চেক করে নিস আর মেক-আপ আর্টিস্ট লাগলে আমায় বলিস। আমার আজকে মরারও সময় নেই। আজকেই থিয়েটারে আমার দলের নাটক আছে।"

বিনয়কৃষ্ণ আর ধন্যবাদ জানিয়ে ওনার বাল্যবন্ধু জগদীশকে অমর্যাদা করলেন না। উনি জানতেন যে এই কাজ এতো কম সময়ের মধ্যে নিঃখুঁত ভাবে একমাত্র ওই করতে পারে। আর প্রতিটা জিনিসপত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে লিস্ট তৈরী করে পাঠানো জগদীশের পুরানো স্বভাব।

(৩)

প্রথম দৃশ্য।

একদম সামনের সারীতে যে ভদ্রলোক ধবধবে সাদা কূর্তা-পাজামা আর সঙ্গে মানানসই জহর কোট পড়ে সবাইকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছিলেন, তিনিই যে পাঠকদের অতি পরিচিত উন্নয়ন করবাবু, তা আশা করি, আমাকে আর বলে দিতে হবে না! ওনার পেছনেই জনা-বিশ সাগরেদের দল সমস্ত কাজের তদারকিতে ব্যস্ত।

বুলডোজার এসে গেছে। এলাকার সমস্ত গণ্যিমান্যি লোকজনেরা এসে গেছেন। এমনকি এলাকার পৌরমাতাও এসে পৌঁচেছেন। রাত বারোটার সময় ভুবনমোহিনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে যেন চাঁদের হাট বসে গেছে।

উন্নয়ন করবাবু তৈরী হয়েই এসেছেন। বুলডোজার যেই স্কুল বিল্ডিং গুঁড়িয়ে দেবে, ঠিক সেই মুহূর্তেই পুরোহিতরা নতুন শপিং মলের জন্য ভিত-পূজা শুরু করে দেবে। একটা নারকেল ভেঙ্গে শুভ কাজের সূচনা করবেন পৌরমাতা।

পৌরমাতা নারকেলটি নিয়ে মাটিতে ফেললেন ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নারকেলটি একবারে ভাঙ্গল না। সমাজসুধারক উন্নয়ন করবাবু আরেকটা নারকেলের যোগাড় করতে গেলেন।

হঠাৎ লোকজনের চিৎকার শোনা গেল, পা-লা-ও..... পা-লা-ও!

একটা ক্ষাপা ষাঁড় তাড়া খেয়ে মাঠের মধ্যে কোথা থেকে যেন ঢুকে পড়ল। 'ধর্মের ষাঁড়' কি না কে জানে! সবাই যে যেদিকে পারে ছুটতে লাগল। তারই মধ্যে দেখা গেল, স্কুল বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে আসছেন আসল 'সান্তাক্লজ'। তার কাঁধে একটা ঝোলা, পরনে লাল-সাদা পোষাক আর ধবধবে সাদা দাড়িগোঁফ। যেন কোনো ছবি থেকে এখনি বেরিয়ে এলেন! ও যেটা বলা হলো না, সেটা হলো, সান্তাক্লজের হাতে একটা অদ্ভুত জাদুদন্ড!

উন্নয়ন করের সাগরেদরা এগোতে যেতেই দেখা গেল, দুজন তরুণ তূর্কি তাদের প্রতিহত করছে। একজন ক্যারাটের কিক মারছে আর অন্যজন প্রত্যেককে শূন্যে তুলে আছাড় মারছে।

পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির স্বার্থে জানানো প্রয়োজন, ছিপছিপে চেহারার তরুণটি 'ব্রুস লি' নামেই এলাকায় পরিচিত আর ষন্ডামার্কা তরুণটি 'ভীম সেন' নামেই পরিচিত। দুজনেরই আসল নাম সবাই ভুলে গেছে। যেটা মনে আছে, সেটা হলো দুজনেই বিনয়কৃষ্ণ সান্যাল ওরফে গল্পদাদুকে গুরুদেব মানে। একজন সদ্যই ক্যারাটেতে ব্ল্যাক বেল্ট পেয়েছে। আর আরেকজন সারাদিন হনুমানজী শিষ্য হিসাবে মুগুর ভেঁজে ও কুস্তির প্যাঁচ কষে সদ্যই বডিবিল্ডিং-এ খেতাব জিতেছে।

উন্নয়ন করবাবু বেগতিক দেখে উর্দিধারী পুলিশদের ডেকে আনতেই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। সান্তাক্লজ পুলিশদের চোখে-চোখ রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা হাতে বিষাক্ত সাপ নিয়ে কী করছেন ?"

"ও-রে বা-বা-রে, বিষাক্ত সাপ!"- এই বলে পুলিশগুলো হাতের বন্দুক ফেলে রেখে দৌড়াতে লাগল। যেন মনে হল, ওনাদের হাতে বন্দুকের বদলে বিষাক্ত সাপ রয়েছে! বাকীরাও সান্তাক্লজের এই সম্মোহন দেখে অবাক হয়ে গেল!

এরমধ্যেই দেখা গেল, একজন নারী এগিয়ে আসছেন সামনের দিকে। ধীরে ধীরে আরো অনেকজন এগিয়ে এলেন। হাতে-হাত ধরে গড়ে উঠল এক সম্পূর্ণ মানববন্ধন। পুরো বিদ্যালয়টাকে ঘিরে ফেললেন তাঁরা। সর্বাগ্রে এগিয়ে আসা দুঃসাহসিক নারীটিই যে লগ্নজিতা চক্রবর্তী, আশা করি, আপনারা তা বুঝতে পেরেছেন।

তালেগোলে সান্তাক্লজ আর গল্পদাদুর দুই অনুচর যে কোথায় উধাও হয়ে গেল, তা কেউ বুঝতেও পারলো না! হয়ত সামাজিক চেতনা আর শুভবুদ্ধির জাগরণের জন্যই তাদের প্রয়োজন ছিল!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মুচু রাতের বেলাতেই কাজ শুরু করিয়ে দিয়েছে। রাতারাতি পাঁচিল তুলে দিতে পারলেই 'কেল্লা ফতে' ! অবশ্য সে একা নেই , তার সাথে আছে চারজন সাগরেদ। গোপু, ভিখু, কালু আর টল্লু। এরা অবশ্য মুচুর একান্তই অনুগত। কারণ, মুচু পৌরমাতাকে ধরে এদের এনলিস্টমেন্ট করিয়ে দিয়েছে। আর সেই সূত্রে এরা এলাকায় ভালোই প্রোমোটারগিরি করে দু'পয়সা করে খাচ্ছে!

বন্‌ধুরা মিলে সবুজ সংঘ ক্লাবে বসে গল্পগুজব করছিল। মধ্যরাত্রি পেরিয়ে আরো আধ ঘন্টা সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। হঠাৎ বিশুয়া মিস্ত্রি ছুটতে ছুটতে এলো, "মা-লি-ক, আমাদের পয়সা মিটিয়ে দিন, আমরা আর কাজ করব না! ঐদিকের বেলগাছে ভূত আছে!"

"ধুত্তোর! তোরা জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিস! ওসব ভূত-পেত্নি ঠাকুরমার আমলে ছিল রে!"

এই বলে মুচু বাকীদের উদ্দেশ্যে বলল, "চল রে! দেখে আসি! আজ ব্রহ্মদত্যি এলেও আমাদের হাতে ছাড় পাবে না, ভূত তো কোন ছার!"

ওরা পাঁচজন বিশুয়াকে নিয়ে বেলগাছের দিকে এগোতে লাগল। গোপু একটু নাদুস-নুদুস চেহারার কারণে খানিকটা পিছিয়ে পড়ল। ঠিক তখনি শোনা গেল চিল চিৎকার, ও-রে বা-বা- রে...মা-রে...ভূ-তে আমায় মেরে ফেললে রে....রাম..রাম...রাম...রাম!

পিছনের দিকে বিশ ফুট মতো পিছিয়ে যেতেই ওরা দেখল, একটা অগভীর গর্তের মধ্যে পড়ে গেছে গোপু আর সেখান থেকেই ভয়ে চিৎকার করছে। গোপুকে ধরাধরি করে কোনোমতে ওপরে তোলা হল। কালু জিজ্ঞাসা করলো, "কে কী কেন কবে কোথায় ?" কালুর সবকিছুতেই ঐ পাঁচটি বিশেষ শব্দ ব্যবহারের মূদ্রাদোষ ছিল।

"আরে আমায় ভূতে ল্যাঙ মেরেছে পেছন থেকে। গর্তে ফেলে আবার কঙ্কালটা হি-হি-হি করে দাঁত বের করে হাসছিল! তোরা ভাই যা, আমি আর এই কাজে নেই.... আপনি বাঁচলে বাপের নাম!"- এই বলে গোপু থলথলে শরীর নিয়েই চোঁচা দৌড় লাগার বাড়ীর দিকে। ওরা যথারীতি আশেপাশে কাউকে দেখতে পেল না। গোপুর মতো ভীতুর ডিমকে যে একাজে আনা উচিত হয়নি, সে সম্পর্কে সকলেই সহমত পোষণ করলো।

এবার টল্লু চিল্লিয়ে উঠল, "ঐ দ্যাখ, ওখানে একজন মেয়েছেলে ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদছে! ঐ দ্যাখ!"

ওরা টল্লুর হাতের দিকনির্দেশ অনুসরণ করে কিছুই দেখতে পেল না। মানে-মানে করে টল্লুও ভয় পেয়ে সরে পড়ল ওদের দল থেকে। কালু, ভিখু আর মুচু এগিয়ে চলল বিশুয়ার সাথে। ওরা গিয়ে দেখল, শ্রমিকরা সব ভয়ে মাটি কাটা বন্ধ করে দিয়েছে। ভিখু জিজ্ঞেস করলো, "তোরা না বলে কাজ বন্ধ করলি কেন ?"

কালুও তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলো, "কে কী কেন কবে কোথায় ?"

লেবারদের সর্দার এগিয়ে এল। দূরের বেলগাছটা দেখিয়ে বলল, "ঐখানে একটা পেত্নী পা দুলিয়ে হি-হি করে হাসছিল! আমরা এখানে আর কাজ করব না!"

ওরা ভয়ে ভয়ে বেলগাছের কাছে যেতেই গাছের ওপর থেকে ধূপধাপ করে বেল পরতে লাগল। বিশুয়া আর লেবাররা পড়ি-মরি করে ছুট লাগাল।

শেষে গাছের উপর থেকে তিনটে কালো কম্বল এসে পড়ল ওদের উপর। তারপর কিল-চড়-ঘুসি কিছুই বাদ রইল না। তিনজন দিশাহারা হয়ে গেল। একটা ভূত আর একটা পেত্নির সাজে যে দুজন গাছ থেকে নেমে এল, তারাই যে পাঠকদের পূর্ব-পরিচিত 'ব্রুস লি' আর 'ভীম সেন', তা বোধহয় আর বলার অপেক্ষা রাখে না!

ওরা উঠতে যেতেই দেখল, একটু দূরেই সান্তাক্লজ দাঁড়িয়ে আছে। সান্তাক্লজ জাদুদন্ড ঘুরিয়ে মিস্টি হেসে বলল, "যা পালা এখান থেকে। আজকের মতো ভূতগুলোকে গায়েব করে ক্ষমা করে দিলাম! এরপর কালকের জন্য ভুল করলে কিন্তু পরশু আর মাফ নেই!"

সত্যিই ভূতগুলো গায়েব হয়ে গেল। মুচু, কালু আর ভিখু অনেক কষ্টেসৃষ্টে সান্তক্লজকে ধন্যবাদ জানিয়ে পালাতে লাগল। আর ভাবল, সত্যিই ওদের মতিভ্রম হয়েছিল, নইলে খেলার মাঠকে সাংস্কৃতিক মঞ্চ বানাতে যায়!

সান্তাক্লজ এবার এগিয়ে এসে গাছের আড়ালে থাকা ছায়ামূর্তি দুটিকে ডেকে বললেন, "তোরা দুজন ভৌতিক ছদ্মবেশ ছেড়ে বাড়ি চলে যা। তোদের কাজ আজকের মতো শেষ। তবে আজকে এই ক্রিশমাসের রাতে দিলপুরের মতো ছোট্ট টাউনশিপে যে দুটো অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল, তার ধারা-বিবরণী ভুলেও কাউকে দিতে যাস না। মনে রাখবি, কালকে আমার বাড়িতে যে গল্পদাদুর আসর বসবে, সেখানেও তোরা মুখ খুলবি না। সবাইকে সান্তাক্লজ সেজে উপহার দেওয়াটা আমার সামাজিক কর্তব্য।"

আর এই সান্তাক্লজ যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেন্ট নিকোলাস নামক ধর্মযাজক নন, স্বয়ং বিনয়কৃষ্ণ সান্যালবাবু ওরফে গল্পদাদু, সেটা তো আশা করি, তোমরা পাঠক-পাঠিকারা ভালোই বুঝতে পেরেছো! যাই হোক, তোমরা, পাঠক-পাঠিকারা যা বোঝার বুঝে গেলে। তোমরা আবার এই

গোপন তথ্য দিলপুরের কোনো সজ্জন ব্যক্তিকে ভুলেও জানাতে যেও না যেন!

বিঃদ্রঃ এই কাহিনীর সমস্ত স্থান-কাল-পাত্র সম্পূর্ণভাবে কাল্পনিক এবং জীবিত অথবা মৃত কোনো ব্যক্তি অথবা স্থানের সঙ্গে যে কোনো রকমের সাদৃশ্যকে নেহাতই সমাপতন বলে ধরতে হবে।

****

কিছু পুরাতন স্মৃতি

আশীষ কুমার চক্রবর্ত্তী, অবসরপ্রাপ্ত

পুরোনো স্মৃতি, বিশেষত এই বয়সে এসে চিরকালই আনন্দ দেয়। সেই স্মৃতি যদি ছেলেবেলার হয় এবং আলমা ম্যাটারকে নিয়ে হয়, তাহলে তো মন আপনা থেকেই ভরে যায়। আমাদের সময় স্কুলে এগারো ক্লাস পর্যন্তই পড়া যেত। অর্থাৎ আমাদের হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা তখন হতো ক্লাস নাইন, টেন আর ইলেভেনের সিলেবাস এর ওপর। ১৯৭৫ সাল অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৪৯ বছর আগের কথা। মফস্বলের এক অচেনা স্কুল থেকে হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা দেব। পরীক্ষার আগে কয়েক মাসের ছুটি অর্থাৎ পরীক্ষার প্রস্তুতি। এই সময়টা সকলের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অনেকেই বিশ্বাস করেন যে হায়ার সেকেন্ডারীতে ভাল রেজাল্ট করতে পারলে ভবিষ্যতে কিছু না কিছু করে খেতে পারা যায়। কথাটা যে ঠিক সেটা নিয়ে বোধহয় কোনো দ্বিমত নেই। তবে আরও একটা দিক দিয়ে এই সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

স্কুলের সিলেবাসটা এমন ভাবে তৈরী করা যাতে যে বা যারা ওই সিলেবাসটা ভালভাবে বুঝে পড়াশুনা করেছে, তাদের ভবিষ্যৎ অন্যদের তুলনায় অনেক ভালো। যাই হোক, এই সব বোধ পরে হয়েছে। আপাতত ওই সময়ে ফিরে তাকাই। সারাদিন ধরে পড়াশুনা ছাড়াও খেলাধুলা করতাম। বাবার ট্যাঁকের জোর না থাকায় খুব একটা টিউশন পড়তে যেতে হতো না। তবু কিছু মাষ্টারমশাই বিনা পয়সায় পড়াতে রাজি হয়েছিলেন। তাঁদের কাছেই যেতাম। এ ছাড়াও কিছু নবীন দাদা মিলে মহৎ উদ্দেশে গরীবদের জন্য একটা অবৈতনিক কোচিং সেন্টার খুলেছিলেন, যেটা অবশ্য বেশিদিন টেঁকেনি। তবে ওই ধরণের অনুপ্রেরণা তাঁদের অনেকের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। তাই কোচিং সেন্টার চালাতে না পারলেও, তাঁদের কাছে কোনো অংক নিয়ে গেলে তারা চেষ্টা করতেন কিছুটা সময় ব্যয় করে সেটা সল্‌ভ করতে। এঁরা বেশির ভাগই বেশ বড়লোক ঘরের ছেলে এবং কোনো না কোনো জায়গায় ভালো চাকরি করতেন। তবে একজন স্কুল মাস্টারের কথা না বললে এই স্মৃতিমন্থন অপূর্ণ থেকে যাবে। তিনি আমাদের স্কুলের

শিবরাম বাবু। তাঁর বাড়িতেই তিনি টিউশন করতেন, তবে উঁচু ক্লাসের জন্য মূলত অঙ্ক দেখাতেন। নিচু ক্লাসের হলে অঙ্ক ছাড়াও বিজ্ঞান বা এক এক সময় ইংরেজি লেখা কারেকশনও করে দিতেন। আমাদের মফস্বল শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁর কাছে নাইন, টেন এবং ইলেভেনের ছেলেমেয়েরা পড়তে আসত। এর অন্য রকম সমস্যাও ছিল। বিভিন্ন জায়গার ক্লাব থেকে মাস্টারমশাইয়ের কাছে পুজো বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য চাঁদা চাইতে আসত। আশ্চর্য্যরকম ভাবে তিনি কাউকে না বলতেন না বরং বলতেন যে আমি নিজে ঠাকুর দেখতে গিয়ে চাঁদা দিয়ে আসব। এর পরে আর ওই ছাত্রদের কোনো উপায় থাকতো না। কারণ এর পরেও চাঁদা দিতেই হবে বলে জোর দিলে মনে হতে পারে যে মাস্টারমশাইকে ওদের পুজো প্যান্ডেলে যেতে বারণ করা হচ্ছে।

আমরা প্রায় সবাই ওই সময় মাস্টারমশাই না বলে সংক্ষেপে মাস্যাই বলতাম। আমার ওই কোচিং সেন্টারটা খুব ভালো লাগতো, কারণ ওখানে গিয়ে অন্যদের কোনো অঙ্ক আটকালে আমি দেখে দিতাম, আর আমার অংক আটকালে মাস্যাই দেখে দিতেন। একবার মনে আছে টেস্ট পেপারের একটা বেশ শক্ত অঙ্ক মাস্যাই অনেক সময় নিয়ে সমাধান করে দিলেন। তার কয়েকদিন পরে স্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাই ওই অঙ্কটা বোর্ডে করতে দিলেন। আমি ছাড়া আর কোনো ছাত্রই ওই অঙ্কটা করতে পারলো না। এতে মনে হয় অঙ্কের মাস্টারমশাই আরও শক্ত শক্ত অঙ্ক করতে দেবার অনুপ্রেরণা পেলেন। কিন্তু না, আমরা কেউই ওগুলোকে সমাধান করতে পারলাম না।

তবে অন্য আর একজন অঙ্কের মাস্টারমশাই আমাকে ISI-তে পরীক্ষা দিতে বলেছিলেন। তখন অবশ্য জানতাম না ISI কী বা স্ট্যাটিসটিক্স কী। ১৯৭৫ মানে সেই নকশাল আমল তখনও চলছে। দলে দলে ভালো ভালো ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া ছেড়ে অন্য অসামাজিক কাজে ব্রতী হচ্ছে। সরকারের পক্ষে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা ক্রমেই শক্ত থেকে শক্ততর হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা হলো হোম সেন্টারে। অর্থাৎ ছেলেদের পরীক্ষার সীট পড়লো পাশের মেয়েদের স্কুলে, আর মেয়েদের সীট পড়লো আমাদের স্কুলে।

গণটোকাটুকি বলতে কি বোঝায় তা প্রত্যক্ষ্য করার অভিজ্ঞতা হলো। শিবরামবাবুই ওই পরীক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। কাজেই ওঁর কাছে পড়া একজন অপেক্ষাকৃত কমজোরী মেধাসম্পন্ন একটি ছেলেকে আমার ঠিক পেছনের সীটে বসানোর বাবস্থা করলেন। সাধারণত ছেলেমেয়েরা ইংরেজি এবং অঙ্ককে ভয় করতো। কেন করতো বুঝতাম না, বা আজও হয়তো বুঝি না। ইংরেজি পরীক্ষার প্রথম পত্রে দেখলাম সে আমার নাম ধরে ডেকে বলছে যে, একটু সরে বস না। আমি একটু সরে বসলাম যাতে সে পেছন থেকে দেখতে পায় আমি কি লিখছি। সেদিনই বিকেলে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা। পরীক্ষা শুরু হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি জানালা দিয়ে বই বা আরও অন্য কিছু উড়ে উড়ে এসে পড়ছে পরীক্ষা হলে। আমার পেছনের ছেলেটি ওই রকম একটা বই কুড়িয়ে নিলো। দেখলাম ওটা একটা সাজেশন বই যাতে অসংখ্য ইংরেজি রচনা ইত্যাদি আছে। রচনার জন্য তিনটে অপশান থাকতো। আমার কোনোটাই কমন পড়েনি, তবুও আমি নিশ্চিন্ত যে ঠিক মতো লিখতে পারবো। পেছনের ছেলেটা একটা রচনা ওই বই থেকে লিখে নিয়ে দেখে আমি কি যেন ভাবছি। আমাকে ডেকে বললো যে রচনা কি তোর কমন পড়েছে। আমি বললাম না। তখন ও বললো যে দেখ আমার কাছে যে বইটা আছে তাতে দুটো রচনা পাওয়া যাচ্ছে। আমি একটা লিখেছি। তুই অন্যটা লেখ। তাহলে তো আর আমরা টোকাটুকি করেছি বুঝতে পারবে না। আমি বললাম, না রে! আমি নিজে থেকে যা পারবো, তাইই লিখবো।

পরীক্ষার পর মাস তিনেক ছুটি। এই সময়ে মনে হলো একটু শরীরচর্চা করা দরকার। এছাড়াও তো বিভিন্ন জায়গায় প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার সময়। বাবার এক বন্ধু একটা ক্লাব চালাতেন যেখানে জিমন্যাস্টিক, ব্যান্ড বাজানো ইত্যাদি শেখানো হতো। বাবার নাম করে সেখানে ভর্তি হলাম। মাস তিনেক যেতে না যেতেই বাবার বন্ধু আমাকে ডেকে বেশ একটু রাগত স্বরেই বললেন যে তিন মাসে ৭৫ পয়সা হয়েছে ক্লাবের চাঁদা। আমি যেন পরের দিন ৭৫ পয়সা নিয়ে আসি বাবার থেকে। অগত্যা রাতে বাবাকে বললাম ব্যাপারটা। বাবা কিন্তু আমি কোথায় কী করছি তা নিয়ে খুব একটা চিন্তিত ছিলেন না। কিন্তু যেই পয়সার কথা বললাম,

আমাকে বলে দিলেন যে আর যেতে হবে না, পয়সাও দিতে হবে না। কয়েক মাস পরেই যখন ন্যাশনাল স্কলারশিপ বা ।S। থেকে স্টাইপেন্ড পেয়েছি তখন অনেক বার মনে হয়েছে যে ওই ৭৫ পয়সাটা শোধ দিয়ে আসি। কিন্তু কোনো এক অভিমানবশতঃ আমি আর ওই দিকে পা বাড়াইনি।

হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোলো। আমার সামনে বসে যারা টোকাটুকি করল তাদের থেকে অনেক বিষয়ে আমি বেশি পেলাম। কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে তাদের দুজন আমার থেকে ৬ নম্বর বেশি পেয়ে স্কুলে ফার্স্ট হলো। এইরকম একজনকে তার বাড়িতে খুঁজতে গিয়ে শুনলাম যে বাড়িতে নেই। বাইরেই কাছাকাছি কোথাও আছে। পাশের মাঠে গিয়েও তাকে দেখতে না পেয়ে মাঠে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোককে ওই ছেলেটার নাম করে জিজ্ঞেস করলাম যে তাকে দেখেছে কিনা। উত্তরে তিনি ঘাড় নাড়ালেন। আমার মনে সন্দেহ হোল যে তিনি আমার ওই বন্ধুকে চেনেন তো? জিজ্ঞেস করতেই তিনি বলে উঠলেন আর ন্যাশনাল স্কলারশিপ পাওয়া ছেলেকে মুখ দেখলেই তিনি চিনতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে প্রশ্ন জাগলো যে কই তিনি আমাকে তো চিনতে পারলেন না। আমিও তো ন্যাশনাল স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে। তবে আরও একটা প্রশ্ন সেদিনই আমার মনে হয়েছিল যার কোনো সদুত্তর আজ পর্যন্ত পাইনি। আমার ধারণায় ন্যাশনাল স্কলারশিপ দেওয়া হয় গরীব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের যাতে তারা উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওই বন্ধুটির বাবা একটি ভালো মার্চেন্ট ব্যাংকে কাজ করতেন। তাহলে কী করে সে গরিব হয়? অবশ্য পরেও দেখেছি আমার এক সহকর্মীকে যে দিব্যি রেশন তোলার ফর্ম ফিল আপ করার সময় তার মাইনে আসলের থেকে অনেক কম করে দেখিয়ে অন্য ক্যাটাগরির রেশন কার্ড করালো। একই রেশন দোকানে আমি যখন পয়সা দিয়ে সব কিনছি, একই লেভেলে মাইনে পাওয়া সেই সহকর্মী গিয়ে বিনে পয়সায় সব নিয়ে আসছে। একে জানি না কি বলে, চালাকি, ধূর্ততা না কি স্রেফ অসততা। আমার জীবনে আমি দেখেছি যারা চালাক হয় তারা সজ্ঞানে মিথ্যে কথা বলতে পারে। কাজেই তাদের কাছে সততা হয়তো আশা করতে নেই।

যাইহোক, অবশেষে প্রবেশিকা পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ইত্যাদির শেষে একদিন ।SI-এ এসে দেখি আমি বি-স্ট্যাটে পড়ার সুযোগ পেয়েছি। খবর নিয়ে জানলাম যে প্রত্যেক মাসে ১০০ টাকা স্টাইপেন্ড পাব পরবর্তী ক্যালকুলেশন করলাম যে বাড়ি থেকে যাতায়াত করব নাকি হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করব। মোটামুটি যা জানতে পারলাম যে হোস্টেলে থাকলে মাসিক ১০০ টাকায় হবে না অন্তত ১২৫ টাকা লাগবে। কাজেই এই অপশন আমার জন্য নয় বরং মাসিক বাস ভাড়া এবং আইএসআই ক্যান্টিনে টিফিন নিয়ে মোট ৪৫ টাকায় হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে মাসে অন্তত ৫০ টাকা আমি সংসারে দিতে পারব। অগত্যা দ্বিতীয় অপশনটাই বেছে নিলাম। পরে যখন ন্যাশনাল স্কলারশিপের অফিস থেকে চিঠি পেয়ে জানলাম যে আমাকে নিম্নোক্তর দুটির একটি বেছে নিতে হবে। এক আমি ন্যাশনাল স্কলারশিপ সার্টিফিকেট নিতে পারি, কিন্তু তাহলে আর স্কলারশিপের টাকাটা পাবো না। দুই আমি মাসিক ১০০ টাকা হিসেবে কয়েক বছরের জন্য টাকা নিতে পারি কিন্তু তাহলে কোন সার্টিফিকেট পাবো না। আমার কাছে প্রথম অপশনটাই শ্রেয় মনে হলো। কিন্তু বাবার ক্যালকুলেশন বোধহয় অন্যরকম ছিল। উনি হয়তো ভেবেছিলেন যে এমনিতেই মাসে ৫০ টাকা করে তো আমি দিচ্ছিই, এর ওপর যদি আবার মাসে ১০০ টাকা করে স্কলারশিপ যোগ হয় তাহলে সংসারটা আরো ভালোভাবে চলতে পারে। তাই তিনি শুধু দ্বিতীয় অপশনটাই দিলেন না, রীতিমতো যে সংসারে মা এতদিন অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে এত কম রোজগারের মধ্যেও চালাচ্ছিলেন, সেই মায়ের হাত থেকে সংসার চালানোর দায়িত্বও নিজে নিয়ে নিলেন। অবশ্য মাস তিনেক যেতে না যেতেই তিনি বুঝেছিলেন যে সংসার চালানো অত সোজা নয়। তাই তিন মাসের মধ্যেই ব্যাক টু স্কোয়ার ওয়ান।

ইতিমধ্যে কোন্নগর থেকে ।SI-তে পড়ার সুযোগ পেয়েছি বলে হয়তো অনেকেই আমার নাম জেনে থাকবে। বাবার বন্ধুর ক্লাবে যিনি জিমন্যাস্টিকের দায়িত্বে ছিলেন তার ছেলেকে অঙ্ক দেখিয়ে দেবার কথা বললেন একদিন। আসলে আমার মনের মধ্যে ঐ তিন মাসে ৭৫ পয়সা না দেবার একটা অস্বস্তি তখনও চলছে। তাই রাস্তাতে একদিন ওনাকে দেখে পাশ কাটিয়ে চলে

যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু উনি নাম ধরে ডেকে কথাটা পাড়লেন। আমি বললাম যে ঠিক আছে, কিন্তু আমি প্রথমত কোনো টিউশন ফী নেবো না। দ্বিতীয়ত, সপ্তাহে কোনো সময় বা দিন নির্দিষ্ট করাও থাকবে না। ISI-থেকে ফেরার পথে বাস থেকে নেমে যেদিন একটু সময় পাবো, আমি দেখিয়ে দিয়ে যাবো। সেই কথা মতো একদিন বাস থেকে নেমে ওদের বাড়ির দরজায় কড়া নেড়েছি। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। পড়াতে শুরু করেছি ওদের একটা ঘরে। কিচ্ছুক্ষণ পর ওর এক দিদি প্লেটে করে কিছু নিয়ে এলেন। তখন আমার মধ্যে না জানি কি অদ্ভুত Ideology চলছে । এমনিতে চায়ের নেশা আমার কোনোদিনই ছিল না। কিন্তু গরীব হবার জন্যই কিনা জানি না, কফির প্রতি একটা লোভ ছিল। তার সংঙ্গে ছিল গরীবতার অহংকার। মনে মনে ঠিক করেছিলাম যে আমাকে যেহেতু পয়সা দিয়ে পড়াশুনো করতে হয়নি, তাই আমিও পড়ানোর জন্য কারো থেকে পয়সা নেবো না। শুধু তাই নয়,আমি যদি কাউকে বাড়ি গিয়ে পড়াইও তো তাদের বাড়িতে আমি কিছু খাবো না, যাতে আমার পড়ানোর জন্য তাদের ওই ইলেক্ট্রিকের খরচা ছাড়া আর কোনো খরচা না হয়। ISI থেকে ফেরার পথে তখন পেটে ক্ষিদে এবং তেষ্টা দুইই কাজ করছে। তবুও স্বামী বিবেকানন্দর মতো দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলাম যে আমি কিছু খাবো না। হয়তো মনের মধ্যে এইসব চলছিল বলে কথাগুলো খুব একটা নরম স্বরে বলেছিলাম বলে মনে হয় না। কাজেই ছেলেটির দিদি আর কোনো অনুরোধ না করেই যা এনেছিলো তার সবটাই নিয়ে চলে গেলো। পাশ দিয়ে যাবার সময় হটাৎ করেই নাকে সুন্দর কফির গন্ধ এলো কিন্তু ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গেছে। পরে ভেবেছিলাম আর একবার সুযোগ পেলে আর ওই ভুল করবো না। কিন্তু তারা আমাকে আর দ্বিতীয় সুযোগ দেয়নি। আর আমার গরীবতার অহংবোধটা নিজে থেকে নিজের জন্য কিছু চাইবার ইচ্ছেশক্তিও দেয়নি।

ISI-তে প্রথমদিকের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। বেশ কিছু দিন ক্লাস হবার পর একদিন শুনলাম নবীনবরণ উৎসব হবে। তখনকার জিওলোজি হলে এক সন্ধেবেলায় এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে একে একে আমাদের পরিচয় দিতে হলো। অনুষ্ঠানের শেষে কিছু স্ন্যাক্স এবং চা বা কফি কিছু একটা ছিল। এত দিন ক্লাস

হওয়া সত্ত্বেও কোনোদিন খোঁজই নিইনি কোথায় টয়লেট আছে। কাজেই গরীবতা ছাড়াও আরো কতকগুলো বদগুণ আমার ছিলো বা এখনো আছে। সেটা হচ্ছে নিজের দরকার অন্য কাউকে না বলতে পারা। অন্তর্মুখী হওয়াও আর এক বৈশিষ্ট। কাজেই এমন অনেকদিনই গেছে যেদিন পেট খারাপ হয়েছে, ক্লাসে বসে পেটে ভুট-ভাট শব্দ হচ্ছে, কিন্তু তবুও টিপে টিপে বাড়ী গিয়ে তবে পেট খালি করেছি। অনেকদিন হয়তো পুরোটা চাপতেও পারিনি, কাজেই যা হলদে হবার হয়েছে। নবীনবরণের দিন একে তো সকাল থেকে প্রোগ্রাম শেষ হওয়া পর্যন্ত টয়লেট না গিয়ে থাকা, তার ওপর চান্যাচুর, সিঙ্গারা ইত্যাদি অতীব প্রিয় জিনিস বিনা পয়সায় খেতে পাওয়ার লোভ -- এই দুই মিলিয়ে সেদিন পেট আর বাগ মানতে চাইছে না। তবুও কাউকে জিজ্ঞেস করলাম না কোথায় টয়লেট আছে। অগত্যা ।SI-এর মেন্ গেট থেকে বেরিয়ে বাসের অপেক্ষায় আছি, মনটা কিন্তু পেটের গতিবিধির উপরই ন্যস্ত। একটা সময় মনে হলো যে আর পারবো না। গেট থেকে ডানদিকে হোস্টেলে যাবার যে ইটবাঁধানো রাস্তা ছিল, তার দিকে তাকালাম। দেখলাম জায়গাটা আলো-আঁধারিতে ঢাকা। তার ওপর রাস্তাটা একটি নর্দমার পাশ দিয়েই গেছে এবং নর্দমার ধারে কিছু ছোটখাট ঝোপঝাড়ও আছে। কাজেই আর দেরী না করে একটু হোস্টেলের দিকে এগিয়ে গিয়েই বসে পড়লাম। সে যে কী আরাম। মনে করিয়ে দেয় সেই গোপাল ভাঁড়ের একটা গল্পের কথা।

।SI-তে ঢোকার পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার কথা মনে পড়ে। বি. স্ট্যাট ফোর্থ ইয়ারের দু একটা ইনটেরেস্টিং ঘটনার কথা এখনও মনে আছে। এটা বি. স্ট্যাটের ফাইনাল সেমিস্টার। প্রফেসর ওয়াই আর কে শর্মা আমাদের কোনো একটা বিষয় পড়াচ্ছেন। তাঁর পড়ানোর ধরণ আর যাই হোক বিষয়ের প্রতি ইন্টারেস্ট জাগাতে সাহায্য করে না। একদিন তাঁর ক্লাস একদম দিনের শুরুতে। আমরা যে কজন ডে স্কলার ছিলাম তারা ক্লাসে হাজির। প্রফেসর শর্মা তখনও ক্লাসে ঢোকেননি। আমরা লক্ষ্য করলাম যে বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী যারা হোস্টেলে থাকত, তাদের কেউ আসেনি। খবর নিয়ে জানা গেল যে হোস্টেলে জল নেই, তাই কেউই আসতে পারবে না। ওদিকে প্রফেসর শর্মা সম্মন্ধে

যেটুকু ধারণা ততদিনে হয়েছে, তাতে বলেই দেওয়া যায় যে তিনি কিন্তু কোনো মতেই ক্লাস ক্যান্সেল করবেন না। তাই আমরা যে কজন ছিলাম তারা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা সকলে মিলে লাইব্রেরিতে গিয়ে বসে থাকবো যতক্ষণ না হোস্টেলের ছেলেমেয়েরা আসছে। ওনার ক্লাসের তো আলাদা কোনো টান নেই, তাই এই সিদ্ধান্ত নিতে কারোরই কোনো অসুবিধা হলো না। আমাদের এই জনা চারেক ডে স্কলারের মধ্যে 'মামা ' বলে একজনকে ডাকা হতো। এই মামা একধারে ডে স্কলার, আবার সে কিন্তু হোস্টেলের সব সুযোগ সুবিধাও নিত। কারণ সে থাকতো বনহুগলির উত্তরায়ণ আবাসনে, যেটা আমাদের ২০৫-এর গেটের প্রায় উল্টোদিকে। হটাৎ করে আমরা কয়েকজন যখন লাইব্রেরিতে বসে আছি তখন মামা বললো, 'হ্যাঁরে, এরকমও তো হতে পারে যে আমরা এখানেই বসে রইলাম আর হোস্টেলের ছেলেমেয়েরা এসে ওয়াই .আর .কে শর্মার ক্লাসটা করে নিলো, উপস্থিত আমাদের সকলের মনে হলো যে মামা তো ভুল কিছু বলেনি। মামা নিজেই বললো যে আমি একবার গিয়ে দেখে আসব? আমরা সবাই তাতে সায় দিলাম। কিন্তু মামা সেই যে গেল দেখতে আর ফিরলো না। আমরা বাকি যে কজন ছিলাম, আরো কিছুক্ষণ লাইব্রেরিতে কাটিয়ে দ্বিতীয় ক্লাস শুরুর আগে যখন ক্লাসে গেছি তখন আমরা স্তম্ভিত। মামা একাই প্রফেসর শর্মার ক্লাসটা করছে। গল্প আমাদের এখান থেকেই শুরু। মামা নিশ্চই প্রফেসর শর্মাকে বলেছে যে কেন বাকিরা ওনার ক্লাসে আসতে পারেনি। সব কিছু শুনে প্রফেসর শর্মার মনে হয়েছে যে মামাকে বাড়তি কিছু দিতেই হবে, কারণ আমাদের বাধা সত্ত্বেও সে এসে প্রফেসরের ক্লাসটা একাই করেছে।

যেমন ভাবা তেমনই কাজ। যদিও পরের ক্লাসগুলো আমরা বেশিরভাগই উপস্থিত ছিলাম। যখন পিরিয়ডিকাল পরীক্ষা এল ওনার পেপারের এবং যখন উনি উত্তরপত্রগুলো দেখে নম্বর দিয়ে আমাদের হাতে দিলেন তখন তো আমাদের চক্ষু চড়কগাছ। উনি কাউকে চল্লিশ পার্সেন্টের বেশি দেননি, শুধু মামা ছাড়া। মামার ক্ষেত্রে ৮০-৮২ নম্বরের উত্তর লিখেও মামা পেল ৯৬। আর বাকিদের খাতা দেখে মনে হচ্ছে উনি লাল কালির একটা তলোয়ার হাতে নিয়ে আমাদের খাতাগুলোর সঙ্গে

যুদ্ধ করেছেন। খাতার যেখানে সেখানে লাল পেন চালিয়ে দিয়েছেন আর নম্বর কেটেছেন । সাধারণত ছাত্র ছাত্রীরা নম্বর পেয়ে খুশী না হলে প্রফেসরদের কাছে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করে কেন অত নম্বর কাটা হলো। অনেক সময় প্রফেসরের ভুল থাকলে তিনি সেটা মেনে নিয়ে নম্বর বাড়িয়ে দেন। বহুকাল থেকে আই.এস.আই-তে এই সিস্টেম চলে আসছে। এখনও আমাদের খাতা দেখা হয়ে গেলে আমরা ছাত্র ছাত্রীদের বলি খাতাগুলো চেক করে নিতে। তার পরেই তাদের নম্বর ডিনস অফিসে জমা করা হয়। কিন্তু প্রফেসর শর্মার নম্বর কাটা দেখে খুবই পরিষ্কার ছিল যে উনি মামাকে ছাড়া আর কাউকেই নম্বর দিতে চাননি বা মামা ছাড়া সকলকেই ফেল করিয়ে দিতে চেয়েছেন। সেজন্যেই আমরা সকলে মিলে ঠিক করলাম যে খাতা আর চেক করে প্রফেসর শর্মার করা ভুলগুলো শোধরানোর চেষ্টা করে লাভ নেই, কারণ ওগুলো তো ভুল নয়, ইচ্ছাকৃত নম্বর কাটা হয়েছে কোনো কারণ ছাড়াই। অগত্যা আমরা ডীনের শরণাপন্ন হলাম। ডীন তখন ছিলেন প্রফেসর টি. কৃষ্ণান। উনি খুব ছাত্র দরদী ছিলেন। ওনার সময়ই একটা ইন্টারেষ্টিং জিনিস চালু হয়েছিল। সেই সময় তিন ঘন্টা পরীক্ষার পর যদি কোনো পেপারে ছাত্র ছাত্রীদের অনুরোধে অন্তত আধ ঘন্টা এক্সট্রা টাইম দেওয়া হতো ,তাহলে যারা ওই এক্সট্রা টাইমটা কাজে লাগাত তাদের পরীক্ষার হলে ডীনস অফিস থেকে দুটো সিঙ্গারা আর চা বিনা পয়সায় খাওয়ানো হতো। উনি ডীন থাকাকালীন এ ব্যাবস্থা করলেও পরে সেই ব্যাবস্থা ছিল বলে মনে হয় না।

যাই হোক, ডীনের কাছে দরবার করা হলো। উনি পরিষ্কার করে জানিয়ে দিলেন যে উনিও প্রফেসর শর্মার মতোই একজন শিক্ষক যিনি কেবল দুবছরের জন্যে ডীনের দ্বায়িত্ব নিয়েছেন। কাজেই ওনার ছাত্র ছাত্রীদের বিনা পয়সায় সিঙ্গারা ও চা খাওয়ানোর এক্তিয়ার আছে, কিন্তু এমন কোনো ক্ষমতা নেই যে উনি কোনো শিক্ষকের ওপর কোনো এ্যাকশন নিতে পারবেন। তবে আমাদের মুখ চোখ দেখে ওনার নিশ্চই মনে হয়েছিল যে কোথাও না কোথাও শিক্ষকের তরফ থেকেই কোনো ভুল হয়েছে। তাই উনি বললেন যে আমাদের খাতাগুলো প্রফেসর জে কে ঘোষ-কে দেখাবেন যদি প্রফেসর ঘোষ

মনে করেন যে শিক্ষকের তরফ থেকে কোনো ইচ্ছাকৃত ভুল হয়েছে তাহলে উনি ইস্যুটা ডিরেক্টরকে জানাবেন। আমরা সকলে ওনার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম এবং সব খাতাগুলো (বোধহয় মামারটা ছাড়া) ওনার হাতে জমা দিয়ে এলাম। ইতিমধ্যে ক্লাস যেমন চলছিল তেমনই চলছে। বেশ কিছুদিন পর প্রফেসর কৃষ্ণান জানালেন যে প্রফেসর ঘোষ বলেছেন যে ছাত্রছাত্রীদের ওপর অন্যায় হয়েছে। অতএব কথা মতো প্রফেসর কৃষ্ণান প্রফেসর ঘোষের মতামত তত্কালীন ডাইরেক্টরকে জানালেন। ডাইরেক্টর একদিন আমাদের সকলকে (মামা ছাড়া) ডেকে পাঠালেন এবং আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে আই. এস. আই তে কোনো শিক্ষক ভুল করলে বা অন্যায় করলেও তিনি কোনো এ্যাকশান নিতে পারবেন না। কারণ আই.এস.আই যেহেতু একটা রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং শিক্ষকরা রিসার্চ করার জন্যই আছেন, তাদেরকে দিয়ে বিভিন্ন কোর্সে পড়ানো হচ্ছে বটে, তবে যে কোনো দিন তারা পড়ানো বন্ধ করে দিতে পারেন। কাজেই কোনো শিক্ষকের প্রতি কোনো রকম এ্যাকশান নেওয়া হলে সকল শিক্ষক এক হয়ে যদি পড়ানো বন্ধ করে দেন, তাহলে এতদূর পর্যন্ত এসেও আমরা কিন্তু বি. স্ট্যাটের সার্টিফিকেটটাও পাবো না।

কিন্তু আমাদের শরীরে তখন টিন এজের রক্ত বইছে। কাজেই আমরা কোনো ভয়ে ভীত নই। আমাদের প্রথম এবং একমাত্র দাবী যে প্রফেসর শর্মাকে বহিস্কার করতে হবে। কারণ, উনি এত নিচ কাজ করেছেন যে ওনার আই.এস .আই-তে পড়ানোর আর অধিকার নেই। শুধু তাই নয়, আমাদের খাতাগুলোও ঠিকমতো দেখে নম্বর দিতে হবে। কিন্তু আমরা তখনও বুঝতে পারিনি যে এতগুলো ছেলেমেয়ের ওপর যে অন্যায় হোলো, আই.এস.আই তে তার কোনো প্রতিকার পাওয়া যাবে না। উপরন্তু ডাইরেক্টর আমাদের বললেন যে যেহেতু শিক্ষক সমিতির মিটিং হয়ে সব বিষয়ের নম্বর নির্ধারিত হয়ে গেছে, তাই ঐ নম্বরগুলোও নাকি আর বাড়ানো যাবে না। তবে উনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে সেমেস্টারের পরীক্ষায় যাতে এরকম বৈষম্য না হয়, যাতে যে যেমন উত্তর লিখবে সেই অনুযায়ী নম্বর পায়, সেটা উনি দেখবেন। অর্থাৎ আমাদের ওপর অন্যায় হোলে সেটা ভুলে যেতে হবে। ঐ বয়সে ঐ

অন্যায় আবদার মেনে নেওয়া যায় না। তাই আমরা ঠিক করলাম যে প্রফেসর শর্মার পেপারটার পরীক্ষাই আমরা আর দেব না। এটাই আমাদের প্রতিবাদ। আমাদের অনেকেরই মনে হচ্ছিল যে এর ফল কি হতে পারে। আমাদের একটা পেপার ইনকমপ্লিট থাকলে আমরা তো বি. স্ট্যাটের সার্টিফিকেটও পাবো না। তবুও আমরা সবাই (মামা শুদ্ধ) ওনার পরীক্ষা বয়কট করলাম। এগুলো সবই বি. স্ট্যাটের ফাইনাল ইয়ারের ফাইনাল সেমেস্টারের পেপার।

পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর এক মাসের জন্য সকলকে দিল্লী যেতে হলো ওখানে সি.এস.ও ট্রেনিং করতে। এই প্রথম সকলে মিলে বাড়ির বাইরে পা রাখা। ওখানে হোস্টেলে থাকার এবং খাবার ব্যাবস্থা আছে। দিল্লী পৌঁছানোর পর এক একটা ছোট ছোট দল করে কেউ আগ্রা যাচ্ছে তো কেউ হিমালয়ের দিকে, আবার দিল্লীও ঘুরে দেখতে হচ্ছে। সি.এস.ও ট্রেনিং কি হচ্ছে জানা নেই। অনেকের সঙ্গেই দেখাই হয় না। অর্থাৎ যে একাত্মবোধ আমাদের মধ্যে এতদিন কাজ করছিল, সেটার অনেকটাই অভাব হতে থাকল। তখন যিনি ডিরেক্টর ছিলেন তিনি প্রফেসর বি.পি. অধিকারী। শুনেছিলাম উনি খুব দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। আমাদের ছন্নছাড়া ভাব দেখে উনি একটা চাল চাললেন। হটাৎই আমাদের মধ্যে রটিয়ে দেওয়া হলো যে প্রফেসর শর্মার যে পেপারের আমরা পরীক্ষা দিইনি, সেই কোশ্চেন পেপারটা দিল্লীতে এসে গেছে এবং আমাদেরই মধ্যে চার পাঁচ জন ওই পরীক্ষা দিতে রাজী হয়ে গেছে। দিল্লীতেই পরীক্ষা হবে, কিন্তু কোন চার পাঁচ জন তা জানা নেই। সকলের মধ্যেই একটা ভয় কাজ করছিল যে এত বছর পড়াশুনা করে পরীক্ষা দিয়ে যদি শেষে সার্টিফিকেট না পাই তাহলে তো ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কাজেই প্রশাসকদের চাল কাজে দিল। আমরা সকলে নির্দিষ্ট দিনে দিল্লীতেই ওই বিষয়ে পরীক্ষাটা দিয়ে দিলাম। অবশ্য ডিরেক্টর তাঁর কথামতো যে যেমন উত্তর দিয়েছে সে সেরকম নম্বর যাতে পায় সেই ব্যবস্থা করেছিলেন। আমাদের ওই ছোটবেলায় যে একটু আন্দোলন আন্দোলন মাখা অনুভুতি, ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা সবটাই দিল্লিতে ফেলে চলে এলাম। পরীক্ষার ফল বেরোনোর পরে এম. স্ট্যাটে যে যার পছন্দ মতো বিষয় নিয়ে আবার পড়াশোনায় মনোযোগ দিয়ে দিল।

এর কিছুদিন পরেই কনভোকেশনের তারিখ ঘোষণা করা হল এবং আমরা যারা ওই কনভোকেশনে বি. স্ট্যাটের সার্টিফিকেট পাব, তাদেরকে কনভোকেশনের পর নৈশ আহারের জন্য নিমন্ত্রণ পত্রও দেওয়া হলো। আই.এস.আই.-তে এটাই প্রথা। যারাই সার্টিফিকেট পাবে তাদের নিমন্ত্রণ থাকবে, তা সে যে ডিগ্রীই হোক বা ডিপ্লোমাই হোক না কেন। সাধারণত কোনো এক শিক্ষকের পক্ষ থেকে এই নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়। আমাদের কপাল এমনই যে ওই বছর সকলকে নিমন্ত্রণ করলেন প্রফেসর শর্মা। অন্য সময় হলে হয়তো আমরা নিমন্ত্রণ বয়কট করতাম। জানি না দক্ষ প্রশাসক প্রফেসর অধিকারীর ওটা আর একটা চাল ছিল না। হয়তো ভেবেছিলেন যে আমরা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলে প্রফেসর শর্মার হয়তো প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, আমরা সকলেই ওইদিন রাতের খাবার খেয়েছিলাম। তবে ওঁকে ক্ষমা করে নয়। তাই তো এতদিন পরেও (প্রায় ৪৪ বছর) ওই ঘটনাগুলো সাজিয়ে লিখতে পারছি। আমাদের ব্যাচে দুটো মেয়ে ছিল। এবার ওই নৈশ ভোজের রাত্রে যে ঘটনা আমার চোখের সামনে ঘটলো, তাও ওই প্রফেসর শর্মাকে নিয়ে। তাই বলবো। এত কিছুর পরেও যে প্রফেসর শর্মা আমাদের সামনে আসতে সাহস পাবেন তা ভাবতে পারিনি। আমাদের এখনকার লাইব্রেরী বিল্ডিং তখন তৈরি হচ্ছে। কয়েক তলা তৈরি হয়েছে, আরো কয়েক তলা তৈরি হচ্ছে। ওই বিল্ডিংয়ের কোনো এক তলায় রাতের খাবারের আয়োজন হয়েছিল। ব্যুফে সিস্টেম, কারণ অনেক ছাত্রছাত্রী, বেশ কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকাও এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিও ছিলেন।

কিন্তু ওই যে "birds of a feather flock together"। আমাদের ব্যাচের ছেলেমেয়েরা মোটামুটি খাবার প্লেটে নিয়ে এক জায়গায় জড়ো হওয়া চেষ্টা করছি। আমার সামনে মেয়ে দুটিও প্লেটে খাবার নিয়ে খাচ্ছে। আমাদের ডে-স্কলারদের সকলকেই বাড়ি যেতে হবে, তাই খাওয়ার তাড়া আছে। হঠাৎই একটা প্লেটে কিছু খাবার নিয়ে প্রফেসর শর্মা এগিয়ে গেলেন ওই মেয়ে দুটোর দিকে। হয়তো খেয়াল করেননি যে আমি আশেপাশেই আছি। তিনি অনেকটা ধমকের সুরেই মেয়েদুটিকে বললেন, why did you join

them? I have separately increased your marks already। শুনে আমি তো স্তম্ভিত। আমরা সকলেই জানতাম যে মামা ছাড়া আমরা বাকী সবাই চল্লিশের নিচে পেয়েছি, যেটা উনি অন্যায়ভাবে নাম্বার কেটে দিয়েছেন। এবং সেজন্যই আমরা মামাকে চাপে রেখে একজোট হয়ে লড়াই চালানোর চেষ্টা করেছি। প্রফেসর শর্মাকে যে আমরা আমাদের নম্বর রিকন্সিডার করতে বলবো না, তাও আমাদের যৌথ সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু তার মধ্যেই মেয়ে দুটো কোনো এক সময় গিয়ে তাদের হাসি মুখ দেখিয়ে নাম্বার বাড়িয়ে নিয়েছে! আমরা কেউ জানিই না! যেটা আমার মনে হল যে এই পৃথিবীতে নীতি নিয়ে বা মেনে চলার লোক সত্যিই কম। অথবা অন্যভাবে ভাবলে, যেটা আমার এক সহকর্মী বলতো, যে ওনার নীতি হচ্ছে অন্যকে ল্যাং মেরে ফেলে নিজে এগিয়ে যাবে। এটাও তো একটা নীতি যেটা চূড়ান্ত স্বার্থপরেরা করে। তবে এমন লোকের সংখ্যা যে খুব কম তাই বা কেউ হলপ দিয়ে বলতে পারবে?

যাক বি. স্ট্যাট ফোর্থ ইয়ারের শেষের দিকের আরও কয়েকটা ঘটনার কথা এখনো ভুলতে পারিনি। এক প্রফেসর এসেছেন আমেরিকার পারডিউ ইউনিভার্সিটি থেকে। তিনি বাঙ্গালী। শোনা যায় তার পি.এইচ. ডি-র সুপারভাইজার স্ট্যাটিস্টিক্সের ইনফারেন্সের এক বিখ্যাত লোক। সবাই তাকে এক ডাকে চেনে। নাম Lehman। এই Lehman-এর লেখা একটা বিখ্যাত বইও আছে। আমাদের ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরীতে তার একটাই কপি ছিল। এটাও শোনা যায় যে বাঙ্গালী হওয়ার জন্য তিনি নাকি পারডিউ ছেড়ে পাকাপাকিভাবে আই.এস.আই-তে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দক্ষ প্রকাশক তাকে আপাততঃ এক বছরের কন্ট্রাক্ট দিয়েছিলেন এবং আমাদের গিনিপিগ বানিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি আমাদের তার পি.এইচ.ডি.র বিষয়টাই পড়াবেন। স্ট্যাটিস্টিক্সের সংজ্ঞার মধ্যেই ইনফারেন্স জড়িত। কাজেই, আমাদের জন্য একটা ভাইটাল বিষয়। ভদ্রলোকের বেশ মোটাসোটা শরীর, চোখে খুব হাই পাওয়ারের লেন্স আর সারাক্ষণ মুখে একটা চুরুট থেকে ক্রমাগত ধোঁয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। ফলতঃ গলার স্বর অনেক মোটা এবং গম্ভীর শোনায়। প্রথমে এসেই উনি ওই Lehman-এর বইটা লাইব্রেরী থেকে

নিয়েছেন এবং ঠিক করেছেন ওই বই থেকেই পড়াবেন।

তাঁর পড়ানোর ধরন অনেকটা সেইসব শিক্ষকদের মতো যারা তৈরি না হয়ে ক্লাস নিতে চলে আসেন। পরে আমরা অনেকেই পি.পি.টি তৈরি করে বা যা পড়াবো তার একটা সফ্ট কপি তৈরি করে ক্লাসে পড়িয়েছি। কোভিড এবং কোভিড পরবর্তী জীবনে অনেকেই আমরা ওইভাবে ক্লাস নিতে বাধ্য হয়েছি। আর ইন্ডাস্ট্রিতে ট্রেনিং দিতে গেলেও ব্ল্যাকবোর্ডের পরিবর্তে সকলেই পি.পি.টি. ব্যবহার করেই পড়ায়। কিন্তু সত্তরের দশকে কোথায় পি.পি.টি. বা সফ্ট কপি? খুব সম্ভবত আমেরিকা আমাদের থেকে টেকনোলজিতে অনেক এগিয়ে থাকলেও তখনও এসবের শুরু আমেরিকাতেও হয়নি। কাজেই ব্ল্যাকবোর্ডই ভরসা। কিন্তু তিনি যে বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে বইয়ের পাতা খুলে সেখান থেকে দেখে দেখে সবটা বোর্ডে লিখবেন, এটা আমরা কেউই কল্পনা করতে পারিনি। কিন্তু দিনের পর দিন তিনি তাই করতে থাকলেন আর কেউ বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলে তিনি ধরে নিতেন যে বোর্ডে তাঁর হাতের লেখা হয়তো বোঝা যাচ্ছে না। এটা ঠিক যে হাতের লেখা তাঁর একদমই ভালো ছিল না।

কোনো প্রশ্ন করলেই মুখে কোনো উত্তর না দিয়ে তিনি পুরো বোর্ডে যা লিখেছিলেন সেটা মুছে, আবার বই থেকে সেই জিনিসটাই লিখতেন। মুখে তো পাইপ থেকে সারাক্ষণ ধোঁয়া বেরিয়েই চলেছে। তাতে যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে সেটার দিকে তাঁর নজর বেশি ছিল বলেই মনে হয়। ক্লাসে থেকেও যেহেতু কিছু বোঝা যাচ্ছে না, আস্তে আস্তে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ওনার ক্লাসে কমতে শুরু করল। কিন্তু তাতে তাঁর কিচ্ছু যায় আসে না। এই করতে করতেই একদিন তাঁর বিষয়ের পিরিয়ডিক্যাল পরীক্ষা চলে এল। তিনি হঠাৎই ঘোষণা করলেন যে আমেরিকার মতো ওপেন বুক পরীক্ষা নেবেন। আমাদের সকলের কাছেই ব্যাপারটা নতুন। ওপেন বুক পরীক্ষা মানে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নোটস, বই ইত্যাদি যেগুলো থেকে টোকাটুকি করা যায়, সেগুলো পরীক্ষার হলে নিয়েই বসতে পারবে এবং দরকার হলে সেখান থেকে টুকতেও পারবে।

সবই বৈধ। তাহলে আর চিন্তার কি? কিন্তু না, ওপেন বুক পরীক্ষার মানে যে প্রশ্নপত্র এমন হবে যেটা সরাসরি কোন বই বা নোটসে পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ সব প্রশ্নই এমন হবে যে সবকিছু সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও কোনটাই কোনো কাজে আসবে না। পুরোটাই নিজেকে জেনে-বুঝে উত্তর লিখতে হবে। অর্থাৎ এটা একটা অন্য রকমের চ্যালেঞ্জ ছাত্রছাত্রীদের কাছে। মোদ্দা কথা আমাদের কারও কাছে বইও নেই। কারণ লাইব্রেরীর একমাত্র বইটাই উনি নিয়ে রেখেছেন। আর বিদেশী বই হওয়াতে তার দাম এত বেশি যে স্বতন্ত্রভাবে কারও পক্ষে তা কেনা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, লাইব্রেরিতেও একটা মাত্র কপি রাখা আছে। যদিও অনেক সস্তা বইয়ের একাধিক কপি লাইব্রেরীতে রাখা হয় ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে। কাজেই আমাদের সকলের কাছেই এ যেন একটা যাঁতাকলের মত। শূন্য পাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। পরীক্ষার আগে যে একটু পড়ে নেবো, তারও কোনো উপায় আমরা রাখিনি। কারণ তার বিরক্তিকর পড়ানো দেখে আমরা যারা ওনার ক্লাসও করেছিলাম, তারাও কোনো নোটস নিইনি। এমতাবস্থায় পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসতে থাকলে সকলের মধ্যে ক্রমশ এক অদ্ভুত হতাশা জন্মাতে লাগল।

আমি প্রথমত ডে স্কলার হওয়াতে বাকিরা কী ভাবছে কিছুই জানতে পারতাম না। অবশেষে ওই বিষয়ের পরীক্ষার দিন দুই আগে খবর রটে গেল যে হোস্টেলে কয়েকজন ছাত্রছাত্রী কিছু নোটস জোগাড় করেছে। অগত্যা আমরা ডে স্কলাররা একদিন হোস্টেলে চলে গেলাম। গিয়ে শুনলাম এক অবাক করা কান্ড। আমাদেরই কয়েক বছরের সিনিয়র একজন ছাত্র অনির্বাণদা ওই বিষয়ই গবেষণা করছে আই.এস.আই.তেই। দেখতে ছোটখাটো, চোখে চশমা। খুবই ভালো ছেলে বলেই আমরা জানি। প্রত্যেকবারেই হয় প্রথম না হয় দ্বিতীয় হতো। একই বিষয়ে গবেষণা করার জন্য এবং যে বইটা থেকে প্রফেসর পড়াচ্ছিলেন সেটা ওই বিখ্যাত লোকের লেখা বলে অনির্বাণদা ওই বইয়ের একটা নিজস্ব কপি কিনেছে বা জোগাড় করেছে। হোস্টেলে থাকার সুবাদে আমাদের ক্লাসের অনেকের সঙ্গেই খুব ভালো সম্পর্ক তার। তাই যখন আমাদের ছেলেরা তাকে ধরে বলল যে আমরা কি বিপদেই না পড়েছি, তখন

একটু ভেবেচিন্তে অনির্বাণদা বলেছিল, দেখ, এই ধরনের ওপেন বুক পরীক্ষা তো আই.এস.আই.তে হয় না। তার ওপর শিক্ষকও নতুন। কাজেই কি ধরনের প্রশ্ন হবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে আমার কাছে যেহেতু বইয়ের একটা কপি আছে, আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এই, যে চ্যাপ্টারগুলো উনি পড়িয়েছেন, সেই চ্যাপ্টারগুলোর শেষে যে প্রশ্নগুলো করা আছে সেগুলো আমি তোদের জন্য সলভ করে দিতে পারি।

কিন্তু আমি তো একটা খাতায় সব করে দেব। তোরা এত জনে ওই একটা খাতা থেকে কী করবি? মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশে তখনও ফটোকপির যুগ আসেনি, যে টুক করে গিয়ে কয়েক কপি বানিয়ে নেওয়া যাবে। তবে ছাত্র-ছাত্রীরাও তো কম যায় না | একজন বুদ্ধি দিল যে আমরা কার্বন কপি তো করতে পারি। ব্যাস, আমরা সবাই মিলে বসে গেলাম অনির্বাণদার দেওয়া নোটসের কার্বন কপি করতে। অর্থাৎ দুটো সাদা কাগজের মধ্যে কার্বন পেপার দিয়ে লেখা, যেমন দোকানে বিলটিল গুলোর কপি রেখে দিত। কিন্তু একটা করে কপি করলে তো এক জনের সঙ্গে শেয়ার করা যাবে। অল্প সময়ে অধিক প্রোডাকশন দরকার যাতে সকলের কাছেই সব কটা পেজের কপি থাকে। আমার মনে আছে, আমরা এক এক জন একটা পেজের সাতটা করে কার্বন কপি করেছিলাম যাতে আমি ছাড়া আরও ছজন সেটা পেতে পারে। অষ্টম কপির কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। তাই ৭টাতেই অপটিমাম কার্বন কপি হয়। তেমনি অন্য কেউ অন্য কোনো পাতার সাতটা কপি করেছে, যার একটা কপি আমি পেয়েছি । এইভাবে মিলে জুলে আমরা প্রত্যেকেই ওই প্রফেসারের বিষয়ের পরীক্ষার জন্যে নোটস তৈরি করে ফেললাম।

যেহেতু ওপেন বুক পরীক্ষা তাই ওই নোটস সঙ্গে নিয়েই পরীক্ষা দিতে পারব। কিন্তু নোটসের বাইরে কিছু জিজ্ঞেস করলে আমরা হয়তো কেউই কোনো উত্তর দিতে পারব না। কাজেই কিছুটা ভয়ে ভয়েই সবাই ওই পরীক্ষার হলে নোটস নিয়ে ঢুকে বসলাম। যখন কোশ্চেন পেপার হাতে পেলাম, সকলে অবাক। প্রায় সব প্রশ্নই আমাদের নোটসে করা আছে। আমাদের খাতা দেখতে গিয়ে প্রফেসর নিশ্চয়ই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন এই ভেবে যে এরকমও

হয়? ক্লাসের প্রত্যেকেই প্রায় একশোর কাছাকাছি নাম্বার পেয়েছে। অথচ উনি জানেন যে উনি ভালো করে পড়াননি, অনেকে ক্লাসও করেনি। আর লাইব্রেরীর একমাত্র বইটি উনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন! তা সত্ত্বেও এরকম ভালো রেজাল্ট! তার মানে এই ব্যাচে খুব বুদ্ধিমান ছেলে মেয়েরা আছে নিশ্চয়ই! অথচ আমরা তো জানি যে বিষয়টার ব্যাপারে আমরা কেউই বিশেষ কিছু জানি না। নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষার খাতা ছাত্রছাত্রীদের দেখানোর সময় তিনি হুঁশিয়ারি দিলেন যে সেমিস্টার পরীক্ষার প্রশ্ন কিন্তু শক্ত হবে। অবশ্য আমাদের কাছে তখন সোজা বা শক্ত প্রশ্নের কোনো মানেই নেই, কারণ আমরা তো কোনো প্রশ্নের উত্তর নিজে থেকে লিখিনি, সবই হয়েছে অনির্বাণদার দয়ায়।

এবারে সেমিস্টার পরীক্ষা দেখতে দেখতে এসে গেল। আবার আমরা হোস্টেলে অনির্বাণদার দ্বারস্থ। কারণ সেমিস্টার পরীক্ষায় তো ওয়েটেজ অনেক বেশি। আগের পরীক্ষায় তো আমাদের ভাগ্য সহায় ছিল বলে সকলে উতরে গেছি। এবার কী হবে? অবশ্য উনার ওই পড়ানোর স্টাইলের জন্য আগের পরীক্ষার থেকে সিলেবাস আর খুব একটা এগোয়নি। ফলে Lehman -এর বইয়ের যে অংকগুলো অনির্বাণদা করে দিয়েছিল সেগুলো তো সঙ্গেই আছে। কিন্তু উনি তো বলেছেন যে এবারে আরও শক্ত প্রশ্ন করবেন। বিষয়টা আমরা কেউই কিছু জানি না। হাতে কোন বইও নেই, কাজেই পড়ারও কোনো উপায় নেই।

এতদিনে আই.এস.আই-এর সব মহলেই আমাদের প্রফেসরকে নিয়ে নিশ্চয়ই অনেক আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে রিসার্চ স্কলারদের মধ্যে। এবং এই বিষয়ে রিসার্চ করে অনির্বাণদারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে আমাদের প্রফেসর ওই Lehman –এর বইয়ের বাইরে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। কিন্তু বইয়ের মধ্যে তো এক্সারসাইজ ছাড়াও অনেক কিছু আছে। সেগুলোর কি হবে? অনির্বাণদাই এর সলিউশন করে দিল। বলল, আমার বইটা তোরা আপাতত নিয়ে গিয়ে বইয়ের ভিতরে যে সব অংক উদাহরণ হিসেবে কষে দেখানো আছে, সেগুলো লিখে নে। আর আমার আগের দেওয়া অংকগুলো তো তোদের আছেই।

আমাদের তখন অন্য কিছু মাথায় আসছিলও না। অগত্যা অনির্বাণদার কথামতো আমরা সবাই আবার প্রত্যেকে একটা পাতার সাতটা কার্বন কপি নিয়ে পরীক্ষায় বসে পড়লাম। সবাই খুব ভয়ে ভয়ে আছি। এখানে তো কোশ্চেন পেপার লিক হওয়ার গল্প নেই। পরীক্ষার দিন সকলেই মুখ শুকনো করে এক অজানা আশঙ্কার অপেক্ষায় থাকলাম। কিন্তু প্রশ্নপত্র তো হাতে পেতেই সকলের মুখে হাসির রেখা ফুটতে শুরু করল। কারণ এবারের পুরো প্রশ্নপত্রই ছিল ওই Lehman -এর বইতে কষা উদাহরণগুলো থেকে।

উনি হয়তো সত্যিই ভেবেছিলেন যে আগেরবার এক্সারসাইজ থেকে দেওয়াতে যখন ছাত্রছাত্রীরা সব করে দিতে পেরেছে, এবারে তার থেকে শক্ত অংক একমাত্র তাঁর পি.এইচ.ডি-র সুপারভাইজার প্রফেসর Lehman –এর করা কিছু অংক যেগুলো উনি উদাহরণ হিসাবে নিজের বইয়ে দিয়েছেন, সেগুলো দিলে সব ছাত্রছাত্রীরা নিশ্চয়ই করতে পারবে না। কিন্তু উনি যা ভাবলেন তা তো হলো না।
আবার সবাই প্রচুর নম্বর পেল। কাজেই আমাদের কাছে ওপেন বুক পরীক্ষা ওই একটাই হয়েছে এবং নম্বরের দিক দিয়ে দেখলে, তা সকলের কাছেই ভালো হয়েছে। আমাদের প্রফেসর তো বুঝতেই পারলেন তিনি আমেরিকা থেকে যেটা আমদানি করে ভারতে নিয়ে এসে ভয় দেখাবেন ভেবেছিলেন সেখানে তিনি নিজেই ভাবতে পারলেন না যে এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা কীভাবে সেটাকে ট্যাকেল করলো। অবশ্য তাকে দিয়ে আমাদের ওপরে এক্সপেরিমেন্ট করার পরে তার পক্ষে খুব একটা সুখকর হলো না। কারণ যে কোনো কারণেই হোক, এক বছর পরে আই.এস.আই.তে আর তাঁকে দেখা যায়নি।

আর একটা নন একাডেমিক গল্প বলে আমার এই লেখাটা শেষ করব।

তখন বি.স্ট্যাট ফোর্থ ইয়ারের পরীক্ষা হয়ে গেছে। হোস্টেলের ছাত্রছাত্রীদের এবার বাড়ি ফেরার পালা। তার আগে হোস্টেলে যে মাসিক ফিস্ট হয় সেটা সেরে সকলে চলে যাবে। আমরা যে কজন ডে স্কলার ছিলাম, তাদেরকে হোস্টেলের বন্ধুরা ওই ফিস্টের দিনে নেমন্তন্ন করল। আমরাও সকলে চলে এলাম। ফিস্টের দিনে যে

এরকম এলাহি খাবারের ব্যবস্থা হয় তা জানলাম এই প্রথমবার। সকলেই খুব খুশি, কারণ তখনও রেজাল্ট বেরোয়নি। অনেকেই পরের দিনই বাড়ি চলে যাবে। তাই ঠিক হলো যে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে হোস্টেলেই গল্প গুজব করে রাত কাটাবো। তাইই চলছিল। হঠাৎ কয়েকজন বলল যে চল একবার হোস্টেলের বাইরেটা ঘুরে আসি। যেমন কথা তেমনি কাজ। নিশিথ রাতে হোস্টেলের বাইরেটা বেশ রোমাঞ্চকর। সামনেই একটা পুকুর, তার চারপাশে লম্বা লম্বা নারকেল গাছ। পুকুরের একটা পারে বাঁধানো ঘাট। আমরা সকলে প্রথমে বাঁধানো ঘাটে গিয়ে বসলাম সঙ্গে সঙ্গে একজন কর্তব্যরত প্রহরী কোথা থেকে যেন ছুটে চলে এলো এবং বলল যে পুকুর ঘাটে বসা বারণ। আসলে কয়েক মাস আগে এক ছাত্র ওই পুকুরে স্নান করতে গিয়ে ডুবে গিয়েছিল। তাকে আর বাঁচানো যায়নি। অগত্যা আমরা উঠে পড়লাম এবং চারিদিকে ঘুরতে থাকলাম দল বেঁধে। ভোর হয়ে আসছে। এর আগে আমি কোনদিন রাত জাগিনি। কাজেই আমার কাছে অনেক কিছুই প্রথম বারের জন্য ঘটছে। অতএব খুবই উল্লসিত। আমাদের মধ্যেই একজন বলে উঠলো যে হ্যাঁরে নারকেল গাছগুলোতে প্রচুর ডাব হয়ে আছে। এগুলো পেড়ে খাওয়া যায় না ? সঙ্গে সঙ্গে নানা মন্তব্য শোনা যেতে লাগল। কেউ বলল কে গাছে উঠবে? আবার কেউ বলল দেখলি তো পুকুরের ধারেই বসতে দিল না তো নারকেল গাছে উঠলে তো লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে। কিন্তু তখন আমরা একদল। কাজেই প্রহরীকে থোড়াই কেয়ার। কিন্তু উঠবে কে? আর প্রত্যেকটা গাছও খুব লম্বা। গাছগুলো অবশ্য এখনও আছে।

আমাদের মধ্যে যার গাছে ওঠার একটু অভ্যাস আছে, বিশেষ করে নারকেল গাছে, যে গাছের কোন ডালপালা থাকে না, তার দিকে সবাই চাওয়া চায়ি করল। অতঃপর সে বাধ্য হয়ে কিছুটা এগিয়ে গেল একটা নারকেল গাছের দিকে। আমরা স্বস্তি পেলাম যে ফাইনালি হোস্টেলের গাছ থেকে ডাব পেড়ে খাওয়া হবে আজকে। সেই ছেলেটা আবার আমাদের সকলের থেকে লম্বা আর রোগাও। কাজেই আমাদের মনে হলো যে ও সহজেই গাছের ওপরে উঠতে পারবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর এক। ছেলেটি একটু নিরীক্ষণ করে ফিরে এলো এবং বলল যে না

রে, গাছগুলো বড্ড লম্বা। এত লম্বা গাছে আমি আগে কখনো উঠিনি। তাই আমি উঠতে পারবো না। ওর ওই ঘোষণায় আমরা সবাই হতাশ হয়ে পড়লাম। ভাবলাম, যে আশায় আমরা বুক বাঁধছিলাম সে আর পূর্ণ হওয়ার নয়!

এই সময় আমার মনে হলো যে সকলকে এক্ষুনি হতাশ হতে দেব না। হলই বা যে আমার গাছে ওঠার অভ্যাস নেই। কারণ আমরা তো ভাড়া বাড়িতে মানুষ। আর টাকা-পয়সার অভাবের কারণে কোনো আত্মীয়দের বাড়ি যাতায়াতও খুব একটা ছিল না যে সেখানে গিয়ে গাছে উঠবো। কিন্তু মনে হল যে আমি তো দেখেছি কীভাবে লোকেরা নারকেল গাছে উঠে ডাব বা নারিকেল পাড়ে । একটা মোটা দড়ির ফাঁস করে তার মধ্যে দুপা দিয়ে ফাঁসটাকে দুদিকে টেনে রাখে। তার পর গাছটাকে দুহাতে যতটা সম্ভব জড়িয়ে ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে অনায়াসে একদম গাছটার মাথায় পৌঁছে যায়। হ্যাঁ,এখানে আর দড়ি কোথা থেকে পাওয়া যাবে? কিন্তু প্রিন্সিপালটা একই থাকবে। দড়ি হলে হয়তো সুবিধা হতো। আর এতজন হতাশ হয়ে পড়বে এটাও আমার ভালো লাগছিল না।

অগত্যা একটা বিশাল নারকেল গাছে উঠতে শুরু করলাম ওই দেখা কায়দাকে ব্যবহার করে। প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলাম ।পরে ওপরে তাকিয়ে দেখলাম যে আর একলাফ দিলেই গাছের একটা ডাল ধরে ফেলতে পারবো। আর তারপরেই একটা একটা করে ডাব ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিচে ফেলতে থাকবো বন্ধুদের জন্য। এই অবস্থায় একটা ভুল করে ফেললাম। হঠাৎ করে নিচের দিকে তাকালাম আর বুকটা ছ্যাঁত করে উঠলো এই ভেবে যে এতটা উঁচুতে চলে এসেছি। ব্যস, হঠাৎ করে সমস্ত শরীরটা কাঁপতে শুরু করল। আর আমি ওপরে উঠতে পারলাম না। শুধু তাই নয় শরীরটা এত কাঁপতে লাগলো যে মনে হল এক্ষুনি হয়তো উপর থেকে সোজা মাটিতে পড়ে যাব। সেদিন পড়ে গেলে আজ আর এই লেখার দিন আসতো না। কোন রকমে ঈশ্বরের কৃপায় হাত দুটো ছাড়িনি এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গাছটাকে দুহাত দিয়ে ধরেছিলাম। ফলে নিচে যখন পৌঁছালাম তখন দুহাত আর বুক থেকে ছড়ে গিয়ে রক্ত পড়ছে। জামা এবং গেঞ্জি ছিঁড়ে গেছে। ভগবানের কৃপায় বেঁচে গেছি এইজন্যে যে গাছটাকে আমি ছাড়িনি। হোস্টেলে গিয়ে যার কাছে যা ছিল তাই দিয়ে ফার্স্ট এইডের

ব্যবস্থা হলো। এখন অপেক্ষা সকাল হওয়ার দিকে। কিন্তু সকাল হলেও ওই অবস্থায় বাড়ি ফিরলে মা অজ্ঞান হয়ে যেতেন।

তাই ঠিক করলাম যে পরীক্ষার পর তো কিছুদিন ছুটি আছে। তাই বাড়ি না ফিরে দিদির বাড়িতে চলে গেলাম। ওখান থেকে বাড়িতে খবর দিয়ে দিলাম যে কিছুদিন দিদির বাড়িতে থাকব। তখন তো আর মোবাইল ফোন ছিল না বা এমনি টেলিফোনও খুব বড়লোকের বাড়ি ছাড়া পাওয়া যেত না। কাজেই জামাইবাবুকেই পাঠাতে হলো বাড়িতে খবর দেওয়ার জন্য। পরে আর মাকে আসল ঘটনাটা জানিয়েছিলাম কিনা মনে নেই।

****

শ্যামবাজার

আশিস কুমার চক্রবর্তী, অবসরপ্রাপ্ত

তিনি মহীয়সী। তিনি এমএ বি এড। তিনি কোলকাতা ইউনিভার্সিটিতে পড়েছেন এবং কলকাতা সম্পর্কে কেউ খারাপ কথা বললে তিনি তার প্রতিবাদ করেন। তাঁরই এক বন্‌ধু সমমনোভাবাপন্ন। কিন্‌তু তিনি কলকাতার কিছুই ভালো দেখেন না। পারলে কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও, বিশেষ করে দক্ষিণাত্যের কোথাও যে কোনো দিন চলে যাওয়ার ইচ্ছা রাখেন। তার মতে কলকাতায় আছে টা কি? চাকরি করতে হলে হয় ব্যাঙ্গালোর বা অন্য কোথাও যেতে হবে। ঠিকমতো চিকিৎসা করাতে হলেও সেও চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, ভেলোর বা মুম্বাই যেতে হবে। হ্যাঁ, আছে। তেলেভাজা শিল্প আছে কলকাতায়। কিন্‌তু দুজনের বয়স এমন জায়গায় পৌঁচেছে যে জমিয়ে তেলে ভাজা খেলে পরের দিন নির্ঘাত পেট খারাপ। দুজনের বাইরে বেরোলে ফুচকা খেতে ইচ্ছা করে, কিন্‌তু ওই তেঁতুল জল কীভাবে তৈরি হয়েছে বা আলু মাখাতে কোনো জীবাণু ঘুরঘুর করছে কিনা, বা ফুচকা বানানোর সময় গায়ের ঘাম তাতে পড়েছে কিনা ইত্যাদি নানারকম প্রশ্নের কোনো সদুত্তর কেউ দিতে পারে না। ফলে ইচ্ছে হলেও স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে রাস্তায় আর ফুচকা খাওয়া হয়ে ওঠে না। বরং ফুচকার প্যাকেট বাড়িতে এনে তেঁতুল জল এবং আলু মাখা বাড়িতে করে তাতে ঝুড়িভাজা, ছোলাসেদ্ধ, দই ইত্যাদি লাগিয়ে মাঝে মধ্যে ভালই ফুচকা খাওয়া হয় বাড়িতে। তাদের এই সব অমীমাংসিত প্রশ্নাবলীর দৌলতে বাড়ির গৃহস্বামীরা অন্তত মাঝে মাঝে ফুচকার স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন।

তেনার বন্‌ধুও কলকাতার মেয়ে। একেবারে খোদ মানিকতলার। পড়াশোনা কলকাতায় কিন্‌তু এখন যেন আর সেই কলকাতা নেই। একদমই ভালো লাগে না। চারিদিকে খুন খারাপি, পাশাপাশি সর্বত্র যেন একটা ভয়ের আবহাওয়া। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে। সেই আবহাওয়া যেন ক্রমশ ভারী হয়ে উঠেছে। এই অবস্থাতে দুই বন্‌ধু মাঝে মাঝে একসঙ্গে দোকান বাজার করতে যান, দোকান বাজার করার মধ্যে নিজেদের সুখ দুঃখের গল্পটাও করে নিতে

পারেন। এমন অনেকবারই হয়েছে যে দুজনে মিলিত হয়েছেন হাতিবাগানের কোথাও এক জায়গায়। সেখান থেকে দোকান বাজার করে হাঁটতে হাঁটতে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়। ব্যাস, গোলমালের শুরু এখানেই।

প্রথমজন উত্তর কলকাতায় আছেন বছর সাতেক। আর জি কর রোডের কাছে বেলগাছিয়া অঞ্চলে। দ্বিতীয়জন থাকেন রাজারহাটের দিকে। হাতিবাগান গেলে দুজনেই চান শ্যামবাজার পর্যন্ত হেঁটে আসতে। তাতে গল্পের সুযোগ একটু বেশি পাওয়া যায়। তার ওপর শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় থেকে দুই একটা বাস এমন পাওয়া যায় যাতে দুজনেই উঠে যে যার বাড়ির কাছে নেমে যেতে পারেন। ফলে আরো কিছুক্ষণ গল্পের সময় পাওয়া যায়।

প্রথম জনের আবার ডিরেকশন জ্ঞান খুব ক্ষীণ। কোনো জায়গায় একা একা যেতে পারেন না। বা তার বাড়ির লোক তাকে কোথাও একলা পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন না। তা সে পাড়ার দোকান হোক কিংবা ডাক্তারখানা। একটা না একটা গন্ডগোল করবেনই। এহেন একজন মহিলাকেও তাঁর এক দিদি কয়েকটি বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে পাঁচ মাথার মোড়ে গিয়ে তার ছোট বোন দিশেহারা হয়ে পড়বেন। তাই তিনি শিখিয়ে দিয়েছিলেন সে তো সাত বছর আগে। ফর্মুলাটা খুব সহজ। যেখান দিয়েই শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে আসবি, প্রথমে লক্ষ্য করবি নেতাজির স্ট্যাচুটার দিকে। নেতাজির ঘোড়া যেদিকে মুখ করে আছে সেদিকের রাস্তাটাই আর জি কর হয়ে তোদের বাড়ির দিকে গেছে। আর যদি আমাদের বাড়িতে আসতে চাস নেতাজির মুখ যেদিকে আছে সেই দিকের বাসে উঠবি, খালি জিজ্ঞেস করে নিবি যে বাসটা শিয়ালদা যাবে কিনা।

মোটামুটি এই দিক নির্দেশে চলে যাচ্ছিল। ঘটনা ঘটলো যেদিন দুজনে গল্প করতে করতে হাতিবাগান থেকে পাঁচমাথা মোড়ে পৌঁছলেন। দুজনেই বেজায় মগ্ন গল্পে। একটি রাস্তার ধারে এসে বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন দুজনে। কিন্তু কোনো চেনা বাসের নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন না। প্রায় আধঘন্টা কোথায় দিয়ে কেটে গেছে। প্রথম জনের তখন মনে হল দিদির দেওয়া নির্দেশনার কথা। নেতাজির স্টাচুর দিকে

দুজনই ভালো করে দেখলেন। ওমা, আমরা যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি সেদিকে তো ঘোড়ার মুখ থাকার কথা। হঠাৎ এইদিকে নেতাজির মুখ কি করে এলো? দুজনেই মনে মনে ভাবলেন এই জন্যই কলকাতার কিছু হয় না। খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, কে বা কারা আবার নেতাজি স্ট্যাচুকে পর্যন্ত ঘুরিয়ে দিয়েছে। অদ্ভুত বাবা, লোকেরা কি প্রত্যেকবার মুখস্ত করবে কোন রাস্তাটা ঘোড়ার মুখের দিকে, কোন রাস্তাটা নেতাজির মুখের দিকে। দ্বিতীয় জন বলে উঠলেন এই জন্যই কলকাতায় আমার একদম ভালো লাগে না।

আবার গল্প চলল। আরো মিনিট ১৫ পরে ওঁদের মনে হলো যে কোথাও ভুল হচ্ছে না তো। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন দাদা আর জি করের দিকের বাসগুলো এদিকে আসবে তো? তিনি বললেন আরে না না। আপনারা তো ভুল দিকে অপেক্ষা করছেন। আপনারা ওদিকটা গিয়ে দাঁড়ান। অগত্যা তারা অন্য রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই চেনা বাস নাম্বারগুলো আসতে শুরু করল। তার মধ্যে যে বাসটা দুজনেরই বাড়ির কাছ দিয়ে যাবে তাতে উঠে পড়লেন। কিন্তু তার আগে খেয়াল করলেন যে এদিকটায় অনেক ফলের দোকান আছে। অতঃপর ঠিক করলেন যে, আর অন্তত স্ট্যাচুর উপর নির্ভর না করে বাড়ি ফেরার সময় খেয়াল করবেন যে ফলের দোকান আছে কিনা। এবারে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলেন যে এটা নিজেদের আবিষ্কার কাজেই আর মুখস্ত রাখতে হবে না, ফলে আর ভুল হবে না।

সেদিন যে যার বাড়িতে ফিরে অন্যান্য কাজের মধ্যে ভুলে গিয়েছিলেন যে কি ভুলটাই না করেছিলেন। দিদির নির্দেশনা মানতে গিয়ে মাঝে মধ্যে মনে মনে হেসেওছেন। একদিন বাড়ির লোকজনকে বলেই ফেললেন নিজেদের আবিষ্কারের কথা। যিনিই শুনছেন তিনি না হেসে পারেননি।

অতঃপর দুই বন্ধুতে আবার একদিন হাতিবাগান ভ্রমণ। আবারও হাঁটতে হাঁটতে বিভিন্ন খাবারের লোভ সামলে গল্প করতে করতে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়। আবারও দুজনেই ঠিক আগের বারের জায়গাতেই বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন। আবারও অনেকক্ষণ চেনা

বাসগুলোর দেখা নেই। এবার কিন্তু আর নেতাজি স্ট্যাচুর দিকে কেউ তাকাচ্ছেন না। বরং মাঝে মধ্যে ঘুরে ফিরে দেখার চেষ্টা করছেন ফুটপাতের দিকে। ফলের দোকানগুলো তো দেখা যাচ্ছে না। তখন আবার নিজেরাই বিচার করলেন যে এই দুপুরে কখনও ফলের দোকানগুলো খোলা থাকে? ওগুলো নিশ্চয়ই বন্ধ, তাই দেখা যাচ্ছে না। বলে আরও কিছুক্ষণ গল্প চলল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ঘণ্টাখানেক পরে পাশের লোককে জিজ্ঞাসা করলে জানলেন যে তাঁরা ভুল জায়গায় অপেক্ষা করছেন। পাশের লোকের কথা অনুযায়ী ঠিক রাস্তায় আসতেই চেনা বাসগুলো আসতে শুরু করল। তখন দেখলেন যে ফলের দোকানগুলো খোলাই আছে হাট করে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও একবার নেতাজি স্ট্যাচুর দিকে তাকালেন। দুজনেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন যে আবার স্ট্যাচুটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন আরজি করের দিকের রাস্তা ঘোড়ার মুখের দিকেই আছে।

****

The Essential Role of Museums & Archives in Research

Avik Kumar Das, PCM Memorial Museum & Archives, Library

"Of all our national assets, Archives are the most precious; they are the gift of one generation to another and the extent of our care of them marks the extent of our civilization."

—Arthur G. Doughty, Dominion Archivist

In an age driven by data and information, it is easy to forget the tangible remains of the past – the documents, artefacts, and relics that whisper stories of bygone eras. These treasures, housed in museums and archives, are not merely remnants of the past but are vital resources for research institutes across disciplines. They provide a tangible link to history, offering invaluable primary sources that breathe life into scholarly research. Museums, with carefully curated collections, offer researchers a unique opportunity to engage with artefacts. Imagine an archaeologist studying ancient pottery shards, a historian studying handwritten letters from a pivotal historical figure, or an art historian analysing the brushstrokes of a master painter. These encounters with the past, facilitated by museums, provide a depth of understanding that transcends the limitations of textbooks.

Archives, on the other hand, serve as repositories of institutional memory, safeguarding documents, photographs, and records that chronicle the evolution of organisations, movements, and even entire fields of study. For researchers, archives are the goldmines of information, offering insights into decision-making processes, societal shifts, and the development of knowledge itself. A compelling example of the vital role museums and archives play in research can be found in the Prasanta Chandra Mahalanobis Memorial Museum and Archives (PCMMM&A). Located within the Indian Statistical Institute in Kolkata, this institution stands as a testament to the legacy of the renowned Indian

statistician professor P.C. Mahalanobis. The museum houses a fascinating collection of personal artefacts, photographs, and documents that shed light on Mahalanobis's life, work, and contributions to the field of statistics. Researchers studying the history of statistics, the development of statistical methods, or even the socio-political context of India find a wealth of primary source material within the archive. The archives, hold a treasure trove of documents, including correspondence, research papers, and lecture notes, that provide a deeper understanding of Mahalanobis's intellectual journey and the evolution of his ideas. This archive is not merely a tribute to a single individual but serves as a valuable resource for researchers tracing the development of statistical thought and its impact on various fields.

Prasanta Chandra Mahalanobis Memorial Museum and Archives (PCMMM&A) exemplify the crucial role these institutions play in supporting research. They offer researchers a tangible connection to the past, providing primary sources that enrich understanding and spark new ideas. In an era of digital age that offers unprecedented access to information, the role of museums and archives remains irreplaceable. These institutions are not simply storehouses of relics, but dynamic spaces where the past intersects with the present, fueling research, sparking curiosity, and deepening our understanding of the world around us. Museums and Archives stand as a powerful testament to this truth, reminding us that the pursuit of knowledge is often best served by bridging the gap between the tangible and the digital, the historical and the contemporary. By preserving and celebrating tangible heritage, we ensure that future generations of scholars and citizens alike can continue to learn from and be inspired by the richness of the past.

****

দুপুরবেলায়

অভিরূপ সরকার, অবসরপ্রাপ্ত

ইস্টিশনটা ঘুমিয়ে আছে, নিঝুম দুপুর –
কয়েক ঘন্টা আর গাড়ি নেই। টিকিট ঘরে
হন্তদন্ত পাঁচটা চড়ুই মিটিং করে।
খাবার খুঁজছে ইতস্তত তিনটে কুকুর।

ইস্টিশনের উল্টোদিকেই ভাতের হোটেল –
মনিব, চাকর বেভুল হয়ে ঘুমিয়ে যাচ্ছে।
ঘরের ভেতর একশ মাছি ভনভনাচ্ছে।
দোরগোড়াতে হেলান দেওয়া বাইসাইকেল।

বাইরে আকাশ, ঝাঁঝাঁ আকাশ, রাস্তা ফাঁকা।
ঘূর্ণি হাওয়ায় হঠাৎ হঠাৎ উড়ছে ধুলো।
ঝাঁপ ফেলেছে ইস্টিশনের দোকানগুলো।
জিরিয়ে নিচ্ছে রিক্সা, অটো, টোটোর চাকা।

সন্ধেবেলায় চাঁদ উঠবে ফের গাছের ফাঁকে –
হাজারটা লোক এখান দিয়ে আসবে, যাবে।
জায়গাটা তার ব্যস্ত মেজাজ ফিরে পাবে।
দুঃখটা এই, জানবে না কেউ দুপুরটাকে।

****

Influence of the 'Holy Trio' of the Ramakrishna Order on a Student's Life: A Personal Reflection on Spirituality in Everyday Living

Ayoti Banerjee, Senior Research Fellow, GSU

Spirituality generally is deemed closest to ritualistic worship and obedience to God. As a student of science, it might seem surprising that I am writing about this topic, especially since science has not proven the existence of God. However, the phrase 'a personal note' in the title sets the tone, freeing me from the discomfort of judgment. I do not consider spirituality as same as ritualistic worship. I think spirituality is a way of connecting with a more humane quality of life. As we grow up, in our day-to-day lives, we come across struggles of different forms. The stark realities we face start colouring the general view of life with negativity. But life is synonymous with hope and even if Samuel Beckett says 'You're on Earth. There's no cure for that', we still need to get up in the morning and move on with life as we find it.

Among the many harsh realities I faced, the one that made me succumb to the spiritual guidance of the 'Holy Trio', i.e., Ramakrishna Paramahamsa (Thakur), Sarada Devi (Maa) and Swami Vivekananda (Swamiji), was the period of Covid-19 pandemic. The social distancing measures turned our home into a kind of prison for my mother and me, as well as many others. The only things we expected from the outside world were the virus itself and the grim news of people—whether acquaintances or strangers, young or old, wealthy or poor—passing away. From early 2020 until the end of 2021, it was a prolonged period of terror and confusion for those of us who had never experienced a pandemic of this magnitude before. The confinement began to take a toll on our mental health, leaving us vulnerable to anxiety and depression. During this time, I

often found myself waking up at 4 a.m. in a state of panic, unable to fall back asleep due to the anxiety that had settled in during the lockdown. But to my surprise, I would always find my mother sitting in a meditative posture, chanting her mantra. She had received her 'Mantra Diksha' from the Ramakrishna Order long ago, but I had never been interested in learning more about it—until anxiety took hold of me during this difficult time.

As a child, I was never particularly religious, even though my mother and grandmother regularly engaged in ritualistic worship. As I grew older, my focus shifted more towards academics, and even the meager time I spent in prayer and worship, gradually decreased. Peer pressure also played a role in distancing me from these rituals, as they were often dismissed as unnecessary by my science-oriented friends. So yes, fleeing from the pain of anxiety was what forced me to take refuge under the 'Holy Trio' but it is not what is keeping me under them every moment now. What truly draws me to the path of the 'Holy Trinity' is the simplicity it offers in accessing the divinity within ourselves. Thakur and Maa emphasized that all spiritual paths are valid because they teach that spirituality is not a material achievement but is intrinsically linked to our very existence. They ask only for 'Mantra Japa' (chanting) and 'Dhyana' (meditation) from us, promising a journey toward self-realization and an abundance of positivity in the future. Swamiji reveals an even deeper truth: the true meaning of life lies in serving those in need. However, this mindset cannot be cultivated unless we discipline our minds through 'Japa' and 'Dhyana'. These practices enable us to see life beyond the narrow focus of self-centered or self-obsessed pursuits. Thus the 'Holy Trio' comes as a package deal and through personal experience; I have found that this package truly fills our lives with positivity. I am too old to simply

‘believe’ in miracles and Yes, I sleep better now.

I have only touched on the surface of Vedanta philosophy, as my own understanding and practice of it are still quite limited. However, this note is intended for those who may explore and grasp more with their intelligence and curiosity. Just as the West in Chicago embraced Swami Vivekananda’s teachings of Thakur’s philosophy, we, as Easterners, might also try to delve into and appreciate the wisdom we have inherited.

****

অন্য মহাভারত

ভবতোষ চন্দ, অবসরপ্রাপ্ত

জনমেজয়ের সর্পনিধন যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পন্ন হল। প্রচুর সাপ যজ্ঞানলে প্রাণ বিসর্জন দিলেও নাগরাজ তক্ষক জীবিত রইল। সাধারণতঃ এমনটাই ঘটে থাকে। রাজায় রাজায় যুদ্ধে উলুখাগড়াদেরই প্রাণ যায়। তবে কখনও সখনও তার ব্যতিক্রম হয়। আর সেটাই হয়ে দাঁড়ায় বলার মত গল্প। মাঝখান থেকে না বলে, বরং প্রথম থেকে সংক্ষেপে গুছিয়ে বলা যাক।

(১)

মহাভারতের শেষ পর্বে বা মহাপ্রস্থানিক পর্বে লেখা আছে যে অভিমন্যু ও উত্তরার পুত্র পরীক্ষিতকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসিয়ে যুধিষ্ঠির চার ভাই ও দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে বেরিয়ে পড়লেন। তখন পরীক্ষিতের বয়স মোটামুটি পঁয়ত্রিশ বছর। এর পর ষাট বছর পার হয়েছে। কয়েক বছর আগে একমাত্র পুত্র জনমেজয় জন্ম নিয়েছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রভাবে ভারতের রাজন্যবর্গের মধ্যে সাময়িক যুদ্ধের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মেছে। নিতান্ত একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য আনতে পরীক্ষিত প্রায়ই বেরিয়ে পড়তেন মৃগয়া করতে। এমনি একবার মৃগয়ায় গিয়ে অঘটন ঘটল, এক মুনির অভিশাপ নেমে এল তার উপর। ফলস্বরূপ পরীক্ষিতকে প্রাণ দিতে হয়েছিল তক্ষক নামক প্রবল বিষধর সাপের কামড়ে। সে মৃত্যু প্রতিরোধ করা অসম্ভব ছিল না এবং প্রায় হয়েও এসেছিল। কিন্তু ঋষি বাক্য মিথ্যা হলে বা তাঁদের অভিশাপ বিফলে গেলে, তাঁদের কথার আর গুরুত্ব থাকে না। সেক্ষেত্রে রাজতন্ত্রের মূল ধারক শক্তি অচল হয়ে পড়ে। নিজের পুত্র এবং উত্তরসুরীদের রাজসিক ভবিষ্যত জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পঁচানব্বই বছরের বৃদ্ধ পরীক্ষিত প্রাণদান করাই স্থির করেন। সেই অনুযায়ী মুনির দেওয়া সময়সীমা শেষ হওয়ার ঠিক আগে তিনি স্বেচ্ছায় নাগরাজ তক্ষককে দংশনের সুযোগ করে দেন এবং প্রাণ ত্যাগ করেন। পুত্র জনমেজয় তখন নেহাতই শিশু।

পরীক্ষিতের পারলৌকিক ক্রীয়া সম্পন্ন হওয়ার পর শিশু জনমেজয়কে

রাজসিংহাসনে বসানো হল এবং তাকে সামনে রেখে তার মা দক্ষ মন্ত্রীদের সাহায্যে রাজ্যশাষন করতে লাগলেন। হস্তিনাপুরবাসীরা মোটামুটি সুখে শান্তিতে দিনাতিপাত করতে লাগল। শিশু জনমেজয় ধীরে ধীরে বড় হয়ে যৌবনে পদার্পণ করলেন। ইতিমধ্যে তিনি গুরু কৃপাচার্যের কাছে বিভিন্ন শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেছেন। এখন তিনি রাজ্যশাষনের ভার নিজের হাতেই নিয়েছেন। সকলেই স্বীকার করে যে জনমেজয় অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত, ধীর, বিবেচনা শক্তি সম্পন্ন এবং যুদ্ধে পারঙ্গম। তবে শেষ গুণটি ব্যবহার করার বিশেষ সুযোগ নেই। কারণ যুদ্ধবিগ্রহ হয় না। তবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ এবং পাণ্ডবদের অশ্বমেধ যজ্ঞের পর বাকি রাজারা নিতান্ত হীনবল হয়ে পড়লেও এখন ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করছে, যদিও এখনই যুদ্ধের কোনো সম্ভাবনা নেই। অতএব জনমেজয়ের জীবনও নিতান্ত ঘটনাহীন ও একঘেয়ে। ফলে তার যুদ্ধে পারদর্শীতায় ক্রমশঃ মরচে ধরছে।

এদিকে সোমশ্রবা নামক এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ সর্পনিধন যজ্ঞ করার বিদ্যা গভীর ভাবে অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করেন। সব যুগের পণ্ডিতদের একটা মূল সমস্যা হল যে অধীত বিদ্যা প্রয়োগ করে তার সাফল্য নিজে দেখতে না পেলে এবং অপরকে দেখাতে না পারলে তারা শান্তি পান না। কিন্তু এই কাজে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয় যা সাধারণ লোকের কাছে পাওয়া দুষ্কর। অতএব সোমশ্রবা উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত হয়ে রাজা জনমেজয়ের সভাগৃহে পূর্বাহ্নে অর্থাৎ দ্বিপ্রাহরিক আহারের আগেই উপস্থিত হলেন।

"মহারাজ, আপনার কল্যাণ হোক।"

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।"

"আমি দৈব প্রেরিত। আমার শত বৎসরের সাধনা মাঝ পথে ভঙ্গ করে দেবতার আদেশে আমায় দুর দেশ থেকে এখানে আসতে হয়েছে।"

"আপনি নিশ্চয় পথশ্রমে ক্লান্ত। আগে অতিথিশালায় বিশ্রাম ও আহারাদি করে ক্লান্তি দুর করুন। আগামীকাল বাকি কথাবার্তা হবে।"

কথায় আছে, সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। সভায় উপস্থিত রাজপুরোহিত ধনাগমের সম্ভাবনা দেখে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে পড়লেন এবং কেউ কিছু বলার আগেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,

"মহারাজ, আপনি যদি অনুমতি দেন এবং দ্বিজশ্রেষ্ঠের যদি আপত্তি না থাকে তবে

উনি আমার গৃহেই অবস্থান করতে পারেন।"

জনমেজয় বললেন,

"এ অতি উত্তম প্রস্তাব। আশা করি দ্বিজশ্রেষ্ঠ সম্মত হবেন।"

সোমশ্রবা বুঝলেন, রাজপুরোহিতকে এড়িয়ে তার উদ্দেশ্য সফল হবে না। রাজপুরোহিতের দিকে তাকিয়ে জোড়হস্তে বললেন,

"আমি কৃতার্থ হব।"

সভাগৃহে উপস্থিত মহামন্ত্রীর ভ্রুরু জোড়া সবার অলক্ষ্যে কুঁচকে উঠল এবং পরক্ষণেই তা' ঠোঁটে পৌঁছে মুচকি হাসিতে পরিণত হল। রাজার অনুমতি নিয়ে রাজপুরোহিত সোমশ্রবাকে নিয়ে রাজসভা থেকে নিস্ক্রান্ত হলেন। সেদিনের মত সভা ভঙ্গ হল।

(২)

রাজপুরোহিতগৃহে স্নান-আহারান্তে সোমশ্রবা ও রাজপুরোহিত মুখশুদ্ধি সহকারে মুখোমুখি আসনে গা এলিয়ে দিলেন। তাদের আলাপ আলোচনা শুরু হল।

"সোমশ্রবা, আপত্তি না থাকলে আপনার আগমণের উদ্দেশ্য বলতে পারেন।"

"আমিও আপনাকে আমার মনের বাসনা বলতে খুবই আগ্রহী। সত্যি বলতে কি আপনার সাহায্য ছাড়া আমার উদ্দেশ্য সফল হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। আর একটা কথা আমি আপনার তুলনায় বয়েসে ছোট, এবং প্রজ্ঞায় হীন। সুতরাং আমাকে আপনি তুমি বললে আমার পক্ষে হথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া সহজ হবে।"

রাজপুরোহিত তোষামোদে স্ফীত হলেন,

"হুঁ, সে ঠিক আছে। কিন্তু আমাকে বিচার করে দেখতে হবে তোমার উদ্দেশ্য রাজ্যবাসী ও রাজার পক্ষে শুভকর ও মঙ্গলময় কি না।"

"রাজা এবং রাজ্যবাসীর প্রতি আপনার নিবেদিত প্রাণের কথা সবাই জানে। আমি আপনাকে এমন কিছু অনুরোধ করব না যা আপনার বিবেক বিরুদ্ধ ।"

"বেশ, এবার তোমার উদ্দেশ্যটা খুলে বল দেখি।"

"সর্পনিধন যজ্ঞ।"

"মানে, তুমি যজ্ঞ করবে আর সাপেরা এসে সেই যজ্ঞের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়বে! না

কি তারা যে যার জায়গাতেই মরে পড়ে থাকবে।"

"প্রথমটা। না হলে মহারাজকে নানান জায়গায় নিয়ে গিয়ে সাপের মৃতদেহ দেখাতে হবে এবং তারা এমনিই মারা গেছে না মন্ত্রের প্রভাবে মারা গেছে সেটা প্রমাণ করতে হবে। তার চেয়ে যজ্ঞের আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেলে এসব হাঙ্গামা থাকে না।"

"তুমি এই যজ্ঞ প্রণালী ও তার মন্ত্র জানো?"

"আজ্ঞে, আমি সম্প্রতি এর আধুনিকতম পদ্ধতি শিক্ষা করে এসেছি। এই ভারতভূমে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কেউ নেই।"

"এই সর্পনিধন যজ্ঞের কার্যকারিতা কেমন?"

"শতকরা একশো ভাগের কিছু কম।"

"কতটা কম? আর শতকরা একশো ভাগ নয় কেন?"

"আজ্ঞে, কিছু সাপ কানে শুনতে পায় না আবার কিছু সাপ এতই অশিক্ষিত যে মন্ত্র শুনতে পেলেও তার মানে বোঝে না। তাই তাদের উপর মন্ত্রের প্রভাব পড়ে না।"

"হুঁ, বুঝলাম। এবার বল আমি কি ভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"আপনি আর আমি দুজনে মিলে যজ্ঞ করব। ঋত্বিকের বৃত্তি ও দক্ষিণা দুজনেই পাব।"

"তুমি উন্নতি করবে। আমি এমন প্রস্তাবই আশা করেছিলাম। কিন্তু আমি তো সর্পনিধন যজ্ঞের বিষয়ে কিছুই জানি না।"

"আপনি যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখার ব্যবস্থা করবেন আর আহুতি দেবেন। আমি মন্ত্র পড়ব।"

"আহুতি দেব! তুমি যে বললে মন্ত্রের প্রভাবে সাপেরা এসে নিজেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়বে!"

"সে তো পড়বেই। কিন্তু যখন পড়বে তাকে অগ্নিদেবতার প্রতি উৎসর্গ করতে হবে না! তার তাছাড়া অনিচ্ছুক সাপেরা আছে না! কোটালকে বলবেন তার লোকজন নিয়ে অনিচ্ছুক সাপদের গর্ত থেকে টেনে বার করে আড়াল থেকে যেন যজ্ঞকুণ্ডে ছুঁড়ে দেয়। কোটালকেও লাভের অংশ দেওয়া হবে।"

"বাঃ, তুমি তো দেখছি সবদিক ভেবে পরিকল্পনা করেছ। নিশ্চয়ই সফল হবে। তবে এই রাজ্যে প্রচুর ত্রুটিসন্ধানী, ছিদ্রান্বেষী নিস্কর্মার দল আছে। তারা যাতে কোটাল ও তার অনুচরদের সর্প শিকার দেখতে না পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

এমন কি যজ্ঞস্থলের আশেপাশে তাদের উপস্থিতিও বাঞ্ছনীয় নয়। তা'তে অনেক সমস্যার উদ্ভব হতে পারে।"

"তা'হলে উপায়!"

"উপায় তো কিছু একটা করতে হবে। প্রয়োজন হলে অন্য কারো সাহায্যও নিতে হতে পারে। আপাতত চল, কিঞ্চিৎ নিদ্রা দেওয়া যাক।"

(৩)

সন্ধ্যারতির সময় উত্তীর্ণ হওয়ার কিছু পরে ভৃত্য এসে রাজপুরোহিতকে সংবাদ দিল যে মহামন্ত্রী গৃহের প্রবেশ দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন। রাজপুরোহিত তখন মন্ত্রণাকক্ষে সোমশ্রবার সঙ্গে আলোচনায় রত। সংবাদ পেয়েই বললেন,

"মহামন্ত্রী অত্যন্ত চতুর ব্যক্তি। ওনার মনে কিছু একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে, তাই বিনা আহ্বানে উপস্থিত হয়েছেন। ওনাকে দলে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। অনেক সাহায্যও পাওয়া যাবে।"

অতঃপর রাজপুরোহিত স্বয়ং অগ্রসর হয়ে মহামন্ত্রীকে গৃহদ্বার থেকে আপ্যায়ন করে মন্ত্রণাকক্ষে নিয়ে এলেন। কুশল বিনিময় ও প্রাথমিক কথাবার্তার পর তাদের মধ্যে মূল বিষয়ে আলোচনা শুরু হল। প্রথমেই সোমশ্রবা তার পুরো পরিকল্পনা আরও একবার গুছিয়ে বললেন, সমস্ত সমস্যা সমেত। সমস্তটা মনোযোগ দিয়ে শুনে মহামন্ত্রীর মন্তব্য,

"এতে তো বিপুল অর্থের প্রয়োজন হবে।"

যদি অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে পুরো ব্যাপারটাই নাকচ হয়ে যায়, সেই ভয়ে সোমশ্রবা একরকম ঝাঁপিয়ে পড়লেন,

"আজ্ঞে, না, না। এ তো আর অশ্বমেধ যজ্ঞ বা রাজসূয় যজ্ঞ নয়। মাত্র দু'দিনের যজ্ঞ। ঋত্বিকদের বৃত্তি আর দক্ষিণা, যজ্ঞের উপকরণ এবং আনুষঙ্গিক কিছু খরচ।"

স্মিত মুখে মহামন্ত্রী হাত তুলে সোমশ্রবাকে থামালেন,

"আপনি সদাচারী সাধারণ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। চিরকাল জ্ঞান চর্চ্চা করেই কাটিয়েছেন। হস্তিনাপুরের রাজপরিবারের যশ, খ্যাতি, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি সম্পর্কে আপনার কোন সম্যক ধারণা নেই।"

রাজপুরোহিত কৌতুহলী হয়ে মহামন্ত্রীর মুখের দিকে দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি বলে চললেন,

"সাধারণ গৃহস্থ তাদের পরিবারের কল্যাণে দু'এক দিনের যজ্ঞ করে। রাজা করেন

রাজ্যবাসীর কল্যাণে। সে যজ্ঞ অন্ততঃ সাত দিন ধরে অনুষ্ঠিত হবে।"

"কিন্তু ..." সোমশ্রবা মুখ খোলার আগেই রাজপুরোহিত তাকে চোখের ইশারায় থামিয়ে দিলেন।

"বুঝেছি। আলাদা করে কিছু বলার দরকার নেই। আমার মত এই যে প্রথম পাঁচ দিন রাজ্যবাসীর কল্যাণের জন্য রাজপুরোহিত যজ্ঞ করবেন। তা'তে যা আহুতি দেবার তিনি তাই দেবেন। ষষ্ঠ দিনে সেই যজ্ঞই সর্পনিধন যজ্ঞে পরিণত হবে। অর্থাৎ শেষের দু'দিন আপনার সর্পনিধন যজ্ঞ হবে। কি আপনি পারবেন না?"

শেষ প্রশ্নটি রাজপুরোহিতের প্রতি এবং তিনি সবিনয়ে মাথা কাত করে বললেন,

"আপনি যেমন পরামর্শ দেবেন।"

"আয়োজন করতে সময় লাগবে। নিমন্ত্রিতের তালিকা বিশাল। সপারিষদ ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গ, সশিষ্য সমস্ত মুনি ঋষি, এ রাজ্যের অধীন সকল গোষ্ঠীপতি এবং এই বিশাল রাজপরিবারের সমস্ত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের দুত পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করতে হবে। সাতদিন ধরে এদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, পর্যাপ্ত আদর আপ্যায়ণের সুবন্দোবস্ত করতে হবে, সন্ধ্যাকালীন বিলাসব্যসনের আয়োজন রাখতে হবে। এই সব কাজের জন্য চুক্তিভিত্তিক স্বল্প সময়ের জন্য লোক নিয়োগ করতে হবে। নিমন্ত্রিতদের সম্মান অনুযায়ী উপঢৌকন দিতে হবে। প্রচুর কাজ, প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন। সবই তো সেই আমাকেই ব্যবস্থা করতে হবে।"

সোমশ্রবার মুখের হাঁ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাজপুরোহিত বুঝতে পারেন নেপোয় দই মেরে দেবে। তার খানিকটা খাবলা মারার আশায় মরীয়া হয়ে বলে উঠেন,

"সত্যি, আপনার কাঁধে আমরা বড় ঝামেলা চাপিয়ে দিলাম। যদি অনুমতি করেন আমিও কিছু দায়িত্ব পালন করতে পারি। অন্ততঃ ঐ লোক নিয়োগের ব্যাপারটা। দেখবেন, আমি ঠিক পারব। ঐ কুল, গোত্র, মান, দক্ষতা যাচাই করে ..."

"না, না, সে অতি জটিল ব্যাপার। প্রচুর কর্মপ্রার্থী আবেদন করবে। একেই তো যুদ্ধবিগ্রহ নেই বলে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সঙ্কুচিত, তার উপর জমিতে বীজ বোনা হয়ে গেছে আর ফসল কাটার দেরি আছে। অনেকেরই হাতে কাজ নেই, অথচ রোজগারের প্রয়োজন। অতএব পদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি আবেদন পড়বে, তাদের হয়ে নানা জনের সুপারিশ,

উৎকোচ। সে আপনার অভ্যেস নেই। শেষে নিয়োগ দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে আপনার অহেতুক অপযশ হবে তা' আমি চাই না।"

মহামন্ত্রী নিবৃত্ত করার পরেও রাজপুরোহিত চেষ্টা করলেন,

"তাহলে ঐ থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। আমার জামাতা – কর্মচঞ্চল যুবক, উদ্যোগী। আপাততঃ আমার গৃহেই অবস্থান করছে। সে দিব্যি এই দায়িত্বটুকু সামলাতে পারবে।"

"অর্বাচীন, চঞ্চলমতি! খাদ্যবস্তুর গুণমানের বিচার আছে, পরিমাণের মাপজোঁক আছে, টাকা-পয়সার হিসেব-নিকেশ আছে। উঁহুঁ, না, না। রাজপুরোহিত, শেষে আপনার আর আমার নাম খাদ্য কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে যেতে পারে এমন প্রস্তাবে মহারাজ স্বয়ং রাজী হবেন না। তবে আপনার জামাতা যদি নিতান্ত ইচ্ছুক হন, আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আমার দপ্তরে একজন বিশ্বাসী করণিকের বড় প্রয়োজন।"

রাজপুরোহিত হতবাক হয়ে স্থানুবৎ বসে রইলেন। সোমশ্রবার অবস্থা তথৈবচ। কিছুক্ষণ নীরব থেকে মহামন্ত্রী রাজপুরোহিতের উদ্দেশ্যে বললেন,

"আপনি স্বেচ্ছায় দায়িত্ব নিতে চান, তাই আপনার উপরেই একটি বড় কাজের ভার সঁপে দিতে চাই।"

ক্ষীণ আশায় রাজপুরোহিত নড়েচড়ে বসেন,

"বলুন, কি করতে হবে?"

"আপনি স্বয়ং গিয়ে কিংবা কোন দায়িত্ববান পুরোহিতকে পাঠিয়ে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে সশিষ্য নিমন্ত্রণ করতে হবে। নিশ্চিত করবেন ওনার শিষ্য বৈশম্পায়ন যেন অবশ্যই আসেন।"

"এর কোন বিশেষ কারণ আছে কি?"

"শুনেছি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এক লক্ষ শ্লোক সমন্বিত এক কাব্য রচনা করেছেন, নাম মহাভারত। তা'তে পারিবারিক নাটক আছে, আছে জ্ঞাতিশত্রুতা, সততা ও খলতা আছে, আছে অবৈধ প্রেম, যৌনতা ও ব্যাভিচার, আছে কুটিল ষড়যন্ত্র আর সর্বোপরি আঠেরো দিনব্যাপী মহাযুদ্ধের বর্ণনা আছে। মানে এককথায় অতি মনোমুগ্ধকর কাহিনী। এই কাব্য বৈশম্পায়নের কন্ঠস্থ। তিনি আবৃতিও করেন চমৎকার। যজ্ঞস্থলে মহারাজার অনুরোধে তিনি এই কাব্য আবৃতি করবেন এবং আশাকরি উপস্থিত সকলেই একাগ্রচিত্তে তা' শুনবে। ফলে যজ্ঞানুষ্ঠানে

আপনাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলে সবার নজর এড়িয়ে যাবে। তবে আমাদের রাজ্যের নিষ্কর্মা ছিদ্রান্বেষীদের ব্যাপারে আলাদা কিছু ভাবতে হবে।"

মহামন্ত্রী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সোমশ্রবাকে বললেন,

"রাত হ'ল। এবার আমি যাই। ঐ কথাই রইল। আগামীকাল রাজসকাশে আপনার প্রস্তাব জোরালো ভাবে উপস্থিত করবেন। আমি যথাসাধ্য করব। আর যজ্ঞ করাই যদি স্থির হয় তবে দেড় থেকে দু'মাস পরের কোন একদিন তিথি-নক্ষত্র দেখে নির্দিষ্ট করবেন। আমি রাজজ্যোতিষীকে জানিয়ে রাখব। আর কোটালের ব্যাপারটা রাজপুরোহিতই সামলাবেন।"

তারপর তিনি বিদায় সম্ভাষনের তোয়াক্কা না করেই দাপটের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। রাজপুরোহিত নিস্তেজের মত পড়ে রইলেন।

(৪)

পরদিন যথাকালে সোমশ্রবা রাজপুরোহিতের সঙ্গে রাজসভায় উপস্থিত হলেন। বাকি সভাসদরাও এসে গেছেন। শুধু মহারাজ জনমেজয় তখনও আসেননি। রাজপুরোহিত তার আসনে বসলেন। সোমশ্রবা তার পায়ের কাছে মেঝেতে বসলেন। রাজপুরোহিত ভারী খুসি হলেন তার বিনয় দেখে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘোষক ঘোষণা করল এবং রাজা এসে সিংহাসনে বসলেন। তারপর সেই যুগে রাজসভায় যে সমস্ত দৈনন্দিন কাজকর্ম হত সেসব সমাপ্ত হল। এই অবসরে সোমশ্রবা ধীর পায়ে উঠে রাজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। জনমেজয় তাকে দেখে বলে উঠলেন,

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, কাল আপনি অতিশয় ক্লান্ত ছিলেন বলে আপনার বক্তব্য শোনা হয়নি। বলুন কি আপনার প্রার্থনা?"

"হে রাজন, আমি প্রার্থী নই। আমি কিছু চাই না। শুধু একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আমার এখানে আগমন।"

"সে কি! কি এমন বিষয় যা আমার মন্ত্রীরা আমাকে জানায়নি, মনে করিয়ে দেয়নি!"

"মহারাজ, আপনার মন্ত্রীরা অত্যন্ত যোগ্য ও বিচক্ষণ। তারা আপনাকে সৎ ও সঠিক মন্ত্রণাই দেন। আমি যে বিষয়ে কথা বলছি

তার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনার কোন সম্পর্ক নেই, তবে আপনার ও রাজ্যের গৌরব নির্ভর করে।"

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনি বলুন কি সেই বিষয়।"

"মহারাজ, আমি অহিংসার পূজারী। তবু আমি আপনাকে মনে করিয়ে দেব যে আপনি ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ। আপনার পিতৃহন্তারক নাগরাজ তক্ষক আজও জীবিত। পিতৃ হত্যাকারীকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেওয়া যে কোন ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্তব্য। মহারাজ, আপনি বীরশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী এবং কুশলী। সুতরাং নাগরাজ তক্ষককে হত্যা না করলে ভবিষ্যৎকাল আপনাকে কাপুরুষ হিসেব চিহ্নিত করবে।"

জনমেজয় শৈশবে মায়ের কাছে, বাল্যে গুরু কৃপাচার্য্যের কাছে এবং রাজ্যাভিষেকের পর নানা উপলক্ষ্যে মহামন্ত্রী, রাজপুরোহিত ও অন্যান্য সভাসদদের কাছে বারবার শুনেছেন যে ঋষিবাক্য সত্য প্রতিপন্ন করার জন্য তার পিতা পরীক্ষিত স্বেচ্ছায় নাগরাজ তক্ষককে দংশন করতে আহ্বান করেছিলেন। আজ এই সোমশ্রবার কথায় উত্তেজিত হয়ে সেকথা তার মনে পড়ল না। মহামন্ত্রী বা রাজপুরোহিতও তাকে মনে করিয়ে দিলেন না। জনমেজয় উঠে দাঁড়িয়ে অসি কোষমুক্ত করে শপথ নেওয়ার ভঙ্গীতে বললেন,

"নাগরাজ তক্ষককে শমণসদনে পাঠিয়ে আমি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেব।"

তারপর মহামন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন,

"আপনি আমায় পরামর্শ দিন কি ভাবে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারি।"

"মহারাজ, সমস্যা হল সাপেরা থাকে মাটির ভেতর গর্তে আর তাদের রাজা তক্ষক থাকেন আরও গভীরে, একেবারে পাতালে। সেখানে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা অসম্ভব।"

"যদি আমি তাকে যুদ্ধে আহ্বান করি?"

"কিন্তু তিনি তা' গ্রহণ করবেন এমন সম্ভাবনা প্রায় নেই।"

"তবে উপায়!"

মহামন্ত্রী সোমশ্রবার দিকে ফিরে বললেন,

"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনি কি কোন উপায় বলতে পারেন?"

"আজ্ঞে, সর্পনিধন যজ্ঞ।"

"অর্থাৎ যজ্ঞ হবে আর মন্ত্রশক্তির আকর্ষণে সাপেরা এসে যজ্ঞের অগ্নিতে ঝাঁপ দেবে?"

"ঠিক তাই, হে মহামন্ত্রী।"

এই পর্যন্ত শুনেই রাজপুরোহিত বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত আসন থেকে লাফিয়ে উঠলেন,

"আপনি ... আপনিই কি সেই ভারতবিখ্যাত সর্পনিধন যজ্ঞ বিশারদ আচার্য্য সোমশ্রবা?"

বিনয়ে বিগলিত হয় সোমশ্রবা, মাথা নত করে বলে,

"আজ্ঞে, আমিই সেই অধম।"

"সেক্ষেত্রে, আমার মনে হয়, মহারাজ, সর্পনিধন যজ্ঞই আপনার উদ্দেশ্য সাধনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। মহামন্ত্রী কি বলেন?"

"আমিও এই প্রস্তাব সমর্থন করি। এতে আপনার উদ্দেশ্য যেমন সাধিত হবে তেমনি রাজ্যবাসীও উপকৃত হবে। মহারাজ, এই আগন্তুক সত্যিই দৈব প্রেরিত। আমি কিছুদিন ধরেই রাজ্যের দুর দুর প্রান্ত থেকে গুপ্তচরের মুখে খবর পাচ্ছিলাম যে লোকে সাপের কামড়ে এক অজানা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। যাকে সাপে দংশন করছে সে তো মারা যাচ্ছেই, তার কাছাকাছি যারা যাচ্ছে তারাও ওই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এই রোগের কোনও ওষুধও জানা নেই। "

বিভ্রান্ত ও হতচকিত রাজবৈদ্য কোনক্রমে বললেন,

"আমায় তো কেউ কোন খবর দেয়নি। আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না। রোগ লক্ষণ কি? উপসর্গ কি?"

"উপসর্গ নানাবিধ। এমন কি উপসর্গহীন রোগীও আছে। তারা জানেও না তারা রোগের জীবাণু বহন করছে এবং অন্যদের সংক্রামিত করছে। একেবারে ভয়াবহ অবস্থা। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে মহামারীর আকার ধারণ করবে। একমাত্র উপায় এইরকম সর্পনিধন যজ্ঞের সাহায্যে সব সাপকে মেরে ফেলা।"

রাজবৈদ্য বুঝলেন রোগের উল্লেখ অজুহাত মাত্র, উদ্দেশ্য অন্য। তিনি নীরবে বসে রইলেন। সিদ্ধান্ত যা হওয়ার তা' হয়েই গেল। এতক্ষণে জনমেজয় মুখ খোলার সুযোগ পেলেন,

"হে আচার্য্য, আপনি কত শীঘ্র যজ্ঞানুষ্ঠান করতে পারবেন?"

"হে রাজন, এক সপ্তাহব্যাপী এই যজ্ঞানুষ্ঠান অত্যন্ত কঠিন। যজ্ঞানুষ্ঠানের আগে একমাস ধরে আমাকে উপবাস ও জপ-তপের মাধ্যমে নিজেকে পরিশুদ্ধ ও প্রস্তুত করতে হবে। দেড়মাস পরে কোন একটা শুভ দিন দেখে শুরু করা যায়। রাজার নির্দেশে রাজজ্যোতিষী

যজ্ঞানুষ্ঠানের সুচনার দিন নির্দিষ্ট করে দিলেন। সেদিনের মত সভাভঙ্গ হল।

(৫)

যজ্ঞানুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য পরিকল্পনামাফিক কাজ শুরু হল। প্রথমেই বেশ কয়েক হাজার কর্মী বহুমুখী কাজের জন্য দুই মাসের চুক্তিতে স্বল্প বেতনে নিয়োগ করা হল। এরা মূলতঃ কায়িক পরিশ্রমের কাজগুলোই করছে। সকলেই প্রায় রাক্ষস, নিষাদ প্রভৃতি নিম্নবর্ণের জনজাতির লোক। এই ধরণের কাজ করেই এরা অভ্যস্ত। সুতরাং আধিকারিকদের তত্বাবধানে নিখুঁত ছন্দে কাজ এগিয়ে চলেছে। রাজপুরী থেকে কিছু দূরে যজ্ঞস্থল নির্বাচন করা হয়েছে। স্থানটি যথাসম্ভব সুসজ্জিত করা হয়েছে। তারই চারিপাশে মাঠ-ঘাট বন-জঙ্গল পরিস্কার করে বড় বড় সুন্দর বস্ত্রাবাস স্থাপন করা হয়েছে, সঙ্গে পাকশালা, ভাণ্ডার ইত্যাদিও রয়েছে। এইগুলি নিমন্ত্রিতদের মর্যাদা অনুযায়ী চিহ্নিত। মহামন্ত্রী ও অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত উচ্চশ্রেণীর কর্মচারীরা নিয়মিত তদারকি করছেন। কোষাগার থেকে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান আসছে। কোথাও কোন সমস্যা নেই।

একই সঙ্গে সমস্ত রাজ্য জুড়ে প্রচার চলছে সাপের কামড়ে অজানা রোগের কথা, তার ভয়াবহ সংক্রামক ক্ষমতার কথা, তার মারাত্মক পরিণতির কথা। বারবার জনসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে তারা যেন অপ্রয়োজনে বাড়ির বাইরে না বেরোয়। তার সঙ্গে এও প্রচার করা হচ্ছে যে আমাদের মহান রাজা, দয়ালু রাজা রাজ্যবাসীর কল্যাণে সর্পনিধন যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। সর্পনিধন যজ্ঞে সমস্ত সাপের মৃত্যু হলে এই ভয়ঙ্কর রোগ চিরতরে লুপ্ত হবে। প্রচারের প্রভাবে অন্যান্য সাধারণের মত সমালোচক, ছিদ্রান্বেষীরাও গৃহবন্দী হয়ে আছে। সোমশ্রবাদের উদ্দেশ্য সফল হল।

দিন গড়িয়ে মাস শেষ হয়। অবশেষে প্রস্তুতি পর্ব সমাপ্ত। যজ্ঞানুষ্ঠানের দিন সমাগত। অতিথিরা একে একে আসতে আরম্ভ করেছেন। ব্যবস্থাপনায় সকলেই খুসি। তাদের রুচি ও সুবিধা অনুযায়ী বস্ত্রাবাসে সামান্য পরিবর্তন করে দেওয়া হচ্ছে। তাহলেও নির্মাণ কাজে নিযুক্ত

কর্মীদের কাজের চাপ প্রায় নেই। তাদেরকেই পালা করে অঞ্চলটির পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। কর্মীদের কাউকে কাউকে অতিথিদের সেবকের কাজে বা পাকশালার কাজে লাগানো হচ্ছে। তবে অনেক অতিথি নিজস্ব সেবক সঙ্গে এনেছেন। সন্ধ্যার পর কর্মীর দল তাদের অস্থায়ী ঘরগুলির সামনে গোল হয়ে বসে গল্প করে। তাদের জীবনের গল্প, তাদের দুঃখ, কষ্ট, আনন্দ, বেদনার গল্প, জীবনের প্রতিকূলতার, সংগ্রামের গল্প। কখনও বা দেব-দেবীর মাহাত্ম্য, রাজাদের নানা কীর্তি, ধনীদের বিলাসিতার গল্প। আবার তারই সাথে নাচে, গায়, নেশা করে। রাক্ষস গোষ্ঠীর লোকেরাই সংখ্যায় বেশি। নানা বিষয়ে তারা বাকি গোষ্ঠীর লোকেদের তুলনায় অধিক পারদর্শী, নানা গুনে গুনী।

নির্দিষ্ট দিনে ভোরবেলায় যজ্ঞানুষ্ঠান শুরু হল। যজ্ঞকুণ্ডের থেকে খানিকটা তফাতে তিন দিক ঘিরে রাজা জনমেজয়, মহামন্ত্রী, সভাসদগন, রাজপুরবাসী ও অতিথিরা বসলেন এবং পুণ্য সঞ্চয় করতে লাগলেন। যজ্ঞস্থলের অন্য দিকে গাছপালার কিঞ্চিৎ আধিক্য ছিল এবং সেই দিকে প্রহরীর দল সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে উপস্থিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিরাপত্তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল। এই সবই মহামন্ত্রীর পরিকল্পনা। প্রথম দিনেই মহামন্ত্রীর পরামর্শে মহারাজা জনমেজয় মহর্ষি ব্যাসকে তার রচিত মহাভারত কাব্যখানি শোনাতে বললেন। ব্যাসদেবও এরই অপেক্ষাতে ছিলেন। অনুরোধ পাওয়া মাত্র তিনি শিষ্য বৈশম্পায়নকে আদেশ করলেন এবং বৈশম্পায়ন মুনি সুললিত কন্ঠে মহাভারত কাব্যখানি আবৃতি শুরু করলেন। উপস্থিত সকলেই তন্ময় হয়ে নীরবে শুনতে লাগল। এমন কি যে সমস্ত কর্মীরা ছুটি পেয়ে যজ্ঞস্থলের দুর প্রান্তে হাজির হয়েছিল তারাও মন দিয়ে শুনছিল। সুর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের মত যজ্ঞ শেষ হল। যে যার বাসগৃহে ফিরলেন। কর্মীদের বসতিতে আজ যারা মহাভারত শুনেছিল তারা বাকিদের শোনাল, তাই নিয়েই আরও গল্প হল, কথা হল। বড়মানুষদের বীরত্ব, মহত্ব নিয়ে যত না মুগ্ধ হল তার চেয়ে অনেক অবাক হল তাদের নীচতা খলতা দেখে। প্রতিদিন ভোরে যজ্ঞ শুরু হয়, সুর্যাস্তে শেষ। সারাদিন মহাভারত কাব্য আবৃতি হয়, সকলে মন দিয়ে শোনে। যজ্ঞ এগোয় নিয়ম মত। একেক দিন কর্মীদের বসতিতে আলোচনা জমে উঠে।

ষষ্ঠদিনে যজ্ঞের ধরণ বদলালো। মাঝে মাঝেই সাপেরা শূন্য পথে অর্থাৎ যজ্ঞস্থলের একদিকে থাকা গাছপালার মাথা টপকে যজ্ঞকুণ্ডে এসে পড়তে লাগল। কখনো কখনো অবশ্য গাছপালা ভেদ করেও সাপেরা আসতে লাগল। আর যখনই সাপেরা যজ্ঞানলে এসে পড়ে তখনই রাজপুরোহিত ও সোমশ্রবা অধিক জোরে মন্ত্রোচ্চারণ করেন যাতে উপস্থিত সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, যাতে তারা সর্পনিধন যজ্ঞের সাফল্য অনুধাবন করতে পারেন। মহাভারত আবৃতিতে অবশ্য ছেদ পড়ে না। উপস্থিত দর্শকেরা মুহূর্তের জন্য যজ্ঞকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে আবার কথকের দিকেই মন দেন। অনেকে সেটুকু মনোযোগও ঋষি বৈশম্পায়নের উপর থেকে সরান না। সুতরাং যেমন যেমন ভাবা হয়েছিল যজ্ঞানুষ্ঠান সেভাবেই গড়িয়ে চলল। তবে মাঝে মাঝে জনমেজয় প্রশ্ন করেন,

"নাগরাজ তক্ষক কি যজ্ঞানলে এসে পড়ল?"

মহামন্ত্রী রাজার পাশেই বসেন। তিনি সামাল দেন,

"আজ্ঞে, সব সাপ নিধন হলে তবে নাগরাজ আসবেন। সপ্তম দিনে নাগরাজ তক্ষককে দিয়েই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেওয়া হবে।"

(৬)

ষষ্ঠদিনের যজ্ঞের শেষে সবাই প্রতিদিনের মত বাসস্থানে ফিরলেন। রাত একটু গভীর হলে রাজপুরোহিত ও সোমশ্রবা নিজেদের বস্ত্রাবৃত করে মহামন্ত্রীর গৃহে উপস্থিত হলেন। মহামন্ত্রী তাদের প্রতীক্ষাতেই ছিলেন। দ্বারপালকেও উপযুক্ত নির্দেশ দেওয়া ছিল। অতএব দু'জনেই অবিলম্বে মহামন্ত্রীর বিশ্রাম কক্ষে তার সামনে উপস্থিত হলেন। দু'জনেই নিঃশ্চুপ। তাই মহামন্ত্রীই মুখ খুললেন,

"আমি আপনাদেরই জন্য অপেক্ষা করছিলাম।"

রাজপুরোহিত একটু ইতঃস্তত করে বললেন,

"একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে।"

"আগেই আন্দাজ করেছি," একটু থামলেন মহামন্ত্রী, "মন্ত্রের জোরে নাগরাজ তক্ষককে আনা সম্ভব হচ্ছে না। তাই তো? যজ্ঞানলে আহুতি দেওয়া তো দুরের কথা।"

"আজ্ঞে, মন্ত্রের জোরে সাধারণ সাপদের ..."

ডানহাত তুললেন মহামন্ত্রী,

"থাক, মন্ত্রের জোরে ক'টা সাপ যজ্ঞের আগুনে এসে ঝাঁপ দিয়েছে সে নাহয় নাই গুনলাম। সেসব আমাদের নিজেদের ব্যাপার।"

"কোটালের পক্ষে তো আর নাগরাজকে ধরে আনা সম্ভব নয়," রাজপুরোহিত চিন্তিত।

সোমশ্রবার হাত-পা তখন কাঁপছে। কোনক্রমে বললেন,

"কিন্তু নাগরাজ তক্ষক না এলে রাজার শপথ তো পূর্ণ হবে না। তিনি আমার উপর ভরসা করেছিলেন। আমিও দায়িত্ব নিয়েছিলাম।"

কিছুক্ষণ নীরবে থেকে মহামন্ত্রী বললেন,

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনাকে অত ভাবতে হবে না। যেমন চালাচ্ছেন আগামীকাল অপরাহ্ন পর্যন্ত চালিয়ে যান। বাকিটা আমি সামলে নেব। রাজপুরোহিত, আপনি ওকে সাহস যোগাবেন যাতে অনভিজ্ঞতার জন্য অসামঞ্জস্যপূর্ন কোন কাজ করে না বসে। আপাতত নিশ্চিন্তে ঘুম দিন, রাত অনেক হল।"

রাজপুরোহিত ও সোমশ্রবা মহামন্ত্রীকে অভিবাদন করে বিদায় নিলেন।

সপ্তমদিনে একটু বেলা বাড়তেই জনমেজয় অধৈর্য্য হয়ে পড়লেন। যার জন্য এত আয়োজন সেই নাগরাজ তক্ষককে যদি যজ্ঞানলে আহুতি দেওয়া না যায় তবে উপস্থিত অতিথিবর্গের সামনে তার সম্মানহানি ঘটবে। বারবার পাশে বসা মহামন্ত্রীর কাছে নিচু স্বরে সে উৎকন্ঠাই জানাচ্ছেন। মহামন্ত্রীও আশা দেখাচ্ছেন ও ততক্ষণ মন দিয়ে মহাভারতকথা শুনতে বলছেন। মহাভারতের আবৃতিও শেষ হয়ে আসছে। মধ্যাহ্নভোজের ঠিক আগে মহাভারতকথা শেষ হল। সকলেই মুগ্ধ এবং অকুন্ঠ চিত্তে ব্যাসদেবের ধন্য ধন্য করতে লাগলেন।

মধ্যাহ্নভোজের পর সকলেই একমনে যজ্ঞানুষ্ঠান দেখতে লাগলেন। মহারাজ জনমেজয় সমবেত দর্শকমণ্ডলীর মাঝখানে বসে আছেন, পাশে মহামন্ত্রী। সবাই উদগ্রীব, যেকোন সময় সেই ঈপ্সিত ঘটনা ঘটে যেতে পারে অর্থাৎ নাগরাজ তক্ষক যজ্ঞানলে প্রবেশ করবেন। এমন সময় কিঞ্চিৎ গোলযোগ শোনা গেল। মহামন্ত্রী ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন সভাস্থলের ঠিক বাইরে কিছু লোক জড় হয়ে চিৎকার করছে। জনমেজয় তাকালেন মহামন্ত্রীর

দিকে, চোখে প্রশ্ন। মহামন্ত্রী নিচু স্বরে বললেন,

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি নিজে গিয়ে দেখছি ব্যাপারটা।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই গোলযোগের তীব্রতা কমে এল। মহামন্ত্রী ফিরে এলেন,

"মহারাজ, ওনারা 'পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ সমিতি'র সদস্য। ওনাদের দাবী এই যে সাপেরাও বাস্তুতন্ত্রের অংশ। এইভাবে গণহারে সাপ মেরে ফেললে আখেরে পরিবেশের অপুরণীয় ক্ষতি হবে। অতএব অবিলম্বে সর্পনিধন যজ্ঞ বন্ধ করতে হবে। মহারাজ, ওনারা সকলেই শিক্ষিত, সুধী ও প্রবীণ, জনসাধারণের সম্মানীয় এবং আদরনীয়। ওনাদের কথা অগ্রাহ্য করা সমীচিন হবে না।"

"কিন্তু এতদুর এগিয়ে এখন এই যজ্ঞ বন্ধ করা যাবে কি করে! আমার শপথ! আমার সম্মান! নাগরাজ তক্ষক এখনো ..."

"এত উতলা হবেন না, আমি কোন উপায় করা যায় কি না দেখছি।"

মহামন্ত্রী মহর্ষি ব্যাসদেবের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে করজোড়ে বললেন,

"একটা বিপদ উপস্থিত হয়েছে। আপনাকে একান্তে নিবেদন করতে চাই।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এই কুরু বংশের এক প্রধান পুরুষ এবং বহুবার বিপদের সময় পরামর্শ দিয়ে উদ্ধার করেছেন। অতএব এককথায় তিনি মহামন্ত্রীর সঙ্গে সভাস্থলের বাইরে এলেন। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে তিনি সভাস্থ সকল লোক এবং 'পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ সমিতি'র সদস্যদের জটলার দিকে তাকালেন,

"মহামন্ত্রী, তুমি তোমার পদের অত্যন্ত উপযুক্ত ব্যক্তি। ব্যবস্থা সবই করে রেখেছ, দেখছি।"

তারপর জনমেজয়ের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন,

"বৎস জনমেজয়!"

"আদেশ করুন, পুজ্যপাদ।"

"সাতদিন ধরে তো রাজকার্য বন্ধ রয়েছে। তা'তে রাজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। আপাতত আমার একটি অনুরোধ রাখলেই হবে।"

মহর্ষি ব্যাসদেবের অনুরোধ! জনমেজয় গর্বে স্ফীত,

"অনুরোধ নয়, আদেশ বলুন, দেব।"

"আস্তীক নামে এক বালক তোমার কাছে এক আবেদন নিয়ে বহুক্ষণ অপেক্ষা করছে। আমি চাই ..."

"বিলক্ষণ, বিলক্ষণ," মহর্ষির কথা আর শেষ করতে দেন না জনমেজয়, "মহামন্ত্রী!"

জটলার মধ্য থেকে বালক আস্তীককে খুঁজে এনে রাজার সামনে হাজির করা হল। বোঝা যায়, সে যথেষ্ট সপ্রতিভ। রাজা বললেন,

"বল, বালক, কি তোমার আবেদন?"

"আজ্ঞে, মা বলল যে আমার মামার ভীষণ বিপদ, একেবারে প্রাণসংশয়। একমাত্র আপনিই না কি তাকে রক্ষা করতে পারেন। একা আসতে ভয় পাচ্ছিলাম, তাই জেঠুরা ডেকে সঙ্গে নিয়ে এলেন।"

"নিশ্চিন্ত থাক, বালক। তোমার মাকে বোলো আমি থাকতে কেউ তোমার মামার প্রাণ নিতে পারবে না।"

এই পর্যন্ত শুনে ব্যাসদেব যজ্ঞকুণ্ডের দিকে ফিরলেন,

"ওহে সোমশ্রবা, যজ্ঞ সমাপ্ত করার ব্যবস্থা কর।"

আঁতকে ওঠেন জনমেজয়,

"এর মানে?"

"অতি সরল। এই বালকের মামা হচ্ছেন নাগরাজ তক্ষক। তুমি এইমাত্র তার প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছ। তাছাড়া তুমি অহেতুক নাগরাজ তক্ষকের উপর রুষ্ট হয়েছ। তুমি হয়তো ভুলে গেছ, কিন্তু তোমার মা তোমাকে বহুবার বলেছে, পরীক্ষিত স্বয়ং নাগরাজ তক্ষককে আহ্বান করেছিল তাকে দংশন করার জন্য।"

"নাগরাজ তক্ষকের নামে শুরু করা যজ্ঞ শেষ হবে কিভাবে?" সোমশ্রবার প্রশ্ন।

"শাস্ত্রীয় মতে," মুচকি হাসেন, ব্যাসদেব, "একটি বিল্বপত্রে তক্ষকের নাম লিখে যজ্ঞানলে পূর্ণাহুতি দাও।"

জনমেজয়ের সর্পনিধন যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পন্ন হল এবং নাগরাজ তক্ষক জীবিত রইল।

(৭)

জনমেজয়ের সর্পনিধন যজ্ঞ সম্পন্ন হওয়ার পরদিন অতিথিরা একে একে বিদায় নিলেন। রয়ে গেলেন শুধু দুই জন – মহর্ষি ব্যাসদেব আর রাক্ষসদের গোষ্ঠীপতি ।

মহর্ষি ব্যাসদেব এই কুরু বংশের এক প্রধান পুরুষ, মহাবীর ভীষ্মের সহোদর ভাই, পান্ডু ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের পিতা। এই বংশের পাঁচপুরুষ তাঁর সামনে জন্মেছে, বড় হয়েছে এবং কেউ কেউ মারাও গেছে। এই রাজপরিবারে তাঁর স্থান অনন্য।

যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যস্ততায় তাঁর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া যায়নি। এখন বাড়ির ললনারা সেই অনিচ্ছাকৃত ভুল সংশোধন করতে চান, কয়েকদিন তাঁকে রেখে নিরবিচ্ছিন্ন সেবা করতে চান। মহর্ষিরও তা'তে খুব আপত্তি নেই। তাই রয়ে গেলেন। রাক্ষসদের গোষ্ঠীপতি এসেছিলেন রাজার নিমন্ত্রণে যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগ দিতে। জুটেছিল একটা ছোট বস্ত্রাবাস, যজ্ঞস্থলে বসেছিলেন পিছনের সারিতে। অখুশী হননি, এমনই তো ঘটে এসেছে চিরকাল। তবুও রাজার অতিথি তো! ফেরার সময় গোষ্ঠীপতিকে ঘিরে ধরল রাক্ষসের দল। তারা এখানকার কর্মী, তাদের কাজ এখনো শেষ হয়নি। বস্ত্রাবাস ইত্যাদি সমস্ত জিনিস গুছিয়ে তুলে, আবর্জনা পরিস্কার করে, সাফ করা জমি চাষের উপযোগী করে তবে তাদের ছুটি। অন্তত সাতদিনের কাজ। এই সময়টা ওরা চায় নিজের হাতে ওদের গোষ্ঠিপতির সেবা করতে। নিজেদের গ্রামে এই সুযোগ ওদের মেলেনা। হোক ক্ষমতায় ছোট, হোক আড়ম্বরে ছোট, গোষ্ঠীপতিই ওদের রাজা! এত সুনীতিপরায়ন, এত দরদী গোষ্ঠীপতি আছে বলেই তো ওরা এত শান্তিতে আছে। গোষ্ঠীপতি ও জানেন এত ভালবাসার লোক আছে বলেই তো তিনি এদের কাছে রাজা! তাই রয়ে গেলেন।

দিনের শেষে আগুন জ্বেলে কর্মীদের বসতিতে বসে আনন্দের আসর, গোষ্ঠীপতিকে মাঝখানে বসিয়ে। নাচ গান সবই হয়, তবে সবচেয়ে বেশি হয় মহাভারতের গল্প। গোষ্ঠীপতি পুরোটাই শুনেছেন। তিনি বলেন, অন্যরাও বলে। আর তাই নিয়ে চলে আলোচনা। সেই আলোচনায় দুর থেকে দেখা রাজপরিবারের বা রাজপুরুষদের বীরত্ব মহত্ব নিয়ম-নীতি শিক্ষা আভিজাত্যর খোলস ওদের চোখে খসে খসে পড়ে। এতদিনের মুগ্ধতা বশ্যতা যা ওদের মন ভরে ছিল সে যেন ধীরে ধীরে মুছে যেতে থাকল।

"ভেবে দেখ, ভাই! এক মা তার ছেলেদের মেরে ফেলছে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে!"

"বাবাটা কিছু বলছে না?"

"বলবে কি! বললেই না কি বউ তাকে ছেড়ে চলে যাবে।"

"যায়, যাক। অমন বউ থাকার চেয়ে না থাক ভাল। আমাদের ঘরেও কিন্তু এমনটা হয় না!"

"কি একটা শাপ মুক্তির ব্যাপার ছিল না?"

"হলেই বা! সেই বাপ আবার ঘরে সোমত্থ ছেলে থাকতে বিয়ে করতে ছুটলো! ছি ছি!

"এ কি শুনলুম! একই মায়ের পেটের তিন ভাইয়ের তিন বাপ! এ কোন নিয়ম? তা'ও সবাই মেনে নিলে!"

"কেন নেবে না? একজনের তো আবার পাঁচজন স্বামী।"

"একই পরিবারে ভাই ভাইকে মারার জন্য বিষ খাইয়ে জলে ফেলে দিল। তা'তেও হল না তো পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করে ফেলল!"

"ওরাই বা কি! বিনা দোষে নিষাদ বউ আর তার পাঁচ ছেলেকে পুড়িয়ে মারলে!

"এরা করে আবার অন্যের বিচার। যারা মারল তাদের মধ্যে একজন নাকি আবার ধম্মপুত্তুর।"

"আর, ঐটা শুনলে না! সভাভর্তি লোকের মাঝে নিজেদের বাড়ির বউয়ের কাপড় ধরে টানাটানি! কি নির্লজ্জ, কি নির্লজ্জ!"

"আর সভায় কারা বসে আছে? না, নিজেদের বাপ পিতেমোরা। তারাও চুপ। আমাদের সালিশি সভায় এমন কেউ করুক দেখি।"

"সবাই শাস্ত্র বিচারে মেতেছে। বউকে না কি জুয়ো খেলায় হেরেছে। আমাদের রাজার সামনে কেউ খেলুক তো দেখি এমন জুয়ো! পারবে?"

সবচেয়ে বেশি তিক্ততা ঝরে পড়ে যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনা উঠে আসে।

"এ কেমন যুদ্ধ! নিজেদের বানানো নিয়ম নিজেরাই ভাঙে!"

"বুড়োগুলোর সঙ্গে যুদ্ধে পারে না। শেষে যখন তারা অস্ত্র ফেলে যুদ্ধ ছেড়ে দেয় তখন গিয়ে মারে।"

"আবার দেখ, নিজেরাই ঠিক করেছে একজনের সঙ্গে একজনই যুদ্ধ করবে। এদিকে একটা বাচ্চাছেলেকে সাতজন মিলে ঘিরে ধরে মারছে। কি কাপুরুষ!"

"আর কেবল রাজাদের বাড়ির লোকেদেরই বীরত্বের কথা। তারা রথে চড়ে দামি দামি অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে, তবু তাদেরই প্রশংসা। আমাদের মত যারা মাটিতে দাঁড়িয়ে সামনাসামনি যুদ্ধ করেছে তাদের নাম নেই, বীরত্ব নেই, শুধু এত হাজার মরল, অত লাখ মরল। যেন ঘর শূন্য করে তাদেরকে মরতেই আনা হয়েছে।"

"আমরা অমন করে মরতে না গেলেই পারি।"

"যাই কি আর সাধে! পেটের দায়ে। এই যেমন এখানে এসেছি।"

"কত আর অর্থ দেয়! তা'তে ভাল করে পেটও ভরে না। ঘরে নিয়ে যাব কি? অথচ

দেখ নিজেদের আমোদ আহ্লাদে কত খরচ করে।"

"এই যে সর্পনিধন যজ্ঞ, তার নাম করে কি ফুর্তি করল! আর তা'তে যত রাজ্যের ছোটখাটো সাপ মরল, নাগরাজকে কিন্তু মারল না। রাজারা মরে না, আমরাই মরি।"

"আর ঐ ছোট সাপগুলো, ওদের আবার বিষ আছে না কি! আমাদের ঘরের ছোট ছেলেরাই ওগুলো নিয়ে খেলা করে, লেজ ধরে ঘোরায়।"

"আরে না, কি যেন এক রোগ এসেছে শুনিস নি? সাপে কামড়ালে হয়।"

"দেখেছিস এমন রোগী? আমাদের জানাশোনা কারো হয়েছে? সব ধোঁকাবাজী।"

"ঠিক বলেছিস, এইসব বুঝিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়।"

"যেমন ধোঁকাবাজী ঐ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। সব নিজেদের স্বার্থে, আমাদের সব্বোনাশ করে। বড়োদের কাছে শুনেছি, তারাও শুনেছে তাদের বড়োদের কাছে। কোন এক মহাযুদ্ধে আমাদের ঘর খালি হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রীরা হারিয়েছিল তাদের স্বামীদের, ছেলেপিলেরা তাদের বাবাকে, মায়েরা তাদের ছেলেদের। হাহাকারে গাঁকে গাঁ ডুবে গিয়েছিল। আজ জেনেছি সে ঐ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ।"

"কি ফলিয়ে লেখা! কি গর্ব! কত তাদের বীরত্ব! যা কিছু লাভ তাদের, আমাদের প্রাণের বিনিময়ে।"

"তারা না হয় রাজ্য পেল। সব হারিয়ে আমরা কি পেয়েছি, কি পেলাম! বীরদের দলেও আমাদের নাম দেয় না।"

"ঠিক কথা, রাতের বেলা যেদিন যুদ্ধ হল আমাদের ঘটোৎকচকে সামনে এগিয়ে দিল মরার জন্য। তারপর থেকে তার নামও কেউ নিল না।"

"অভিমন্যু মরল, তার জন্য কত কান্নাকাটি, কত প্রতিজ্ঞা! আর ঘটোৎকচ মরার পর তার কিচ্ছুটি নয়।"

"আর রাজবাড়িতে সব ভাইয়ের সব বৌ থাকে, শুধু আমাদের মা হিড়িম্বা নয়।"

আলোচনা যত চলে, সময় যত গড়ায়, কথায় তিক্ততা বাড়ে, বুকে জ্বালা ধরে। সেই থেকে ক্ষোভ, প্রতিবাদের ইচ্ছা।"

"আমরা আর ওদের কথা শুনব না, ওদের কাজ করব না। বল, রাজা, অনুমতি কর। আমরা কালই তোমার সাথে চলে যাব।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা সবাই তোমার সাথে যাব, রাজা। ভগবানের দেওয়া মাটিতে, জলে, জঙ্গলে খেটে যা পাব তাই খেয়ে খুসি

থাকব। গায়ে খেটে এদের সেবা আর করব না।"

গোষ্ঠীপতি বোঝেন এ ওদের মনের কথা। নিজের মনেও তার সায় পুরোপুরি। তবু তাকে ভবিষ্যত ভেবে কাজ করতে হয়। আপাতত অনুচরদের শান্ত করে বলেন,

"ঠিক, আছে কাল দেখা যাবে। অনেক রাত হল, এখন সবাই ঘুমোতে যাও। আমিও উঠি।"

(৮)

ভোর হতে না হতেই গুপ্তচরের দল মহামন্ত্রীর বাড়ির দিকে ছুটল। খবর পেয়ে প্রাত্যহিক কাজগুলো যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করে তিনি রাজবাড়ি পৌঁছলেন। রাজসভা শুরু হতে তখনও ঢের দেরি। রাজার বিশেষ মন্ত্রণাকক্ষে পৌঁছে, রাজাকে খবর পাঠালেন, "মহামন্ত্রী দর্শনপ্রার্থী।"

কিঞ্চিৎ অগোছালো অবস্থায় জনমেজয় মন্ত্রণাকক্ষে পৌঁছে, দেখেন মহামন্ত্রী গম্ভীর মুখে পায়চারী করছেন। জনমেজয় অবাক হলেন। দু'দিন আগেই সমস্ত রাজারা এখানে উপস্থিত ছিলেন। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, কথাবার্তা হল। তারা এখনো নিজের রাজ্যে গিয়ে পৌঁছতে পারেননি। সুতরাং যুদ্ধের কোনই সম্ভাবনা নেই। দেশে খরা বা অতিবৃষ্টি হয়নি, ফসল ভাল হয়েছে। মহামারীর সম্ভাবনা একটা দেখা দিয়েছিল বটে, তা'ও নিবারণ করা গেছে। যজ্ঞানুষ্ঠান মহর্ষি ব্যাসদেবের পরামর্শে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে, দৈবরোষের কারন ঘটেনি। তবে? শঙ্কিত মনে জিজ্ঞাসা করলেন,

"প্রাতঃপ্রণাম মহামন্ত্রী। আপনি কি বিচলিত?"

"প্রাতঃপ্রণাম। বিচলিত হবার কারন ঘটেছে।"

দু'জনে মুখোমুখী আসন গ্রহণ করার পর মহামন্ত্রী স্বাভাবিক স্বরে বললেন,

"যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য রাক্ষস গোষ্ঠীর যে সমস্ত কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছিল তারা বিক্ষুব্ধ। এই বিক্ষোভের প্রসার ঘটতে পারে।"

"প্রসার ঘটতে পারে, মানে?"

"অন্যান্য গোষ্ঠীর অস্থায়ী কর্মীরা এদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে। এমন কি স্থায়ী কর্মীরাও। নির্ভর করছে ওরা কি চায় তার উপর।"

"রাক্ষস গোষ্ঠীর কর্মীদের উপর আমরা কতটা নির্ভরশীল?"

"নিম্নবর্গের কাজের জন্য নিযুক্ত স্থায়ী কর্মীদের অধিকাংশই রাক্ষস গোষ্ঠীর। এরা কর্মঠ ও দক্ষ। এরা ছাড়া নাগরিক পরিষেবা ভেঙে পড়বে। সৈন্যবাহিনীতেও এরাই রণকুশলী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ। এখন না হলেও অদুর ভবিষ্যতে যুদ্ধ হবে না এমন কথা বলা যায় না। এমন কি সাধারণ নাগরিকরাও নানা কাজে এদেরই নিয়োগ করে।"

"তবে তো চিন্তার কথা। এদের দাবীটা জানা গেছে কি?"

"খুব স্পষ্ট নয়, ভাসা ভাসা।"

"তাহলে চরদের আদেশ করুন।"

"উঁহুঁ, তা'তে সময় নষ্ট হবে। ব্যাপারটা দ্রুত নিস্পত্তি করতে হবে, আরও ছড়িয়ে পড়ার আগে। ওদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলাই ভাল।"

"কার সঙ্গে কথা বলবেন? সে তো হট্টগোল হবে।"

"না, আমাদের ভাগ্য ভাল। রাক্ষস গোষ্ঠীপতি যজ্ঞানুষ্ঠানে অতিথি হয়ে এসেছিলেন। তিনি এখনও যাননি। একটা ব্যাপারে আপনার অনুমতি চাই। ভাবছি তাকে আজকে দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের জন্য আমার গৃহে নিমন্ত্রণ করব। এতে তাকে সম্মান ও গুরুত্ব দেওয়া হবে। আর আহারান্তে আলোচনার মাধ্যমে আমরা সমাধান বার করার চেষ্টা করব। মহর্ষি ব্যাসদেব যদি এই উপলক্ষ্যে গরীবের গৃহে পদধূলি দেন তবে বড় বাধিত হব। অন্দরমহলে এই সময়ে যাওয়া সমীচীন নয়, আর ওনাকে এখানে আহ্বান করার ধৃষ্টতা আমার নেই। তাই অনুগ্রহ করে ওনার চরণে আমার নিমন্ত্রণ পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবেন। আর একটু দেখবেন উনি যেন সেই আলোচনায় উপস্থিত থাকেন। তার প্রজ্ঞা আজ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।"

"যা ভাল বোঝেন। আপনার উপর নির্ভর করে রইলাম। আর মহর্ষি ব্যাসদেব বার বার আমাদের বংশকে রক্ষা করেছেন। আজও আশাকরি অন্যথা হবে না।"

বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে মহামন্ত্রী দ্রুত বেরিয়ে রথে চড়ে বসলেন। রথ রাক্ষস গোষ্ঠীপতির বস্ত্রাবাসের দিকে চলল।

সেদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর মহামন্ত্রীর মন্ত্রণাকক্ষে তিনজনের বিশ্রম্ভালাপ শুরু হল। দু'একটি কথার পর ব্যাসদেব নীরব রইলেন। মহামন্ত্রী আলোচনায় মুখ্য ভূমিকা নিলেন এবং বলতে লাগলেন মহারাঞ্জা রাক্ষস গোষ্ঠীর উন্নতির জন্য কি কি বিশেষ ব্যবস্থা নিতে চলেছেন, রাক্ষস কর্মীদের সুখ

সুবিধার ব্যাপারে কি ভাবনা চিন্তা চলছে। সমস্যা হল রাক্ষস গোষ্ঠীর লোকেরা ও তাদের গোষ্ঠীপতি সরল এবং সোজা। সুতরাং একথার উত্তরে গোষ্ঠীপতি অকপট, "এসব করার বোধহয় প্রয়োজন হবে না। আমরা ক্রমশঃ এই ধরণের কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছি।"

"সে কি আমরা চিরকাল হাতে হাতে মিলিয়ে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলেছি, রাজ্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছি। এই রাজ্যের বর্তমান সাফল্য ও সমৃদ্ধির জন্য আপনাদের অবদান অনস্বীকার্য। আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি বা বিচ্ছেদের কথা ভাবাও যায় না।"

"সেসব ঠিক কথা। কিন্তু হতাশা থেকেই বিচ্ছেদের কথা ভাবতে হচ্ছে।"

"হতাশা যদি তৈরি হয়ে থাকে তবে সে আমাদের ত্রুটি এবং সেই ত্রুটি অবিলম্বে সংশোধন করতে হবে। এ বিষয়ে মহারাজ বদ্ধপরিকর। কিন্তু কারণটা তো জানতে হবে।"

"অনর্থক বাক্য বিন্যাস করে লাভ নেই। এক কথায় বলতে গেলে আপনি যে অবদানের কথা বললেন তার যথার্থ মূল্য ও মর্যাদা আমরা পাইনি। তাই আমাদের এই সিদ্ধান্ত।"

"কিন্তু ত্রুটি সংশোধনের একটা সুযোগ ..."

"আপনি যাকে ত্রুটি বলছেন, সেটা ঠিক তাৎক্ষণিক কোন ব্যাপার নয়। এটা দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ, আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। আপনাদের আদীষ্ট কাজ করতে আমরা আর উৎসাহ পাচ্ছি না।"

"এ তো আমার আদেশ নয়, এ রাজার কাজ। জানেন তো রাজা দেবতারই প্রতিভূ আর রাজার অভীষ্ট কাজ করা মানে দেবতার পূজা করা।"

"সে না হয় মানলাম। কিন্তু আপনাদের আর আমাদের সামাজিক অবস্থান, বর্ণ, রীতিনীতি সবই আলাদা। আমাদের পূজ্য আলাদা, দেবতা আলাদা। তাই..."

এর উত্তরে মহামন্ত্রীর মুখে আর কোন কথা যোগালো না। চিরকাল এই স্তোক বাক্য দিয়েই ওদের মোহিত করে রাখা হয়েছে। আজ রাক্ষস গোষ্ঠীপতির অমোঘ যুক্তির উত্তর মহামন্ত্রীর কাছে ছিল না। নেমে এল অখণ্ড নীরবতা। কিছুক্ষণ পর সে অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙলেন মহর্ষি ব্যাসদেব,

"বৎস, সব দেবতাই আলাদা নয়। তোমরা মা হিড়িম্বার পুজো কর না?"

"মা হিড়িম্বা!"

"হ্যাঁ, দেবী হিড়িম্বা, দেবতা ভীমের পত্নী। বুঝিয়ে বলি, শোন, মহাপ্রস্থানে যাত্রা করে পঞ্চপাণ্ডবরা শেষ পর্যন্ত স্বর্গে পৌঁছল। তারপর থেকে সেখানেই বাস করছে, ফলতঃ তাদের দেবত্ব প্রাপ্তি হয়েছে। মা হিড়িম্বা পঞ্চত্ব প্রাপ্তির পর স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। দেবতার পত্নী হিসাবে তিনিও দেবী হয়েছেন। আর্য রমনীরা নবরাত্রিতে মা দুর্গার পূজার সঙ্গে মা হিড়িম্বাকেও পূজা করে।"

"কই তার কোন মন্দির তো ..."

"সব দেবতারই কি মন্দির আছে? তবে তোমরা চাইলে আর দেবীর ইচ্ছা হলে নিশ্চয়ই হবে। আমাদের কালে যদি নাও হয়, আমাদের কোন উত্তরসুরী মন্দির তৈরি করবে।"

"আর ঘটোৎকচ?"

"দেব দেবীর সন্তান যখন, তখন দেবতাই হবেন। তবে তিনি বিরাট যোদ্ধা, মহাবীর। তার মন্দির তো সাধারণ মন্দির নয়, তাঁকে বড় বেদীর উপর যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভবিষ্যতে কলিযুগে এই নিয়মই বলবৎ থাকবে।"

হিড়িম্বা দেবী আর ঘটোৎকচের মন্দিরের বীজ এই ভাবে বপন হল। রাক্ষস গোষ্ঠীপতির অনমনীয় মনোভাব নমনীয় হয়ে এল।

উপসংহার

উপরের গল্পটা নেহাৎ গল্প, নিতান্তই কাল্পনিক। কিন্তু হিড়িম্বা দেবীর আর ঘটোৎকচের মন্দির সত্য, আজও মানালিতে বিদ্যমান (নিচের ছবি দ্রষ্টব্য)।মহারাজা বাহাদুর সিং কর্তৃক ১৫৫৩ সালে প্রতিষ্টিত। নবরাত্রিতে বড় উৎসব হয়।

HADIMBA TEMPLE
GATOTHKACH TEMPLE

****

নিউ নর্মাল

দীপাঙ্কনা ব্যানার্জী, লাইব্রেরী

আজ প্রায় তিন মাস পরে আমি যেখানে কাজ করি সেখানে গিয়েছিলাম। কাজ বলতে একটা ইন্সটিটিউটের লাইব্রেরীতে পার্টটাইম কাজ করি আমি। আমার ডিউটি শনিবার আর রবিবার। এর ফলে যেটা হয় সেটা হল, ওখানে আরো যারা কাজ করেন তাদের মোটামুটি কারোর সঙ্গেই আমার চেনাপরিচিতি নেই। কিন্তু তাও আজ যখন গেট দিয়ে ঢুকছি মুখে মাস্ক পরে থাকা অবস্থাতেও সিকিউরিটি দাদারা আমায় চিনতে ভুল করেননি। তারপর থার্মাল স্ক্যানিং আর স্যানিটাইজারের রক্ষাকবচ পেরিয়ে লাইব্রেরীতে গেলাম। এই প্রথম শুনলাম লাইব্রেরী তালাবন্ধ ছিল এতদিন। কারণ দুর্গাপূজা বা বড়দিনের টানা লম্বা ছুটি এখানে নেই। তাই লাইব্রেরী সারাবছর খোলা থাকে। আমি সপ্তমী অষ্টমীতেও ডিউটি করেছি বুকে পাথর চাপা দিয়ে।

আজ লাইব্রেরীতে গিয়েই খেয়াল করলাম ক্যালেন্ডারটা মার্চ মাসেই থেমে আছে। পিওনদাদা জলের বোতল দিতে এলে ফিরিয়ে দিয়েছি। কারণ অফিসের বোতলে জল খেতে ভরসা পাইনি। এখানে আমার সহকর্মী বলতে একজনই, ইন্দ্রাণীদি। উনি সোম থেকে শনি আসেন, তাই শনিবারটা আমার একা লাগে না। আমরা একে অন্যের জায়গায় গিয়ে গল্প করি, একসঙ্গে বসে চা খাই। টিফিন ভাগাভাগি করে খাওয়া হলে, তারপর ক্যাম্পাসটা একপাক ঘুরে আসি। খুব অদ্ভূতভাবেই এগুলোর কোনোটাই আর আগের মতো করতে পারিনি। মাস্ক পরে বেশীক্ষণ থাকতে অসুবিধা হচ্ছে বলে কাছাকাছি বসে আগের মতো গল্প করা হয়নি। অফিসের কাপে চা টাও সাহস করে খেয়ে উঠতে পারিনি। না, সত্যি, আগের মতো আর কিছুই খুঁজে পাইনি। রাস্তা পার হতে গিয়ে একে অন্যের হাতটাও ধরতে পারিনি। অটোতে বসেছি দুজন দুই প্রান্তে। পাশাপাশি বসলে চলন্ত অটোর আওয়াজ পেরিয়ে যেটুকু কথা বলা যায় এবার আর সেটুকুও হয়নি।

সামাজিক দূরত্ব বা শারীরিক দূরত্ব সবই ঠিকাছে। কিন্তু কোথাও কি আমরা মানসিক দূরত্বও বাড়িয়ে ফেলেছি নিজেদের অজান্তে? কেউ পাশে এসে বসলে বা হাতে হাত লেগে গেলে আমরা ভাবছি কোভিড হতে আর দেরি নেই বোধহয়। এরপর কেউ কারোর বাড়িতে গেলেও হয়তো আমরা বিরক্ত হব। এসব হয়তো একদিন অভ্যাস করে নেব আমরা। তবু আশা রাখি পৃথিবী সেরে উঠবে, মানুষ সেরে উঠবে, শারীরিকভাবে আর মানসিকভাবেও।

****

জীবনের অন্দরমহল

দীপরঞ্জন পাল, এস.আর.এফ, এস.এম.ইউ.

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে লক্ষ লক্ষ জীবিত ও মৃত নক্ষত্ররাজির মাঝে জ্বলজ্বল করে সপ্তর্ষিমন্ডল একটি প্রশ্নচিহ্ন নিয়ে। আমাদের মাথার উপর এসে পড়ে প্রশ্নের আলো, স্নায়ুতন্ত্রে ঘুরে বেড়ায় সেইসব প্রশ্ন-আলোকণা। স্থির থাকতে দেয় না, বার বার প্ররোচিত করে প্রশ্ন করতে। তাছাড়া নচিকেতা, গার্গী এবং অর্জুনের উত্তরাধিকার বহন করছি আমরা, যাঁরা যুগে যুগে প্রশ্ন করতে শিখিয়েছেন।

কী সেই অমোঘ প্রশ্ন, যার জন্য এত ভূমিকার প্রয়োজন? সুনীল গাঙ্গুলী একটি কাব্যগ্রন্থের নামই দিয়ে গেছেন প্রশ্নটি দিয়ে, "আমি কীরকম ভাবে বেঁচে আছি "। সহজ করে বললে, মানুষ কীভাবে বেঁচে আছে, বেঁচে থাকে বা বেঁচে থাকতে হয়? বা এমন কি কোনো পথ আছে, যা অনুসরণ করে বেঁচে থাকলে সার্থকভাবে বেঁচে থাকা হবে? সার্থকভাবে বেঁচে থাকা বলতেই বা কী বোঝায়? বিভিন্ন মানুষের কাছে তার বোধ বিভিন্ন, আবার কারো নির্দিষ্ট কোনো বোধ না থাকতেও পারে। তবুও কিছু উপাদান কি আছে, যেগুলো এই অসংখ্য বোধ বা দর্শনের বেশিরভাগের মধ্যে উপস্থিত?

রাস্তায় বেরোলে কত মানুষের জীবনের টুকরো দেখা যায়। এক সেকেন্ড, পাঁচ সেকেন্ড বা দশ মিনিটের নামহীন সিনেমার জন্ম হয়ে মিলিয়ে যায়। ইচ্ছে করে পুরো সিনেমাটা দেখতে, তার আলো-অন্ধকার, সঙ্গীত, সংলাপ ও প্রত্যেকটি কাটের মুখোমুখি বসতে। তার উপায় হয়তো নেই। কারণ, মানুষটি না চাইলে তা দেখা যাবে না এবং সিনেমাটিও সম্পূর্ণ নয়, ক্রমশ নির্মীয়মান। অগত্যা, দ্বারস্থ হতে হয় কল্পনার কাছে। অবচেতনের দেয়ালে কিছু ফ্রেম ঝোলানো আছে, কিছু ভেসে আছে কলার ভেলায় চিন্তাস্রোতে, কিছু উড়ছে মনের আকাশে। আসুন ওদের পেড়ে ধুলো পরিষ্কার করি, শুকনো কাপড় দিয়ে গা থেকে জল মুছি, লাটাইয়ের সুতো গুটিয়ে নিচে নামিয়ে আনি।

সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত্রি নেমে এসেছে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে পূর্ণিমার চাঁদ। গোয়াল দেখে এসে পিঁড়ের ঝাঁপটা ফেলে দিল সুজাতা। হারিকেনটা কমিয়ে রেখে ঘরে শুলো, পাশের ঘরে আছে শ্বশুর শাশুড়ি। মাথার কাছে দক্ষিণমুখো জানালা দিয়ে চপল বাতাস অবিরত ওকে ছুঁয়ে পালাচ্ছে। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর রাতটুকু বিশ্রামের সময় পায়। তখন মনে পড়ে ওর স্বামী তপনের কথা। চার মাস হল চেন্নাই গেছে রাজমিস্ত্রির কাজে, মাইনে বেশি ওখানে। মাতলা নদীর পাড়ে ওদের গ্রাম, নদী পেরোলেই ঘন ম্যানগ্রোভ অরণ্য। প্রাণ হাতে করে খাঁড়িতে মাছ ধরে কোনোরকমে চলছিলো, তার উপরে ঝড় এলে সব শেষ। বাধ্য হয়ে যেতে হল ভিনরাজ্যে। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমে তলিয়ে যায় সুজাতা বুঝতে পারে না। কাল আবার ভোরে উঠে ঝাঁট দিয়ে, উঠোন নিকিয়ে রান্না বসাবে। ওর মধ্যে গোরু বার করে গোয়াল পরিস্কার করবে। রান্নার শেষে জামবাটিতে ভাত তরকারি নিয়ে গামছা দিয়ে বেঁধে নেয়। তা করতেই পাড়ার বৌরা হাঁক পাড়তে থাকে। চট করে আঁকশি আর জালটা নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে। সারাদিন মীন, কাঁকড়া ধরবে ওরা নদীতে। বিকেল হয়ে এলে সব আড়তে বিক্রি করে ঘরে ফিরবে। মাতলার মতো সুজাতার জীবনও বহমান। কোনো পরিস্থিতিই তার স্রোতকে রোধ করতে পারে না।

দ্বন্দ্ব মানুষের বেঁচে থাকার নিত্য সঙ্গী। এই দ্বন্দ্ব বাইরের সঙ্গে অন্তরের আবার অন্তরের সঙ্গে অন্তরেরও হতে পারে। মনে করে দেখুন জীবনের কোনো না কোনো সময়ে আপনি সম্মুখীন হয়েছেন বা হবেন এই দ্বন্দ্বের। "To be or not to be" দোলাচলে থাকা এবং সময়ের সাথে বৈপরীত্যের হাত ধরে এগোতে পারলে বোধহয় পূর্ণতার দিকে পৌঁছানো যায়। রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখায় একই ধারণা প্রতিফলিত হয়। "তোমার হল শুরু, আমার হল সারা", " না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, তেয়াগিলে আসে হাতে", " আমি বহু বাসনায় প্রানপনে চাই, বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে", একটি গানের প্রথম লাইনে লিখছেন," যখন এসেছিলে অন্ধকারে চাঁদ ওঠেনি সিন্ধুপারে" শেষে, "তুমি গেলে যখন একলা চলে চাঁদ উঠেছে রাতের কোলে।" "রাজা " নাটকে সুরঙ্গমা রানী সুদর্শনাকে বলে, "তুমি দেখবে দেখবে করে যে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে রয়েছ সেইজন্যে

কেবল দেখবার দিকেই তোমার সমস্ত মন পড়ে রয়েছে। সেইটে যখন ছেড়ে দেবে তখন সব আপনি সহজ হয়ে যাবে।" লক্ষ্য করুন রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ বিপরীত দুই মেরুকে পাশাপাশি রাখছেন এবং সেখান থেকে নতুন মাত্রা সৃষ্টি হচ্ছে, যা পূর্ণতার পথের দিশারী। একই অনুষঙ্গ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় উঠে আসে, "ভালোবাসা পেলে সব লন্ডভন্ড করে চলে যাবো যেদিকে দুচোখ যায়।" হারুকি মুরাকামি "Kafka on the Shore" উপন্যাসে লিখেছেন "Memories warm you up from the inside. But they also tear you apart."

কেবল সাহিত্যেই নয়, গণিতেও পাই একই সুরমূর্ছনা। গণিতের একটি শাখা সম্ভাবনা তত্ত্বে (Probability Theory) বলা হয় একটি ঘটনা (Event) ঘটার সম্ভাবনাযুক্ত ঘটনাটি না ঘটার সম্ভাবনা সর্বদা এক। মনে রাখতে হবে গণিতে ঘটনার (Event) সংজ্ঞা আলাদা, সেটা যেকোনো কিছু ঘটে চলা বোঝায় না। গণিতের ভাষায় P(A) + P(A') = 1, যেখানে A একটি ঘটনা (Event), A'(Complement of Event A) বোঝায় ঘটনাটি ঘটবে না, P(A) হল A ঘটার সম্ভাবনা, একই মানে P(A') ক্ষেত্রেও। এখানেও আমরা সেতুবন্ধন করছি দুই বিপরীত জিনিসের। বৃষ্টি হোক বা না হোক, চাষীরা ফসলের দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করুক বা না করুক, আপনার সর্বাধুনিক মডেলের মোবাইল ফোনটি কেনা হোক বা না হোক, আরো একটা বনভূমি ধ্বংস হোক বা না হোক, আমি এই লেখা শেষ করতে পারি বা না পারি, সূর্য ওঠে, সূর্য ডুবে যায়, গাছে বকুল ফুল ফোটে, মানুষ হিংসা করে, মানুষ প্রেমে পড়ে, আবর্তিত হয়ে চলে আবহমান কালের বৈপরীত্যের চক্র।

রক্তিম - হ্যালো, কেমন আছো মা ?
মা - ভালো আছি। তুই কেমন আছিস ?
রক্তিম - ভালো। বাবা কী করছে ?
মা - বাবা প্রসাদ, মুড়ি খেয়ে বসে আছে, এবার ওষুধ দোবো। মঙ্গলবার না আজকে খুব ঝামেলা, সকালে বাজারে গিয়ে দুটো পুজোর কলা, পাঁচশো পটল, আড়াইশো ভেন্ডি, পঞ্চাশ কাঁচালঙ্কা নিয়ে এলাম। ঘরে সবজি কিছুই ছিল না। আর গোবরার দোকানে দুশো সাদা দই নিলাম। দুপুরে চিঁড়ে দিয়ে একটু খাবো, আর তোর বাবা একটু খাবে। তারপরে বাবাকে উঠিয়ে বাথরুম করিয়ে, চা খাইয়ে তবে তো চান

করতে পেলাম। তাড়াতাড়ি করে পুজোর জোগাড় করে ঠাকুরতলায় দিয়ে এলাম, জানিস তো বামুন কত সকালে চলে আসে। এই তো পুজো হল, রান্না বসিয়েছি, খেতে পাইনি এখনো। পুজো আচ্চা হলেই খুব ভিচিকিচি হয়। বসো, বসো, বাইরে যেয়ো না, ওষুধটা খেয়ে নাও। দেখছিস বাইরে চলে যাচ্ছিলো। দিয়ে কী করছিস ?

রক্তিম - এই কলেজ যাচ্ছি।

মা - টিফিন খেলি ?

রক্তিম - হ্যাঁ, আলুর পরোটা করেছিল।

মা - ভালো করেছিল ?

রক্তিম - হ্যাঁ , ওই আর কি যেমন করে প্রতিদিন। বাবার সকালের লাল কালো ক্যাপসুলটা কটা আছে বলোতো ?

মা- দাঁড়া দেখি। সাতটা আছে। বাড়ি কবে আসবি ? ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যেতে হত।

রক্তিম - তাহলে এক সপ্তাহ পরে চলে যাবো। কাজের চাপ রয়েছে, এই সপ্তাহের শেষে যাবো ভাবছি।

মা - বেশ, কলেজ যাও। বাবাকে ওষুধ দি। রাখ বুঝলি।

রক্তিম - ঠিক আছে, রাখলাম।

ফোন কেটে রক্তিম হাঁটতে থাকে। কদম গাছের ছায়া পেরিয়ে ডিপার্টমেন্টের রাস্তা। দু বছর হল রক্তিমের বাবা Severe Depression ও Catatonia নামে দুটি রোগে আক্রান্ত। চুপচাপ শুয়ে থাকে, কথা বলে না কারোর সাথে। রক্তিম বাড়ি গেলেও কথা বলে না, বড় বড় চোখে চেয়ে থাকে। চোখে যেন কীসের শূন্যতা খেলে বেড়ায়। লিফ্ট থেকে নেমে ল্যাবের দরজা খোলে। মাথা থেকে সমস্ত কিছু সরিয়ে ওকে বসতে হবে রিসার্চের কাজে, সাদা কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে।

দ্বিতীয় বিষয় যেটা আমার মনে হয় বেশিরভাগ মানুষের বেঁচে থাকার সঙ্গী তা ঈশ্বরচেতনা। কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন ও নিয়ম মেনে উপাসনা করেন। কেউ হয়তো বিশ্বাস করেন কিন্তু নিয়ম মেনে তাঁর উপাসনা করেন না। কেউ হয়তো বিশ্বাসই করেন না আবার কেউ হয়ত এখনো নিশ্চত নন তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে, খুঁজে চলেছেন। ঈশ্বরকে বলা হয় অজর, অমর, অক্ষয় এবং অবাঙমানসগোচর। তাহলে কেমনভাবে তাঁর চেতনা মনে ধারণ করবো? বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলে মহাশূন্যে ভগবানের ভীষণ একা লাগছিল, তিনি দ্বিতীয়কে পেতে ইচ্ছা করলেন। নিজেকেই আস্বাদন করার জন্য নিজেকে

বিভক্ত করে নারী ও পুরুষের সৃষ্টি করলেন। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার মূল তত্ত্ব এটাই, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন । জগৎ-সংসারে তিনিই বেঁধেছেন মায়ার বাঁধনে,

কর্মক্ষেত্রে জীবমাত্রে মায়াসূত্রে সবাই গাঁথা
কেহ পুত্র, কেহ মিত্র, কেহ ভার্যা, কেহ ভ্রাতা
কেউ সেজে এসেছেন পিতা
কেহ স্নেহময়ী মাতা
কত রঙের অভিনেতা
আছেন কত সাজে সেজে
আবার তিনিই খেলার সাথী করে প্রতি মুহূর্তে রচনা করে চলেছেন নতুন লীলার,
তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে
তব আমার হৃদয় লাগি
ফিরছ কত মনোহরণ-বেশে
প্রভু, নিত্য আছ জাগি।
বাসনার অন্তরালে, অজ্ঞানতার অন্ধকারে তাঁর উপস্থিতি টের পাওয়া যায় না, কিন্তু তিনি হয়তো আছেন আমারই পাশে ; বেদনা, আনন্দ, অপমান, প্রশংসা, প্রত্যাখ্যান দিয়ে গড়ে পিঠে নিচ্ছেন আমাদের জীবন, তাঁর সাথে মিলনের যোগ্য করে । রজনীকান্তের ভাষায়,
আমি ভাবি ছেড়ে গেছ
ফিরে চেয়ে দেখি
এক পা-ও ছেড়ে যাওনি।

বালি ব্রিজ পেরিয়ে বাঁদিকের রাস্তায় বাইকটা ঘোরালো অমূল্য। মনে পড়ল শ্রীপর্ণা মিষ্টি নিয়ে আসতে বলেছিলো মেয়ের জন্য। মিষ্টির দোকান থেকে বেরিয়ে বাইকে চাপতে যাবে, এমন সময় ফুটপাথ দিয়ে মাঝবয়স্কা এক মহিলা পেরিয়ে গেলেন। তার কাপড় ছেঁড়াখোঁড়া, চুল জটপাকানো, সারা গায়ে নোংরা মাখা আর কাঁধ থেকে বিশাল এক বস্তা মাটিতে লোটাতে লোটাতে যাচ্ছে, যেখানে ময়লা আবর্জনা দেখছে, তার মধ্যে হাতড়ে কী যেন খুঁজছেন , একটা দুটো জিনিস বস্তায় পুরে আবার হাঁটছেন। অমূল্য ফলো করতে থাকে তাকে। হাঁটতে হাঁটতে ফুটপাথের উপরে মোটামুটি পরিষ্কার জায়গা দেখে বস্তা নামিয়ে শুয়ে পড়লেন। চারিপাশে কী ঘটে যাচ্ছে তার দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। ওনার উপর দিয়েই প্রায় লোকজন হেঁটে যাচ্ছে, তবুও উনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে গেলেন। অমূল্য সল্টলেকের এক আইটি কোম্পানিতে চাকরি করে। বেতন ভালোই, স্ত্রী স্কুলশিক্ষিকা। তাদের পাঁচ বছরের মেয়ে আছে। আত্মীয় পরিজন সমেত ভরা

সংসার। অতি প্রাচুর্য্যের মধ্যে থেকেও কি সে এত শান্তিতে ঘুমোতে পারে? ভাবতে ভাবতে বাড়ির দিকে গাড়ি ঘোরায় অমূল্য।

নদীর অনেক পথ অতিক্রম করে সাগরে মিলিত হওয়া যেমন সত্য, বেঁচে থাকার অবধারিত সত্য মৃত্যু। মানুষ টাকার পাহাড়ে বসে থাকুক বা হিমালয়ের নির্জন গুহায় সাধনায় মগ্ন থাকুক, যেভাবে খুশি জীবন কাটাক, শিয়রে মৃত্যু এসে দাঁড়ালে এক লহমায় সব ছেড়ে চলে যেতে হয়। তারপর কী হয়? যিনি চলে গেলেন তার স্বপ্ন, আশা, না-বলা কথা, ভাবনারা কোথায় যায়? মহাবিশ্বের কোথাও কি আশ্রয় পায় তারা? আপাতভাবে মৃত্যু নিয়ে আসে শোক, দুঃখ। কিন্তু গীতায় আছে,
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।
অর্থাৎ মানুষ যেমন পুরানো পোশাক ছেড়ে নতুন পোশাক পরে, আত্মাও এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর গ্রহণ করে। এ তো নতুনের সূচনা। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুকে দেখেছেন অমৃতলোকে যাত্রা হিসেবে, "মরণরে তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।" অন্যদিকে জীবনানন্দ মৃত্যুকে ভাবছেন আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে। তার ডায়েরিতে পাওয়া যায় আত্মহত্যা করার বিভিন্ন উপায়ের কথা এবং কোন উপায়ে আত্মহত্যা সবচেয়ে কম কষ্টদায়ক হবে তার বিশ্লেষণ। তবে কি সেই "বোধ ", যাকে তিনি এড়াতে পারেন না বা "বিপন্ন বিস্ময়", যা রক্তের ভিতরে খেলা করে, জীবনানন্দের মৃত্যুভাবনার (আত্মহত্যা বিষয়ে ভাবনার) সম্ভাব্য সূত্রাবলী "আট বছর আগের একদিন" কবিতায় কিছুটা আভাস মেলে,

"জানি–তবু জানি
নারীর হৃদয়– প্রেম– শিশু– গৃহ– নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়–
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত– ক্লান্ত করে;
লাশকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই;
তাই
লাশকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।"

হঠাৎ করে জীবনের অজানা আঁকে বাঁকে মৃত্যু একঝলক দেখা দিয়ে পালিয়ে যায় প্রিয়জনদের নিয়ে। এই লুকোচুরি খেলতে খেলতে বেঁচে থাকা, অপেক্ষা করা, কবে সে সন্তর্পনে দাঁড়াবে চোখে চোখ রেখে।

ভাদ্র মাসে ব্যস্ততা বেড়ে যায় মধুমিস্ত্রির। সারাবছর টুকটাক কাঠের কাজ করে এবং নিজের জমিতে চাষ করে। এইসময় দুর্গাঠাকুর গড়ে। নিজের গ্রাম ও আশেপাশের গ্রাম মিলিয়ে সাতটা ঠাকুর। তার মধ্যে একটা হরগৌরী, একটা তিনপুতুলের (দূর্গা, সিংহ ও অসুর) বাকিগুলো সাত পুতুলের। প্রথমে পাড়ার ঠাকুর হরগৌরী দিয়ে শুরু করে, খড় দিয়ে কাঠামো তৈরি করে, একমাটি হয়, তারপর অন্য ঠাকুরগুলোর একমাটি করে এসে মুখ তৈরি করে ছাঁচ দিয়ে। দুর্গার জন্যে বড়ো ছাঁচ, লক্ষী, সরস্বতীর জন্যে ছোট। সেগুলো শুকোলে পরিষ্কার করে যত্ন করে। তারপর মূর্তিতে মুখ বসিয়ে দুমাটি হয়, হাতের আঙ্গুল বসায়। এইসময় মধু হয়ে ওঠে অন্য মানুষ, প্রকৃত শিল্পী। বাচ্ছা ছেলে, বুড়ো, মহিলা সবাই দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে যায় তার হাতের কাজ। দুমাটি শুকোলে খড়ি দেয়, রং করে ও দেবীর টানাটানা চোখ আঁকে। অবশেষে ঠাকুরকে কাপড়, গয়না, চুল পরিয়ে সাজিয়ে ছুটি পায়। আবার মধুমিস্ত্রি ফিরে যায় সাধারণ মানুষের জীবনে।

মানুষের বেঁচে থাকার উপাদান অগুন্তি, তাদের তালিকা করতে বসা দুরূহ কাজ। এবার ইতি টানা যাক। আর এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মনে হয় প্রেম। জীবনে প্রেম আসেনি বা প্রেম করেননি, এরকম মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। প্রেম জীবনের অন্যতম চালিকাশক্তি। প্রেমের জন্য মানুষ যে কোনো অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের "একবার তুমি" কবিতায় ,

"একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো –
দেখবে, নদীর ভিতরে, মাছের বুক থেকে
পাথর ঝরে পড়ছে
পাথর পাথর পাথর আর নদী-সমুদ্রের জল
নীল পাথর লাল হচ্ছে, লাল পাথর নীল
একবার তুমি ভালোবাসতে চেষ্টা করো।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।" কে কখন কীভাবে কার সাথে এই ফাঁদে ধরা পড়বে কেউ জানে না। প্রেম

মানে না কোনো সামাজিক , রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা লিঙ্গ পরিচয়। বাঁধাহীনভাবে কোন গলিপথ দিয়ে এসে প্রেম হৃদয়ে জোয়ার সৃষ্টি করেছে, বোঝার আগেই সব দুয়ার খুলে প্রবল বেগে জল ঢুকে পড়ে ঘরে ঘরে, গৃহস্থালির সমস্ত কিছু ভেসে যায়, তখন কিছু আটকানোর ক্ষমতা থাকে না, শুধুই স্রোতে ভাসতে ভাসতে আরো অতল জলে তলিয়ে যেতে চায় মন। অগাধ জলে কূল না পেলে আশ্রয় দেয় বিরহের নৌকা। বিরহের অনেক রূপ, কখনো ভয়ঙ্কর, কখনো সুন্দর এবং এই রূপের নেশা সাংঘাতিক। গালিবের জবানিতে,

"ইয়ে ইশ্‌ক নহি আসান, ইতনা তো সমঝ লিজিয়ে
এক আগ কা দরিয়া হ্যায়, অর ডুব কে যানা হ্যায়।"

হয়ত তাই সচেতন করা হয়,

"ওরে ,পিরিতি কাঁঠালের আঠা
সেই আঠা লাগলে পরে ছাড়বে না
গোলেমালে গোলেমালে পিরিত কইরো না।"

আমাদের বেঁচে থাকা কোনো স্বপ্ন নয়ত? অথবা আমরা কোনো উপন্যাসের চরিত্র নই তো, আড়াল থেকে হয়ত লেখক কালির আঁচড়ে জীবনের গতিপথ নির্দেশ করছেন? রাত বাড়ে, কৃষ্ণদাদ্বশীর চাঁদ মেঘের কোলে ঢলে পড়ে, রজনীগন্ধার সুগন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যায়, লক্ষীপেঁচা ডেকে ওঠে শিমুলের ডালে, গাজার একটি হাসপাতালে বোমা বর্ষিত হয়েছে, অসহায় মানুষের চিৎকার, কান্না অস্থির করে তুলছে, দ্রুত পায়চারি করছি ঘরের মধ্যে, গায়ে ছিটিয়ে পড়ছে টাটকা গরম রক্ত, বারবার হাত ধুয়েও উঠছে না রক্তের দাগ, আমিও যে দোষী; শিশু মাকে জড়িয়ে ধরে, রতিক্লান্ত নরনারী ঘুমে আচ্ছন্ন, কোলাহল শান্ত হয়ে আসে, হৃদস্পন্দনের শব্দ শুনি, নিজের সামনে দাঁড়াই, প্রশ্ন করি, উত্তর মেলে না। জল খেয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করি, শেয়াল কুকুরেরা শিকারে বেরিয়েছে, জিভ থেকে গড়িয়ে পড়ছে লালসার লালা, দূরে তাদের উল্লাস ধ্বনি শোনা যায়, টেবিলে সারি সারি সাজানো বইগুলো অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে, ফিস ফিস করে নিজেদের মধ্যে কীসব বলাবলি করছে, ওদের ভাষা বুঝতে পারি না, তন্দ্রা নেমে আসে চোখের পাতায়। ঘুমের মধ্যে এসে পড়েছি কোনো এক স্বপ্নের দেশে। কাল হয়তো অন্য স্বপ্ন আসবে, অন্য রঙে রাঙানো। এই হয়তো জীবন, ছুটে চলা স্বপ্ন থেকে স্বপ্নান্তরে।

অনন্ত আলোকমালা

নীলাদ্রিশেখর দাশ, এল.আর.ইউ

(১)

আলো চাই আলো - পরিপূর্ণ আলো
অনন্ত আলোকমালা জন্ম থেকে জরা!
ছিন্ন হোক অমানিশা দীপ্ত হোক ধরা
পূর্ণ হোক অভিপ্রায় বিশ্বাসে ধারালো!

(২)

সময় তো জীবনের সেরা বাজিগর
একদিন আলগোছে মুছে দিয়ে সব
আবার সাজিয়ে দেবে নতুন বৈভব।
নিঝুম চারণভূমি হবে আবার মুখর!

(৩)

আগুন জ্বেলেছি বটে নেভাতে পারিনি।
সে আগুনে পুড়ে গেল স্বপ্ন ও স্মৃতি!
দুর্নিবার অগ্নিস্রোতে বিপথগামিনী
ক্ষণস্থায়ী পরমায়ু পোশাকী সংস্কৃতি!

(৪)

সবটা নিজের হাতে রাখা ঠিক নয়
কিছুটা বিলিয়ে দাও ভাগ্যের হাতে।
চেনা দিনরাত -- তবু অচেনা সময়
কখন যে বেঁকে বসে কোন অজুহাতে!

(৫)

পঞ্চাশে এসে দেখছি ধুধু পথ-ঘাট
শুনশান পড়ে আছে অনাবাদী মাঠ

কুয়াশায় ঢেকে গেছে দিকচক্রবাল
ভুল পথে হেঁটে গেছি আজীবনকাল!
(৬)
একটা তটিনি চাই যে আমাকে চেনে
ভুল স্রোত থেকে যে টেনে নেবে কাছে!
একটা রজনী চাই লগ্ন তিথি মেনে
মুক্তি দেবার মতোঅন্ধকার আছে!
(৭)
যে যার নিজের মত নিজস্ব জগতে
জীর্ণ ঘর ছিন্ন তার শীর্ণ সহবাস!
চেনা মুখ জলছবি স্মৃতির পরতে
বিষমাখা ধুলিঝড়ে মলিন আকাশ!
(৮)
আমাকে সঙ্গে নিও পরিযায়ী মেঘ
আমিও তোমার মতো বিজনবিহারী।
তোমার মতই তাজা আমার আবেগ
আমিও তোমার মত প্রাণ দিতে পারি!
(৯)
কেঁদো না কমলকলি বোঝই তো সব
মৌমাছি কেড়ে নেয় সমস্ত বৈভব!
রোদভেজা দিনে হোক চাঁদধোয়া রাতে
কিছুই থাকে না পড়ে এই সাক্ষাতে!
(১০)
স্বপ্ন আছে আমিও তাই জীবনরসে ভারি
সুখের শীত দুঃখের আগুন সব সইতে পারি।
স্বপ্ন আমায় বাঁচিয়ে রাখে স্বপ্নে উজ্জীবিত

স্বপ্ন যেদিন হারিয়ে যাবে সেদিন আমি মৃত!

(১১)

যে কথা বলতে গিয়ে বলতে পারিনি
পাছে তুমি ভিন্ন এক মানে করে ফেলো!
মাঝে মাঝে হতে হয় গোপনচারিণী
সামনে হাজির হলে সব কিছু গেল!

(১২)

কাকে যে কখন কেন ভালো লেগে যায়
তার কোনো ব্যাখ্যা নেই যুক্তির বিচারে।
মন জানে কাকে ডাকে কোন ইশারায়
বুক পেতে ধরে রাখে খাদের কিনারে।

(১৩)

ধন্য বটে অভিমান ধন্য অভিমানী
ভালোবাসা নয় যেন সব রাহাজানি।
জোর করে কেড়ে নেয় সব মনোযোগ
অনুরাগে মুছে যায় সব অভিযোগ।

(১৪)

যে কথা শুনবো বলে কান পেতে থাকি
তাই আজ এত দিন থেকে গেছে বাকি!
আজ হঠাৎ প্রাণ খুলে বলে দিলে সব
মরা প্রাণে লেগে গেল আলো উৎসব।

(১৫)

অসংখ্য অলিগলি লেন বাইলেন
পার হয়ে অবশেষে বনলতা সেন!
এলাম তোমার কাছে শান্তি পাব বলে
এসে দেখি তুমি আজ বিপাশার দলে!

(১৬)

জতুগৃহে বাস করে অর্ধেক জীবন
জেনেছি আগুনে পুড়ে শুদ্ধ হওয়া যায়।
আগুনের উষ্ণতা মৃত সঞ্জীবন
মৃতকে বাঁচিয়ে তোলে এক লহমায়।

(১৭)

এখনও বিকেল হলে বুকের ভেতর
ধীরে ধীরে জেগে ওঠে শান্তিপুরী চর।
সন্ধ্যার আলো মেখে সারস সারসী
ফাঁকা চরে হয়ে যায় রমণবিলাসী।

(১৮)

বড় বিষণ্ন করে বিকেলের কনে-দেখা আলো
সাজানো স্মৃতির ঘরে পড়ে থাকে অগোছালো
বাসি মুখ ভেজা চোখ রাতজাগা ব্যথার কাহিনী।
বড়ো একা হয়ে যাই - মনে হয় কিছুই রাখিনি।

(১৯)

এক মুঠো রোদ সাকি তোমার বাগানে
সাজিয়ে রেখেছি আমি। একটাই আশা
অন্ধকার নামে যদি আমার খাদানে
আলো দিয়ে মুছে দিও আমার হতাশা।

(২০)

এভাবেই এক দিন কুয়াশার দিকে
আমিও এগিয়ে যাব সব স্মৃতি ফেলে।
বর্তমান হয়ে যাবে ঝাপসা ও ফিকে
পর্ণমোচী অবকাশে সন্ধ্যাদীপ জ্বেলে।

(২১)

অগ্নিকে মিছিমিছি ভয় পাও সাকি
অগ্নি না পোড়ালে কিছু শুদ্ধ হয় নাকি!
অগ্নি জ্বলে অনির্বাণ অন্তরে বাহিরে
দেহে মনে রূপে জ্ঞানে বিশ্ব চরাচরে!

(২২)

সময়ের কামড় সাকি কেউটের বিষ
জন্মচক্রে শীত-গ্রীষ্ম ঘোরে অহর্নিশ।
এখুনি বিবশ করে শীতের ছোবল
পরক্ষণেই ধমনীতে সুতীব্র গরল।

(২৩)

শীত এলে বোঝা যায় কার কত তেজ
কার ধাতে কত সয় শীতের আমেজ।
কার কাছে পরকীয়া কার কাছে যম
কার চাই বালাপোশ কার লাগে ওম।

(২৪)

এক একটা দিন যায় ধুলোকালি মেখে
বুকের নদীতে বাজে শূন্য হাহাকার।
ফেরাতে পারি না যা পিছু থেকে ডেকে
চিরতরে চলে যাবে যা কিছু যাবার।

(২৫)

জানতে চেও না তুমি কখন কীভাবে
পুরোপুরি তৃপ্ত হবে তোমার হৃদয়।
তৃপ্তির খোলা হাওয়া শরীরে ছড়াবে
যেভাবে বৃষ্টি পেয়ে ভূমি তৃপ্ত হয়।

****

भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रो. प्रशांत चंद्र महालनोबिस एवं समाज के प्रति उनके अवदान

प्रशांत तिवारी, राजभाषा कक्ष

प्रो. प्रशांत चंद्र महालनोबिस वैश्विक स्तर के एक सांगठनिक सांख्यिकी विद्वान थे। उन्हें भारतीय सांख्यिकी के जनक के रुप में भी जाना जाता है। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के निर्माता, भारतीय सांख्यिकी प्रणालियों के संगठनकर्त्ता, सांख्यिकी तकनीकियों के व्यवहारिक समस्याओं के क्षेत्र में अनुप्रयोग के एक अग्रणी वैज्ञानिक, भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार के रुप में एवं ऐसे अनेक अकादमिक पक्ष में उनके प्रभावशाली अनुदान हैं।

प्रो. प्रशांत चंद्र महालनोबिस के वैज्ञानिक कार्यों का उचित मूल्यांकन करना आसान नहीं है, साथ ही उनके अवदानों में वैयक्तिक एवं यहां तक कि विशिष्ट गुणों का भरमार है। वे सांख्यिकी को प्रायिकता के गणितीय सिद्धांत अथवा अनुप्रयोग अनुसंधान में डेटा को नेमी विश्लेषण अथवा प्रशासनिक निर्णयों के प्रति एक सहायक यंत्र के तौर पर तथ्यों के संग्रहण तक सीमित महज एक विषय के रुप में नहीं देखते थे। वास्तव में, उन्होंने सांख्यिकी के इन सभी पहलुओं में से प्रत्येक में विशिष्ट अवदान किया है। परंतु उन्होंने सांख्यिकी को मानवीय प्रयासों के विस्तृत फलक पर दक्षता में अभिवृद्धि हेतु एक नई प्रौद्योगिकी के रुप में देखने का एक प्रस्तर दृष्टिकोण लिया है।

प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म दिनांक 29 जून 1893 को 210 कार्नवलिस स्ट्रीट स्थित मकान में हुआ था। वे प्रबोध चंद्र महालनोबिस एवं निरोदबासिनी देवी के दो पुत्रों एवं चार पुत्रियों में से ज्येष्ठ पुत्र थे। पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं बंगाल के बुद्धिजीवियों तथा समाज सुधारकों के साथ अपने सम्पर्क ने उनके लिए सक्रिय जीवन का एक खाका तैयार किया था, जिसपर अगले सत्तर वर्षों तक उन्हें अग्रसर होना था। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा ब्रह्मो ब्वाइज स्कूल में हुई थी, जहां से उन्होंने वर्ष 1908 में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने वर्ष 1910 में विज्ञान में इंटरमिडिएट परीक्षा तथा वर्ष 1912 में भौतिकी में सम्मन सहित विज्ञान में बी एससी परीक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज से उत्तीर्ण किया था। उन्होंने वर्ष 1914 में गणित ट्रिपॉस भाग-1 तथा वर्ष 1915 में भौतिकी ट्रिपॉस भाग-2 किंग्स कॉलेज, कैम्ब्रीज से प्राप्त किया। जब वे इंग्लैंड

से विदा होकर भारत आने की तैयारी कर रहे थे, उनके शिक्षक डबल्यू एच मैकाले ने उन्हें 'बायोमेट्रिका' पढ़ने की सलाह दी। बायोमेट्रिका में प्रकशित कुछ पत्रों में महालनोबिस की दिलचस्पी बढ़ी। इस अभिरुचि ने उनके बाद के सांख्यिकी अनुसंधान में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पी. सी. महालनोबिस वर्ष 1915 में भारत आए तथा प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी के प्रोफेसर के रुप में कार्यभार ग्रहण किया। वर्ष 1922 में वे भौतिकी के सहायक प्रोफेसर बने तथा उन्होंने तैंतीस वर्षों तक (1915-1948) भौतिकी का अध्यापन किया। वे कुछ वर्षों तक प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रचार्य के रुप में भी कार्य किया। उन्होंने वर्ष 1922 से 1926 तक कलकत्ता के अलीपुर वेधशाला में मौसमविज्ञानी का पद-धारण भी किया। वर्ष 1921 से वर्ष 1931 तक वे विश्वभारती के संयुक्त सचिव थे। प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने निर्मल कुमारी के साथ विवाह किया, जो ब्रह्मोसमाज के प्यूरिटनवादी नेता तथा बंगाल के शिक्षाशास्त्री हेरम्बा चंद्र मोइत्रा की पुत्री थी।

जब प्रशांत चंद्र प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिकी के प्रोफेसर थे, वे सांख्यिकी के कार्य में अत्यधिक संलग्न थे। महालनोबिस ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज के बेकर प्रयोगशाला में 1920 दशक के आरम्भिक वर्षों में सांख्यिकी प्रयोगशाला की स्थापना की। आरम्भिक चरण में उनके अनुसंधान कार्य मानवमिति, मौसमविज्ञान तथा उत्तर बंगाल एवं उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण की समस्याओं में निहित था।

प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने अपने परामर्शदाता आचार्य ब्रजेंद्रनाथ सील (कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर) द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार डेटा के सांख्यिकीय विश्लेषण पर कार्य आरम्भ किया। अपने परामर्शदाता के मार्गदर्शन में प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों पर सांख्यिकीय डेटा विश्लेषण किया, यह भारत में सांख्यिकी पर हुए कार्यों में प्रथम था।

नागपुर में वर्ष 1920 में आयोजित भारतीय विज्ञान काँग्रेस संगठन की वार्षिक बैठक के दौरान महालनोबिस भारत के जैववैज्ञानिक एवं नृवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निदेशक, नेल्शन अन्नांडेल से मिले। उन्होंने मानव शरीर आयाम पर कार्ल पियर्सन के कार्य पर विचार विमर्श किया तथा अन्नांडेल ने पीसीएम को सूचित किया कि उन्होंने कलकत्ता के आंगल-भारतीयों पर मानव-विज्ञानी मापों से सम्बंधित डेटा बहुतायत में संग्रहित एवं धारित किया है। साथ ही पी. सी. एम. से उन संग्रहित डेटा पर कार्य करने के लिए अनुरोध किया। महालनोबिस ने

मानव-कद पर डेटा का विश्लेषण किया, जो कि सांख्यिकी में उनके प्रथम अनुसंधान पत्र "कलकत्ता के आंगल-भारतीयों पर नृवैज्ञानिक अवलोकन, भाग-1पुरुष-कद यूआरटी का विश्लेषण" का आधार बना। इसका प्रकाशन वर्ष 1922 में इंडियन म्यूजियम के अभिलेखों में हुआ था। महालनोबिस ने अन्नांडेल द्वारा संग्रहित मानव-विज्ञानी मापों पर अपना कार्य जारी रखा। इस विश्लेषण के परिमाणों का एक संश्लेषण पी सी एम द्वारा वर्ष 1925 के भारतीय विज्ञान काँग्रेस नृविज्ञान विभाग के अपने अध्यक्षीय सम्भाषण में प्रस्तुत किया था। चूंकि प्रशांत चंद्र महालनोबिस के सम्भाषण का शीर्षक "बंगाल में प्रजाति सम्मिश्रण का विश्लेषण" था, अतः महालनोबिस का विश्लेषण विभिन्न प्रकार के नृवैज्ञानिक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के प्रति ध्यान-केंद्रित था। समूह समानताओं / विषमताओं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए मानवमिति संबंधी मापों पर आधारित जनसंख्या समूहों के बीच की दूरी की माप की आवश्यकता थी। वर्ष 1927 में मानवमिति डेटा पर कार्य करने के दौरान महालनोबिस ने पियर्सन के 'कोफिसिएंट ऑफ रेसियल लाइकनेस' (सीआरएल) की सांख्यिकीय कमियों को खोज निकाला। महालनोबिस ने अनुभव किया कि सीआरएल दो जनसंख्याओं से लिए गए नमूनों के बीच अपसरण की एक जांच थी, अपेक्षाकृत इसके कि अपसरण के वास्तविक परिमाण की एक माप होने की, क्योंकि सीआरएल का परिमाण नमूने के आकार पर आश्रित था। आंगल-भारतीयों पर इस अध्ययन में महालनोबिस ने अपसरण का एक वास्तविक परिमाण प्रस्तावित एवं प्रयुक्त किया जिसे उन्होंने 'जाति दूरी की प्रथम (अनंतिम) माप' "डी" कहा। बाद में इस खोज के माध्यम से महालनोबिस ने अनुभव किया कि मानवमिति सम्बंधित मापों के बीच सह-सम्बंधों को समूह घनिष्टताओं की मापों के लेखा में लिया जाना था। तब उन्होंने इस समस्या पर कार्य किया तथा इसका समाधान निकाला। वर्ष 1930 में उन्होंने अपना प्रारम्भिक अनुसंधान पत्र "समूह अपसरण की मापों एवं जांचों के विषय पर" प्रकाशित किया, जिसमें अपने विख्यात डी-2 सांख्यिकी को प्रस्तावित किया। इसी वर्ष, महालनोबिस का एक पत्र बायोमेट्रिका में प्रकाशित हुआ, जो कि "जीवितों पर मापों से जातिगत भिन्नताओं के विभेदीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सीआरएल का प्रथम अनुप्रयोग" था। इस पत्र में महालनोबिस ने जनसंख्याओं के बीच मानवमिति सम्बंधी अंतर-संबंधों का एक बहुत ही अभिनव ग्राफिकल प्रदर्शन प्रस्तुत किया, जिसमें दो अतिरिक्त

विचलनों, वास-स्थान की भौगोलिक अवस्थिति एवं पेशा, को कार्य पर लगाया गया था। स्पष्टतः, विचलनों के बेमेल एवं बहुल समुच्चय के आधार पर निर्मिर जनसंख्याओं के साहचर्य समूहों की अवधारणा ने उनके मस्तिष्क में आकार लेना प्रारम्भ कर दिया। वर्ष 1936 में, महालनोबिस ने सह-सम्बद्ध वैरिएट्स के लिए 'प्राकृतिक' सामान्यीकृत दूरी डी-2 प्रस्तावित किया। साथ ही साथ, पैरामीटरों के नमूना मूल्यों का उपयोग करते हुए इनके मानकीकृत प्रारुप (महालनोबिस,1936) प्रस्तावित किया। इन परिणामों ने एक केंद्रीय स्थान धारित किया है, तथा सांख्यिकी एवं डेटा विश्लेषण में एक मौलिक भूमिका का निर्वहन करता है। डी-2 सांख्यिकी अथवा महालनोबिस दूरी की निर्मित्ति, इनके गुणों की व्युत्पत्ति एवं इनके अनुप्रयोग निसंदेह महालनोबिस के सर्वोत्तम अनुदानों मे से हैं। यहां तक कि आज भी यह जनसंख्याओं के वर्गीकरण एवं समुहीकरण का एक प्रमुख टूल्स है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने 17 दिसम्बर 1931 को भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) की स्थापना सांख्यिकी में अग्रिम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए की। आईएसआई को बाद में 1950 के दशक के दौरान बरानगर, कोलकाता के एक उपनगर, पश्चिम बंगाल स्थित वर्त्तमान परिसर में स्थानांतरित किया गया। वर्ष 1933 में उन्होंने सांख्यिकी में अनुसंधान तथा अग्रिम अध्ययनों को प्रोत्साहित करने के लिए संख्या नामक एक जर्नल का प्रकाशन आरम्भ किया। एक महान संस्थान निर्माता से कहीं बढ़कर वे भारतीय सांख्यिकी आकाश के एक दैदिप्यमान नक्षत्र थे। उनके नेतृत्व में संस्थान द्वारा सांख्यिकी का प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के साथ अंतर्क्रिया की पहल एवं प्रोन्नति की गई।

उन्होंने न सिर्फ सांख्यिकी सिद्धांत के लिए अवदान किया वरण सांख्यिकीय सिद्धांतों को गर्मजोशी के साथ, बड़ी कठिनाइयों के बीच अनंतोगत्वा सफलता के साथ कार्योन्मुख भी किया। वृहत पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण की तकनीकियों पर ऐतिहासिक अन्वेषणों के साथ प्रशांत चंद्र महालनोबिस का नाम सदैव सहयोजित रहेगा।

उन्होंने वृहत स्तरीय नमूना सर्वेक्षण के संचालन हेतु अभिनव तकनीकियों को लागू किया तथा रैंडम सैम्पलिंग विधि का उपयोग करते हुए प्रति एकड़ एवं फसल उत्पादन की गणना की। कृषि जन्य फसलों के सर्वेक्षण पर क्रमिक कार्य का आरम्भ वर्ष 1937 में किया गया, जिसका परमोत्कर्ष वर्ष 1941 में जूट फसल के लिए प्रति एकड़ एवं फसल उत्पादन के वृहत नमूना सर्वेक्षण में हुआ। इसे पूरे बंगाल प्रांत में व्याप्त

किया गया था तथा वर्ष 1943 में बंगाल एवं बिहार दोनों के सभी मुख्य फसलों में विस्तारित किया गया था। इसके अनुसरण में सामाजिक-आर्थिक डेटा तथा लोक वरीयता आदि के संग्रहण हेतु नमूना सर्वेक्षण किया गया था। तकनीकियों के क्षेत्र में तीन उल्लेखनीय अवदानें, नामतः सर्वेक्षण की ऑप्टीमम डिजाइन की अवधारणा, पायलट सर्वेक्षण एवं उप-नमूनों का प्रतिपादन किए गए थे। वर्ष 1937 से 1950 के बीच बंगाल में कई सर्वेक्षण फसलों तथा सामाजिक-आर्थिक डेटा के संग्रहण हेतु किया गया, जिसके द्वारा नमूना सर्वेक्षण हेतु डिजाइन अभिवृद्धि का एक अवसर तथा क्षेत्र से डेटा संग्रहण में अनुभव भी प्राप्त हुए थे। प्रशासकों को आश्वस्त करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ताकि राष्ट्रीय आय सांख्यिकी में व्याप्त अंतराल को सैम्पलिंग से प्राप्त डेटा के माध्यम से पाटा जा सका, साथ ही आर्थिक विकास की प्रगति को मूल्यांकित करने तथा नीति निर्णयों को निर्धारित करने के लिए डेटा के सतत संग्रहण की आवश्यकता पड़ती। महालनोबिस को वर्ष 1944 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से वेल्डन स्मारक मेडल तथा पारितोषिक प्राप्त हुआ था। तथा उन्हें वर्ष 1945 में सांख्यिकी में विशेषकर वृहत स्तरीय नमूना सर्वेक्षण के क्षेत्र मे अवदानों के लिए लंदन के रॉयल सोसाइटी का फेलो चयनित किया गया था।

महालनोबिस ने संग्राम पर विजय प्राप्त किया तथा वर्ष 1950 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना हुई। यह एक सतत सर्वेक्षण प्रक्रिया थी जिसमें भारत भर में फैले एक पूर्णकालिक क्षेत्र संगठन की सहायता से वर्ष दर वर्ष सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं, और जो राष्ट्रीय अर्थतंत्र को प्रभावित करने वाले आर्थिक एवं सामाजिक कारकों का आवधिक आकलन उपलब्ध करवा सके।

वे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किए जाने तथा भारत में सांख्यिकी नियंत्रण प्रणाली प्रस्तावित किए जाने में प्रमुखता से संलग्न रहे। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1949 में महालनोबिस के तकनीकी मार्गदर्शन में तथा मंत्री परिषद के प्रति उनके द्वारा मानद सलाहकार के रुप में पदभार ग्रहण करते हुए उनके अधीन कार्य करने के लिए एक केंद्रीय सांख्यिकी युनिट की स्थापना की गई थी। साथ ही यह भी कि इस यूनिट ने दो वर्षों से अधिक की अवधि हेतु आईएसआई द्वारा पूर्णरुपेण कार्मिक प्रदत्त एवं संचालित होकर कार्य किया था। दो वर्षों के बाद में केंद्रीय सांख्यिकी संगठनों को सरकार की सभी सांख्यिकी गतिविधियों को समन्वित करने के लिए गठित किया गया था।

प्रशांत चंद्र महालनोबिस न सिर्फ विज्ञान के प्रति अपने मौलिक अवदानों में ही पड़े रहे, बल्कि उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधानों की प्रोन्नति तथा इन अनुसंधान परिणामों के सामाजिक कल्याण की समस्याओं में लाभदायक अनुप्रयोगों की दिशा में भी अवदान किया। भारत में गुणता नियंत्रण विधियों के इतिहास द्वारा इस थीम का एक बहुत सुंदर दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद से प्राप्त एक अनुदान की सहायता से वर्ष 1943 में तकनीशियनों के लिए औद्योगिकी सांख्यिकी एवं गुणता नियंत्रण में व्याख्यानमालाओं एवं व्यवहारिक कार्यों का एक पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया। वर्ष 1946 तक भारत में राष्ट्रीय मानकों का कोई संस्थान नहीं था तथा उद्योगों में ब्रिटिश मानकों की ही प्रयुक्ति प्रचलित थी। यह वर्ष 1947 था जब भारत सरकार ने भारतीय मानक संस्थान की स्थापना की, जिसने उद्योगों में गुणता नियंत्रण एवं मानकीकरण पर कार्य आरम्भ किया।

महालनोबिस देश में आंकड़ों के विशाल भंडार के साथ शीघ्रता से सटीक एवं जटिल गणनाओं को सम्पादित करने के उद्देश्य से मशीन-यांत्रिकी, विद्युतीय एवं इलेक्ट्रोनिकी की महत्ता की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति थे। वर्ष 1950 के दशक में प्रशांत चंद्र ने एनएसएस डेटा के प्रसंस्करण हेतु आईबीएम, हॉलेरिथ, पावर सम्स आदि के वृहत संख्या में इलेक्ट्रोमिकेनिकल डेटा प्रसंस्करण मशीनों की विविधतापूर्ण स्थापना की व्यवस्था की। उनकी पहल के द्वारा वर्ष 1953 में संस्थान द्वारा एक लघु एनालॉग कम्प्यूटर की डिजाइनिंग तथा निर्माण किया गया। वर्ष 1956 में, महालनोबिस ने ब्रिटिश निर्मित डिजिटल कम्प्यूटर, एचईसी-एम, हॉलेरिथ-इलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्यूटर के स्थापना की व्यवस्था की गई, जो कि भारत में कहीं भी अपने किस्म के प्रचालन का इस प्रकार की पहली स्थापना थी। वर्ष 1955 के दौरान, यूएसएसआर सरकार ने संस्थान को यूएनटीएए (यूनाइटेड नेशंस टेक्निकल ऐड एडमिनिस्ट्रेशन) के माध्यम से यूआरएएल नामक एक बड़ा एलेक्ट्रोनिक डिजिटल कम्प्यूटर प्रस्तावित किया था।

यूआरएएल कम्प्यूटर मार्च 1958 में प्राप्त हुआ था तथा इसे 20 दिसम्बर 1958 को संस्थान में सांख्यिकी डेटा का सोवियत इंजीनियरों द्वारा प्रसंस्करण करने के लिए स्थापित किया गया था, जिन्होंने इसे संस्थान को उपयोग हेतु फरवरी 1959 को सौंपा। वर्ष 1959-60 तक भारतीय सांख्यिकी संस्थान सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए देश भर के लिए एक कम्प्यूटर

केंद्र बन गया था। इसने रक्षा मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा आयोग, टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान एवं मौसम विज्ञान विभाग आदि सदृश संगठनों में वैज्ञानिक समस्याओं की संगणन आवश्यकता की पूर्त्ति की। भारत में प्रथम सॉलिड स्टेट डिजिटल कम्प्यूटर, आईएसआईजेयू-1 की डिजाइनिंग, विकास एवं निर्माण संस्थान के इंजीनियरों द्वारा वर्ष 1965 में यादवपुर विश्वविद्यालय की सहभागिता के साथ सम्पन्न किया गया था।

प्रोफेसर महालनोबिस ने भारत में आर्थिक आयोजना के क्षेत्र में महती अवदान किया है। वे भारत के द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रमुख योजनाकार थे। उनकी अभिरुचि संदर्श आयोजना में थी तथा उन्होंने अविकसित देशों में आयोजना हेतु किसी आर्थिक मॉडल के निर्माण में सरल, तार्किक विचारों का उपयोग किया। योजना आयोग के एक सदस्य के रुप में, विकास के अन्य क्षेत्रो को दर-किनार करते हुए उन्होंने भारी उद्योगों में वृहत निवेश करने की आवश्यकता पर बल दिया। यह एक ऐसी नीति सिद्ध हुई जिसने देश में पर्याप्त रुप से तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए सहायक बनी।

यहां तक कि जब महालनोबिस अपने आयोजना मॉडलों पर कार्यरत थे, उन्होंने सांख्यिकी प्रविधियों में नए विचारों का देना बंद नहीं किया था। वर्ष 1958 में उन्होंने एक सरल परंतु बहुत प्रभावकारी तकनीकी की खोज की, जिसे फ्रेक्टाइल ग्राफिक्स विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। सामान्यीकृत दूरी तथा वर्गीकरण-विज्ञान के साध्यों, पायलट सर्वेक्षणों, अंतर-प्रवेशकारी उप-नमूनों, अंतरीक्ष-क्षेत्रों के यादृच्छिकता की अवधारणाओं तथा आर्थिक वृद्धि मॉडलों आदि के प्रति उन्होंने इस टूल को सहयोजित किया। इसे व्यक्तियों के किन्हीं समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की, स्थान एवं समय में भिन्नताओं का संज्ञान लेते हुए तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के विभिन्न चक्रों में संग्रहित डेटा का उपयोग करते हुए, तुलना करने में पड़ने वाली अनिवार्यताओं की दृष्टि से विकसित किया गया था। फ्रेक्टाइल ग्राफिक्स विश्लेषण का अनुप्रयोग अन्य क्षेत्रों, यथा-जनसांख्यिकी, मनोविज्ञान, जैवमिति आदि में भी किया गया।

प्रोफेसर महालनोबिस को दुनिया भर के विभिन्न अकादेमिक संस्थाओं से कई अवार्ड तथा सम्मान प्राप्त हुए। वर्ष 1958 में उन्हें भारतीय गणतंत्र द्वारा विज्ञान एवं देश के प्रति सेवाओं के मद्देनजर उनके अवदानों पर उन्हें देश के दूसरे वरिष्ठतम पुरष्कार, पद्मविभुषण से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर महालनोबिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु विभिन्न देशों के कई प्रख्यात

वैज्ञानिकों के साथ सहभागिता की थी। उन्नीस सौ बीसवीं दशक से वर्ष 1972 में उनकी मृत्यु तक के काल को भारत में सांख्यिकी के इतिहास में स्वर्णिम अवधि के रुप में माना जाता है, जिसमें सांख्यिकी का एक प्रमुख प्रौद्योगिकी के रुप में तीव्र विकास तथा मानव कल्याण में इसका अनुप्रयोग मील के पत्थर हैं।

****

জীবন্ত ঈশ্বর

প্রিয়জিৎ সেন, বৈজ্ঞানিক সহকারী গ্রুপ-এ, সি.এস.এস.সি.

ছোটবেলার সেই আবেগী মনটা আজও আছে কিন্ত সেই উৎফুল্ল খুশিরা শুধুই মনের মধ্যে থেকে গেছে। স্কুলের একটানা ক্লাসের ফাঁকে তিরিশ মিনিট বিরতির পর্বটা যেমন ছিল সারা দিনের রসদ তেমন আবার যখন স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষা শেষের অপেক্ষায় থাকতো মামার বাড়ির আদর। তেমনই একটা খুশির দিন ছিল বছরে কখনও একবার, আবার কখনও বা দুবার আমাদের প্রাণের ঠাকুর বাড়ি যাওয়া। জায়গাটা হুগলির ডুমুরদহ। সবুজে মোড়া,সাবলীলতার ছোঁয়ায় ঘেরা। তাতে দিগন্ত বিস্তৃত সতেজ শস্যখেত। ঠাকুর বাড়ির দৃশ্যটা ক্যালেন্ডারের সাজানো ছবির মতো। গরমের দুপুরে সুশীতল অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় অনেকটা সময় আধ্যাত্মিক গল্পগাঁথায় থাকতো সেবাইতদের স্নেহ। ঠাকুর বাড়িতে গিয়ে প্রথমে পেতাম ঠাকুরের প্রিয় তেলেভাজা মুড়ি। কথাতে আছে মনই মন্দির। সেই মন্দিরের প্রতিচ্ছবি আর তার সৃষ্টিকর্তা আমাদের ঠাকুর (গুরুদেব)। গুরুদেবের পদ্মলোচন, কোমলকরের স্পর্শ শান্তির সমারোহে আমাদের উপনীত করতো। গুরুদেবের সামনেই থাকতো চকোলেট ভর্তি রেকাবি। আমাদের আবদারের কোনো পরিসীমা না থাকায় সেখান থেকে পেতাম খুশি মুঠো লজেন্স। আশ্রমের ফুল বাগানগুলিকে নানারকম নামের পরিচয় দিতাম। আশ্রমের অন্দরে অনেক মন্দিরের মাহাত্ম না বুঝলেও আপন মনে নতশিরে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা জানাতাম। ছোট ছোট চাওয়ার আনন্দ ছিল অপরিসীম। আশ্রমের পড়ন্ত বিকালের সময়গুলো ছিল আম-জাম-কামরাঙ্গা মাখা, আর সাথে ছিল নতুন নতুন সাথী। দিন শেষে পবিত্র গঙ্গায় মাঝিদের ঘরে ফেরার টানের দৃশ্য আমাদেরও মন ভারাক্রান্ত করে দিতো। মনে করিয়ে দেয় আমাদের সারাদিনের আনন্দ প্রাপ্তির শেষ লগ্নে হাজির হয়েছি। বাড়ি ফিরতে হবে। ফিরেছি বাড়ি আবারও আসবো এই মনে করে।

সামনেই আবারও সেই আনন্দঘন মুহূর্তের সাক্ষী হতাম। কিন্তু কাছের মানুষ, প্রাণের ঠাকুর তথা আচার্যদেব শ্রীমৎ অভয়ানন্দ

ব্রহ্মচারী মহারাজ ১৯ শে ভাদ্র ১৪৩১ সন এ উত্তমালোকে পাড়ি দিলেন। পার্থিব নশ্বর স্থূল শরীর ত্যাগ করে পরম ব্রহ্মলোকে লীন হলেও তাঁর শাশ্বত বাণী, আশীর্বাদ কৃপা সর্বদা আমাদের সাথেই থাকবে চিরদিন, চিরকাল।

"তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম"

আগামী দিনগুলিতে তোমার উপস্থিতি অনুভবি মনন ক্ষমতা, অনুভূতি দিও সকল সন্তানেরে।

****

উত্তরণের পথে - শূন্য থেকে এক

রবীন্দ্র নারায়ণ দাস, অবসরপ্রাপ্ত কর্মী

লেখালেখির একটা সুপ্ত বাসনা 1980 সালে কোলকাতার ইন্ডিয়ান স্টাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটে (ISI) ছাত্র হিসাবে যোগ দেওয়ার সময় থেকেই মনের গোপনে বাসা বেঁধেছিল। 25/02/1995 সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধকার পথিক গুহ মহাশয় "কম্পিউটার ভাইরাস বা ভূত মার্কিন মুলুক পেরিয়ে ভারতবর্ষের ব্যাঙ্গালোরে হাজির" নামে এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধের উত্তরে আনন্দবাজার পত্রিকায় "পাঠকের মতামত" কলমে "কম্পিউটার ভাইরাস কলকাতায় এসে গেছে" লেখার মাধ্যমে আমার পত্রিকায় লেখার হাতেখড়ি। তখন ISI-তে কম্পিউটারে ব্যবহৃত তথ্য সংগ্রহের কাজে একটু বড় সাইজের ফ্লপি ডিস্ক ব্যবহার করতে গিয়ে ডিস্কের বুট সেক্টরে প্রথম "ব্রেন" নামে আমজাদ ব্রাদার্সের পাকিস্থানি ভাইরাসের সন্ধান পাই যেটা ফ্লপি ডিস্ককে অকেজো করে দিত। এই সম্পর্কে পরে আলোচনা করছি। সেটা ভারতবর্ষে কম্পিউটার ভাইরাসের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে আমার জানা প্রথম লেখা। সেই লেখার সূত্র ধরে প্রবন্ধকার পথিক গুহ মহাশয় ইংরাজি পত্র পত্রিকায় কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

যাক সে কথা, ফিরে আসি আমার লেখার বিষয়ে। সত্যি বলতে কি আমার সেই সুপ্ত বাসনা পূরণ হয় ISI-এর এই বার্ষিক "লেখন" পত্রিকায়। অনেক গণ্যমান্য লেখকদের সাথে আমার প্রথম লেখা কল্পগল্প ও পরে নানা সংখ্যায় লেখা কিছু প্রবন্ধ এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। সেই জন্য আমি এই পত্রিকার কাছে ও যাদের আমার লেখা ভালো লেগেছিল তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। পরে লেখন পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয় এবং আমিও অফিসের রোজকার ন্যস্ত কাজের সাথে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জীব-বিজ্ঞানীদের গবেষণার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের হাতেকলমে প্রয়োগ পদ্ধতি প্রশিক্ষণের কাজে ব্যস্ত হয়ে যাই। এর সাথেই চলতে থাকে ISI কর্মী সংগঠন ও পরে ISI কর্মীদের সমবায় সমিতিতে স্বেচ্ছা

শ্রম দেওয়ার কাজ। ফলে পত্র পত্রিকায় লেখা আর হয়ে ওঠেনি।

ইচ্ছা ছিল অবসরের পরে জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে উপন্যাস লিখব। কিন্তু বর্তমান জীবনে এসে মনেহল এখন আর ছাপানো বড় ধারাবাহিক উপন্যাস কি কেউ পড়বে? এখন তো ব্লগ আর ভ্লগের যুগ। আপনি ভিডিও বানাতে পারলে ইউটিউবে চ্যানেল খুলে ভিডিও আপলোড করে দিতে পারেন, সেটার আধুনিক নাম ভ্লগ। আর যদি লেখালেখিতে ভালো হন, তবে ব্লগ ওয়েবসাইট বানিয়ে আর্টিকেল লিখে পোস্ট করতে পারেন। সে দুটোও কিছুদিন করলাম, কিন্তু মন ভরলো না। এত ব্লগার ও ভ্লগারের ভিড়ে ভালো লেখা খুঁজে পড়াও আমার মত পাঠকের কাছে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। ঠিক এই সময়েই ।SI। ক্লাবের পক্ষ থেকে "লেখন" পত্রিকার জন্য লেখা দেওয়ার সুযোগ পেয়ে সুপ্ত বাসনা আবার জেগে উঠলো।

জীবন সায়াহ্নে এসে আমার শিক্ষাক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র ও অবসর জীবনে ।SI। সদস্যদের সম্মানসূচক প্রতিনিধি হিসাবে কাউন্সিলে কাজ করে ।SI-এর নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতার ঝুলিও পূর্ণ। ।SI-এর প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের সাথে কম্পিউটার ব্যবহারে সহযোগী হিসাবে কাজ করা থেকে নিচের তলার মালি, ঝাড়ুদার, পাহারাদার ও সাহায্যকারীদের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা অথবা অতীত ও বর্তমান সমাজের কর্মীদের মানসিকতার তফাৎ বা ।SI। ক্লাবের খেলাধুলা, গান বাজনা, নাটক প্রতিযোগিতা সম্পর্কে নানা বিষয় নিয়েই লেখা যেতে পারে। কিন্তু লেখা জমা দেওয়ার সময়ও আর নেই। তাই আমার সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ।SI-এর কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিয়ে লেখা শুরু করলাম।

।SI। এর কম্পিউটার সায়েন্স ইউনিটে (CSU) পাঞ্চ কার্ড প্রস্তুত করার ইউনিট রেকর্ড মেশিন ও সেই কার্ড ব্যবহার করে মনিটর বিহীন বিশাল মেন ফ্রেম EC-1033-তে আমাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ শুরু হয়। EC-1033 একটি সোভিয়েত কম্পিউটার যা IBM/360 কম্পিউটারের সিঙ্গল-ইউজার অপারেটিং সিস্টেমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। 1985 সালে ।SI-তে কম্পিউটার অপারেটর হিসাবে চাকরি জীবন শুরু করার পরে ।SI-তে সাদা-কালো টার্মিনাল সহ ORG System নামে মাল্টি-ইউজার কম্পিউটার আসে। নাম থেকেই বোঝা যায়

যে সিঙ্গল-ইউজার কম্পিউটারে একটা কাজ শেষ না হলে আর অন্য কোন কাজ শুরু করা যেত না, যে অসুবিধা এখন নেই। এর পরেই আসে মাইক্রো কম্পিউটারের ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম (DOS)। এই DOS, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এর মেশিন কোডের কাছাকাছি লো-লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ Assembly যা হার্ডওয়্যার কে বুঝতে সাহায্য করে ও হাই-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ BASIC শেখা থেকে শুরু হলো নিজের প্রচেষ্টায় কম্পিউটার শিক্ষা ও তার প্রয়োগ। এর পরে সেই যুগের বৈজ্ঞানিক গবেষণা মূলক কাজের কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ FORTRAN বা ফর্মুলা ট্রান্সলেশন প্রোগ্রাম শিখে প্রফেসর সুনীল কৃষ্ণ পাল, প্রফেসর তারেশ মৈত্র, প্রফেসর অরিজিৎ চৌধুরী, প্রফেসর পার্থ প্রতিম মজুমদার, প্রফেসর রাজকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়দের সাথে অনেক প্রজেক্টে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল কম্পিউটার সায়েন্স ইউনিটে। এনারা গবেষণার কাজে ফিল্ড ওয়ার্ক করে বিভিন্ন ডাটা সংগ্রহ করতেন। প্রথমে পাঞ্চ কার্ডে সেই ডাটা এন্ট্রি করা হতো। কম্পিউটার প্রোগ্রামের সাহায্যে এই ডাটার লজিক্যাল টেস্ট করে সেগুলো বাছাই করে পাওয়া যেত তথ্য বা ইনফরমেশন। এইগুলো তখন ম্যাগনেটিক টেপে সংগ্রহ করা হতো যা এখন আর কম্পিউটারে ব্যবহার হয় না। তখন ISI-এর মেন ফ্রেম শক্তিশালী কম্পিউটারটি যেহেতু সিঙ্গেল ইউজার অপারেটিং সিস্টেমে চলত তাই পাঞ্চ কার্ডে দেওয়া ছাত্র ও গবেষকদের প্রোগ্রামের লাইন পড়ে যেত। ফলে দিন রাত সব সময় কম্পিউটার চলতো। যে সকল বিজ্ঞানী বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণার কাজ করতেন, তাদের সাথে সেই তথ্য বিশ্লেষণের প্রোগ্রাম লেখার কাজে সহযোগিতা করতে গিয়ে রাত জেগে কাজ করে অনেক বিষয় শিখতাম।

সেই সময় ISI ক্যান্টিন থেকে আনানো পাঁচ পয়সা প্রতি কাপ দুধ চা ও সাথে ব্রিটানিয়া বিস্কুট দিনে দুই বার করে কম্পিউটার সেন্টারের সবাই ভাগ করে খেতাম। কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেমের নানা কমান্ড ও কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে নানা প্রযুক্তিগত ও গাণিতিক সমস্যার সমাধান নিজের প্রচেষ্টায় করতে পারলে খুবই আনন্দ হতো। নুতন প্রযুক্তি শিক্ষায় এমন ভাবে একাত্ম হয়ে পরেছিলাম যে টিফিন করতে যাবার সময় কখন পেরিয়ে

যেত খেয়াল থাকতো না। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হলো গ্যাস্টিক আলসার। ধীরে ধীরে চিকিৎসার মাধ্যমে তা সেরেও গেল কিন্তু সারা জীবনের মতো উপোস করা বারণ হয়ে গেল। এই কাজের মধ্যেই আমাদের ডিপার্টমেন্টের স্বর্গীয় পরিমল চ্যাটার্জি (সকলের প্রিয় পরিমল দা) মহাশয়ের হাত ধরে 1988 সালে প্রথম ISIWO নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে Executive Committee তে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হলাম। ISI ক্লাবের সদস্য হয়ে পেলাম ID কার্ড।

কম্পিউটার সাইন্স ইউনিটের তৎকালীন প্রধান প্রফেসর যোগব্রত রায় বিদেশে থেকে নিয়ে এলেন একটি IBM Micro Computer যাতে প্রথম রঙিন স্ক্রিন ব্যবহার ও সা-রে-গা-মা সুর বাজানোর প্রোগ্রাম শিখলাম। তিনি ISI-তে শুরু করলেন বেসিক প্রোগ্রাম শেখানোর ক্লাস। ওনার সহযোগী হিসাবে সেই প্রথম অন্যদের কম্পিউটার ব্যবহার প্রণালী ও বেসিক প্রোগ্রামিং শেখানো শুরু করি। ওই সময়ে মাইক্রোসফট উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম চালিত পার্সোনাল কম্পিউটারে শিক্ষার্থীদের প্রোগ্রাম ও তথ্য বা ডাটা সংরক্ষণ করে রাখার জন্য ফ্লপি ডিস্ক ব্যবহার হতো। হঠাৎ দেখা গেল এই ডিস্কে রাখা তথ্য নিজে থেকেই মুছে যাচ্ছে। ফ্লপি ডিস্ক ড্রাইভ ও কম্পিউটার ঠিক মত কাজ করছে না মনে করে হার্ডওয়ার ইঞ্জিনিয়ারদের ডাকা হলো। দেখা গেল সব ডিস্ক ড্রাইভ ঠিক মত কাজ করছে। এবারে নষ্ট ফ্লপি ডিস্ক পরীক্ষা করে "ভাইরাস" ও "আমজাদ ব্রাদার্স" শব্দগুলির সন্ধান পাওয়া গেল। দেখা গেল নষ্ট হওয়া ও আক্রান্ত ফ্লপি ডিস্কের নাম পরিবর্তন হয়ে "ব্রেন" হয়ে গেছে। বুঝলাম প্রথম কম্পিউটার ভাইরাসের দেখা পেয়েছি যা ওই আক্রান্ত ডিস্কের মাধ্যমে তার প্রোগ্রাম কম্পিউটারের মেমোরিতে চালান করে দিচ্ছে। অন করা (চালু) অবস্থায় ওই কম্পিউটারে অন্য ফ্লপি লাগিয়ে কাজ করলে মেমোরিতে থাকা ওই প্রোগ্রাম নিজে থেকেই অন্য ফ্লপিতে সংক্রামিত হচ্ছে। কম্পিউটার পাওয়ার অফ করে বন্ধ বা শাটডাউন করলে মেমোরি থেকে ভাইরাস মুছে যাচ্ছে যাতে আবার চালু করলে অন্য ভালো ডিস্কে আর সংক্রমণ হচ্ছে না। কিন্তু সংক্রামিত ডিস্কের বুট সেক্টর ক্লিন করে ভাইরাস মুক্ত করে তবেই আবার সেই ডিস্ক ব্যবহারযোগ্য হতো।

সেই সময় থেকেই ISI-তে International Computer Education Centre (ISEC) কোর্স এবং Operation of Automatic Data Processing (OADP) কোর্সে কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম ও Data Analysis পড়াতে গিয়ে নিজেও অনেক নুতন বিষয় শিখেছিলাম। পরে ISI-তে প্রফেসর যোগব্রত রায়ের তত্বাবধানে কম্পিউটার সার্ভিস সেন্টারের সূচনা হলো। Digital Equipment Corporation (DEC)-এর তৈরি VMS operating system চালিত VAX কম্পিউটারে ছাত্র ও গবেষক বৃন্দ টার্মিনালের মাধ্যমে প্রোগ্রাম ও ডাটা এন্ট্রি করে টেপ ড্রাইভে সংগ্রহ করতেন। প্রত্যেক ব্যবহাররীর কাছে গিয়ে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে হতো ও অপারেটিং সিস্টেম ম্যানেজমেন্টের কাজ খুব আনন্দের সাথেই করছিলাম। 1995 সালে সুযোগ এলো আনথ্রোপোলজি ইউনিটে প্রফেসর পার্থ প্রতিম মজুমদারের অধীনে বিভিন্ন প্রজেক্টে ডাটা প্রসেসিং টেকনিশিয়ান পদে কাজ করার, যে পদটি বর্তমানে অ্যাসোসিয়েট সায়েন্টিস্ট নামকরণ হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে এখানে ফিল্ড থেকে সংগ্রহ করা ডাটা কিভাবে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে তথ্য, টেবিল বা গ্রাফের সাহায্যে বিভিন্ন গবেষণাপত্রের জন্য প্রস্তুত করতে হয় তার প্রয়োগ শিখলাম। ওখানে আমার প্রয়োজন শেষ হলে আবার ফিরে এলাম কম্পিউটার সার্ভিস সেন্টারে। তৎকালীন সেন্টার প্রধানের কাছে কম্পিউটার সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট এর কাজ চাইতে গিয়ে জানলাম যে সিস্টেমের পাসওয়ার্ড দেওয়া যাবে না। ফলে সেন্টারে আমার কম্পিউটার স্টার্ট ও শাটডাউন করা ছাড়া কোনো কাজ থাকলো না। কর্মী সংগঠন করার সাথে সাথে চেষ্টা শুরু করলাম ISI এর কর্মী, ছাত্র ও গবেষকদের কাজে লাগবে এমন কোনো কাজ খোজা। এই চেষ্টা থেকেই শুরু হল আমার জীবনে ও ISI এ এক গুরুত্বপুর্ন অধ্যয়, ISI এর সকল স্তরের কর্মীদের কম্পিউটার ট্রেনিং দেওয়ার কাজ। এর আগে বায়ো সায়েন্স ডিভিশনের গবেষক ও কর্মীদের ডাটা প্রসেসিং এর পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম। হটাৎ করেই আবার জীবনে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেবার গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ এলো যখন ISI-তে আমাদের সহকর্মী গ্রুপ C ও গ্রুপ D-এর কর্মী পদ সরকারি সংস্থায় অবলুপ্ত করা হলো। এই

সময় কর্মীদের থেকে কম্পিউটার শেখার আগ্রহ দেখে তাঁদের জন্য একটা বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণের প্রস্তাব প্রণয়ন করে সকল বিজ্ঞান কর্মীদের ইমেইল করে যাঁরা আমার সাথে এই প্রশিক্ষণে সঙ্গী হতে আগ্রহী তাঁদের কাছে আবেদন জানালাম এবং প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য তৎকালীন ডিরেক্টর প্রফেসর শঙ্কর কুমার পাল মহাশয়কে পাঠিয়ে দিলাম 2010 সালের প্রথম দিকে। এর পর প্রফেসর বিমল রায় মহাশয় ISI-এর ডিরেক্টর হিসাবে মনোনীত হলেন। ইতিমধ্যে তৎকালীন ডিরেক্টর প্রফেসর শঙ্কর পাল মহাশয়ের থেকে আমার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়ে এসেছে। প্রফেসর বিমল রায় মহাশয় ডিরেক্টর হিসাবে যোগ দেওয়ার পরে বছরের শেষ দিকে গিরিডি ব্রাঞ্চে আমাদের ISIWO ও প্রশাসনের জয়েন্ট মিটিং হলো যেখানে আমিও ISIWO-এর প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে এই কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা হয়েছিল এবং প্রফেসর রায় সেই মিটিং থেকে ফেরার পথে আমাকে বাজেট প্রস্তাব সহ যাঁরা পড়াবেন ও কোন কোর্সে কারা যোগ দিতে পারবেন তাঁর সম্পূর্ণ রূপরেখা জমা দিতে বললেন। যে সকল গ্রুপ C এবং D-এর কর্মীরা কম্পিউটার ছুঁয়েও দেখেননি, তারা যদি কম্পিউটার শিখে অফিসের কাজ করতে পারে তাহলে এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না, কারো চাকরি যাবার ভয় থাকবে না। এর আগে 10 সেপ্টেম্বর 2010 তারিখে ISI এর Council মিটিংয়ে ISI-এর Development Fund এর অর্জিত সুদ-এর কিছু অংশ কর্মীদের ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করার প্রস্তাব ডিরেক্টরের উদ্যোগে পাস হয়েছিল। ডিরেক্টর মহাশয় দিল্লির দীনেশ সাবরওয়াল, ব্যাঙ্গালোরের সোমনাথ রায়কে নিয়ে প্রফেসর বিদ্যুৎবরণ চক্রবর্তীর তত্বাবধানে "Professional Training and Development Scheme of ISI" নামে একটা কমিটি গড়ে দিলেন, যাঁরা প্রয়োজন অনুসারে সমস্ত প্রকল্পটির বিভিন্ন কোর্সের তত্ত্বাবধান ও ছাড়পত্র দিতেন।

2011 সাল থেকে সারা ভারতে ছড়ানো ISI-এর সকল ব্রাঞ্চের সহকর্মীদের কম্পিউটারের ব্যবহার পদ্ধতি প্রশিক্ষণের কাজ কোলকাতার CSSC থেকে শুরু হলো। মাউস ধরা, কীবোর্ড চালানো থেকে সিপিইউ, মনিটর এর কাজ বর্ণনার মত

বেসিক কোর্স অষ্টম শ্রেণী পাস করা কর্মীদের জন্য শুরু হলো। ধাপে ধাপে সেটা MS Windows, MS Office, লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম, Advance MS Office, ল্যাটেক্স ডকুমেন্ট রাইটার থেকে নিজের ইনকাম ট্যাক্স ফাইল অনলাইনে জমা করার কৌশল সংক্রান্ত কোর্স 2015 সাল পর্যন্ত করানো হয়েছিল। এই প্রকল্পের উপকারিতা সম্পর্কে সেই সময়ের ISI কাউন্সিল সদস্য প্রফেসর শিবদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় council-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটা রিপোর্ট ও Council-এ জমা দিয়েছিলেন। এর পরে ISI এর ডিরেক্টর পরিবর্তন হয় ও এই স্কিমের জন্য নুতন প্রশাসনিক কমিটি গঠিত হয়। এই নুতন কমিটির সম্মতিক্রমে একটা নুতন কোর্স অনুমোদিত হবার পরেও টাকার অভাবের কারণ দেখিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সেই সময়কালে ওই কোর্স সংক্রান্ত নোট তৈরির লেখালেখিতে ব্যস্ত হয়ে যাই। হেড অফিস সহ ISI-এর সকল ব্রাঞ্চে ঘুরে ঘুরে বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক কর্মীদের প্রয়োজন অনুযায়ী নানা কোর্স করানো হয়েছিল। অনেকেই এই কোর্স করে উপকৃত হয়েছিলেন। সেই সময় যাঁরা সেকশন অফিসার থেকে প্রমোশনের মাধ্যমে Administrative Officer হতেন তাঁদের এই MS Office কোর্স পাশ করার সার্টিফিকেট থাকতে হতো। না থাকলে এই কোর্স সম্পূর্ণ করে প্রমোশন পেয়েছেন এমন নজিরও আছে। এই কোর্স করানোর সময় যাঁরা শিক্ষক বা সহযোগী হিসাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, দিল্লি ও বাঙ্গালোর ব্রাঞ্চের কর্মীরা তাদের শাখায় বিশেষ সন্মান প্রদর্শন করেছিলেন। হেডকোয়ার্টার কলকাতা, গিরিডি, তেজপুর ও হায়দ্রাবাদের অংশগ্রহণকারী কর্মীরা ও তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও সম্মান জানিয়েছিলেন। এই সব কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও মতামত সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা জীবনের এক বিরাট প্রাপ্তি। সেই পাঁচ বছর সময়কালে ISI-এর CSSC ইউনিটে প্রায় সারা বছর এই প্রকল্পের অধীনে নানা কোর্স চলত। সেই সময় CSSC-তে চোদ্দ জন কর্মী ও ছয় জন শিক্ষানবীশ ছিলেন যারা বিশেষ ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। কোর্স চলাকালীন প্রত্যেক দিন লাঞ্চ বা টিফিনের ব্যবস্থা থাকতো। কিন্তু এত কোর্স হতো বলে অংশগ্রহণকারী কর্মী, শিক্ষকসহ অতিরিক্ত পাঁচ জন সহযোগীর

জন্য এই খাবারের অনুমোদন ছিল। ফলে ডিপার্টমেন্টের পাঁচ জনের গ্রুপ করে এক এক দিন এক এক গ্রুপের সাথে খাবার ভাগ করে নিতে হতো। লাঞ্চের খাবার অনেক সময় দোকান থেকে দিয়ে যেত, কিন্তু টিফিনের জন্য প্যাকেট দোকানে গিয়ে নিয়ে আসতে হতো। দিতে দেরি হয়ে গেলে বা কোনো সহযোগী না পাওয়া গেলে নিজে গিয়েও খাবার নিয়ে এসেছি। এ ছাড়াও যাঁরা প্রশিক্ষণ শেষের যোগ্যতাসূচক সার্টিফিকেট পেতেন তাঁদের একটি পেন ড্রাইভ ও একটা ব্যাগ দেওয়া হতো।

ISI এর বিভিন্ন ব্রাঞ্চের অংশগ্রহণকারী কর্মী, যেমন গেটের পাহারাদার, ইলেকট্রিক্যাল ও ক্যান্টিন সহকারী, বাগানে কাজ করা মালী ও সহকারী বা অফিসে খাতা কলমে লিখে কাজ করা সকলেরই কম্পিউটার শিখে টেবিলে বসে কাজ করার উৎসাহ, সফলতা, আনন্দ উচ্ছাস ও কৃতজ্ঞতা জানানোর অভিজ্ঞতা জীবনের পরম প্রাপ্তি।

সেই সময় প্রফেসর আদিত্য বাগচী M.Tech কোর্সে Relational Database Management এর ক্লাস নিতেন। তিনি Computer ল্যাব এ php ও MySql এর practical ক্লাস নেবার ও প্রজেক্ট করানোর দায়িত্ব আমাকে দিয়েছিলেন। সেটাও এক বড় প্রাপ্তি কারণ সেই জন্য বিষয়গুলি আগে নিজেকে রপ্ত করতে হয়েছিল। প্রফেসর বিমল রায় ডিরেক্টর থাকাকালীন ISI-এর অনলাইন অ্যাডমিশন পদ্ধতি শুরু হয়েছিল এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনলাইন পদ্ধতি প্রয়োগ করার জন্য আমাকে আহ্বায়ক করে একটা কমিটি করে দিয়েছিলেন। ISI-এ সেই সময় কয়েকটি ক্ষেত্রে অনলাইনে কাজ করার প্রোগ্রাম প্রস্তুত হয়েছিল কিন্তু ঠিক সময়ে তথ্য না পাওয়ার কারণে তা চালু করা যায় নি। ISI তে নুতন প্রযুক্তির কম্পিউটার আসার শুরু থেকে যেহেতু আমাদের কম্পিউটার অপারেশন ও প্রোগ্রামিং নিয়ে কাজ করতে হয়েছিল তাই সেই সময় আমাদের শেখানোর মতো কোন শিক্ষক ছিলেন না। ফলে আমাদের নিজের প্রচেষ্টাতে কাজ করতে করতেই কম্পিউটার ব্যবহার শেখার, অজানাকে জানার যে অপরিসীম উৎসাহ ও আনন্দ পেয়েছি তা চিরকাল মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

****

ISI: সেকাল – একাল

সন্দীপ মিত্র, এস.ও.এস.ইউ.

এই লেখার প্রেরণা পেয়েছি নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক জেমস মার্লিসের আমাকে দেওয়া Riches and Responsibility: the Financial History of Trinity College, Cambridge বইটি থেকে। এর ছত্রে ছত্রে রবার্ট লেন্ড ট্রিনিটি কলেজের চড়াই-উতরাইয়ের পথ বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে। খানিকটা যেন ISI-র সঙ্গে সাযুজ্য আছে মনে হল কোনো কোনো অধ্যায়ে। সেকাল - একাল লেখার ভাবনাটা এইভাবে এল।

প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবিশ তাঁর সন্তানসম ISI-কে যেভাবে লালন পালন করেছিলেন, অধ্যাপক অশোক রূদ্র ও অধ্যাপক নিখিলেশ ভট্টাচার্যের লেখা প্রশান্ত চন্দ্রের জীবনীতে তার আভাস পাওয়া যায়। আমার সুযোগ হয়েছিল এই কর্মকান্ডে যুক্ত হবার এবং খানিকটা অনুধাবন করার। ভারতবর্ষের স্বাধীনোত্তর যুগে রাষ্ট্রনেতারা যখন দেশ গড়ার সুকঠিন দায়িত্বভার তুলে নিয়েছেন, প্রশান্ত চন্দ্র বিজ্ঞান ভিত্তিক রূপরেখা রচনা করে দিশাহারা নেতৃত্বকে কিছুটা দিশা দেখিয়েছেন। বন্যা-খরা-দারিদ্র্য যখন দেশকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে, প্রশান্ত চন্দ্র সরকারকে কারণ ও তার সমাধানের সূত্র যুগিয়েছেন। এই ব্যাপক বিজ্ঞান গবেষণার অন্তরালে নীরবে নিভৃতে তপস্যা করে গেছেন অজস্র বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান কর্মী ও সময়-উপযুক্ত কর্মচারীবৃন্দ। দেশ পুনর্গঠনের কাজে প্রশান্ত চন্দ্র নিজেকে যেভাবে সমর্পন করেছিলেন তা যে কোনো বিজ্ঞানীর কাছেই শিক্ষণীয়।

এই ISI-তে অসামান্য প্রতিভাযুক্ত বহু বিজ্ঞানী বিদেশের মোটা টাকার চাকরীর হাতছানি অবজ্ঞা করে প্রশান্ত চন্দ্রের কর্মযজ্ঞে গা ভাসান। সরকারী ব্যবস্থার মধ্যে বিজ্ঞানভিত্তিক পথ নির্দেশ ও প্রয়োগ তৎকালীন সময়ে এক জ্বলন্ত উদাহরণ রেখে গেছে। সেই সময়ের দাপুটে ICS-রা যেমন চিন্তামণি দেশমুখ এই ধারার অগ্রগতিতে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছেন, কল্যাণমুখী সরকারি নীতি প্রনয়ণ নিছক অভিজ্ঞতা, সাধারণ জ্ঞান বা

অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে নয়, তথ্যভিত্তিক বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার নিরীখে রচনা করার প্রচেষ্টা এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলতেই হবে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতারা তাই এই পরীক্ষার খুঁটিনাটি জানতে একসময় ভিড় করেছেন ISI-তে। স্বল্প পরিসরে বিজ্ঞান গবেষণার এক মানবমুখী রূপ প্রতিভাত হয় বরানগরের এই ছোট্ট সংস্থায়। নিত্যনতুন সমস্যা মোকাবিলা করতে ফলিত বিজ্ঞানের বৃদ্ধির সাথে সাথে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের বিস্তারও জরুরী হয় পড়ে। চড়াই-উতরাইয়ের পথে সরকার ও বিজ্ঞান সংস্থার নৈকট্য তৎকালীন ভারতবর্ষে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। এ হলো সেকালের গল্প।

ISI-র একাল তাহলে কি? কেনই বা এত পরিবর্তন? ISI কি রসাতলে গেছে? এখানে কি কিছুই হয় না? ক্রমবর্ধমান সরকারী অর্থ নির্ভরশীলতা শুধু ISI-তে অর্থ আমদানী করেছে তা নয়, আমদানী করেছে সরকারী নিয়ম-কানুন। স্বশাসিত গবেষণা সংস্থা অতীতের ঘরানা ছেড়ে সরকারী নিয়মনীতির বেড়াজালে হাঁসফাঁস করছে। স্বশাসন যেন এক সীমিত গবেষণার গন্ডীতে আবদ্ধ হয়ে আছে।

সরকার ও রাষ্ট্রনায়কদের দৃষ্টিভঙ্গিও কিছুটা পাল্টেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির চালিকাশক্তি কিয়দংশে জনগনের উপলব্ধি। বিজ্ঞান-গবেষণার ফল যদি প্রযুক্তি বা ফলিত বিজ্ঞানের পথে প্রকট ও দৃশ্যমান হয় তা অনেক সময় আপামর জনগণের প্রশংসার বিষয় হয়। কঠিন গবেষণা ও তার ফল অনেক সময় অন্তরালে থেকে যায়, নীরবে নিভৃতে বিচরণ করে। ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী, মহাকাশযান প্রেরণ, সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন সর্বসমক্ষে পরিলক্ষিত হয়। বীজগণিতের কোনো কঠিন সমাধান, অর্থনীতির কোনো ধারা বিশ্লেষণ, সংখ্যাতত্ত্বের তথ্য বিশ্লেষণ, কম্পিউটার সায়েন্সের কোনো তত্ত্ব উৎঘাটন ইত্যাদি সাধারণত জনসমক্ষে আসে না। কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা অর্জন করে আর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে।

জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি ও উচ্চ মানের গবেষণা অনুধাবন করা মুস্কিল। যে বিজ্ঞান চটজলদি ফল দেয়, যে গবেষণা অতি সত্বর সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে, যে বিজ্ঞান মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা

সমাধানে সটান সাহায্য করে, সেই ধারা সহজে সমাদৃত হয়। এ যেন কেবল প্রযুক্তির জয়গান গাওয়া আর বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ভাবনা, বিজ্ঞান গবেষণার কথা অস্বীকার করা। বিজ্ঞানের অগ্রগতি না হলে দেশের প্রগতি হবে? বিজ্ঞান শিক্ষার বৃদ্ধি না হলে জ্ঞানের বিকাশ হবে? এই সব মৌলিক চিন্তার বিষয়ে গবেষণা সংস্থা ও সরকারের বোঝাপড়া আরো বাড়ানো প্রয়োজন।

স্বাধীন বিজ্ঞান গবেষণার স্বার্থে প্রয়োজন স্বশাসন। অতীতে ISI-র ডাইরেক্টররা বিমানবন্দরে বসে নিয়োগপত্র দিতেন। Advance increment দিয়ে মেধাবী অধ্যাপকদের বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ISI-তে নিয়ে আসতেন। নিম্ন বেতনের কর্মচারীকেও সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে বিদেশে শিক্ষিত করে পরে অধ্যাপক পদে আসীন করা হয়েছে। সাধারণ স্নাতককে অসামান্য নৈপুণ্যের কারণে অধ্যাপক পদে নিয়োগ করা হয়েছে। এই সব ব্যবস্থা ISI-র ডাইরেক্টরদের এবং সমকালীন প্রশাসনের দূরদর্শিতার পরিচয় রেখে গেছে।

একালে এসব হলে কয়েকটা Vigilance বা RTI অভিযোগ হয়ে যাবে। স্বশাসন যদি সরকারী নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়, সরকারের অর্থবণ্টণ যদি সস্তা লোভনীয় Deliverable-এর উপর নির্ভর করে, সরকারী সাহায্য যদি বিজ্ঞান চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞানবৃদ্ধির খাতে বিনিয়োগ না হয় দেশের সুপ্রাচীন ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। উচ্চশিক্ষা সেক্ষেত্রে নিম্নমুখী হবে। মেধাকে লালন পালন করতে চাইলে, মেধাবীকে আকর্ষণ করতে হলে এক স্বাধীন ক্ষেত্র বা working space রচনা করা জরুরি। Autonomy in Letter and Spirit তাই এক আদর্শগত ক্ষেত্র।

প্রশ্ন উঠতে পারে হাজারে হাজারে Private University তো গড়ে উঠছে। এই সব university কি basic সাইন্সের ক্ষেত্রে IISC, TIFR, ISI ইত্যাদির সঙ্গে পাল্লা দিতে পেরেছে? নাকি প্রযুক্তির চর্চায় IIT, IIM-র প্রতিযোগী হয়ে উঠেছে?

ISI-র অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের কথা বলা যাক। ISI-র বিজ্ঞানীদের মধ্যে শুধুমাত্র *মহলানবীশ* প্রবর্তিত উন্নয়নের স্বার্থে মুখ্য

গবেষণা করার প্রবণতা কিয়দংশে কমেছে। International Peer Review-র নিয়মে বিজ্ঞানীরা কাজের মাপকাঠি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন হয়েছেন। শুধু সরকারী কাজ করলে বিশ্বমানের বিজ্ঞানীর তকমা আর পাওয়া যাবে না। বরং আন্তর্জাতিক মানের বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশ করার প্রতিযোগিতা ও ক্ষিপ্রতা কেবলমাত্র স্বীকৃতি আনতে পারে। বিজ্ঞান গবেষণার এই ধারা অনেক সময় সরকারী আমলারা অনুধাবন করতে পারেন না। উন্মুক্ত গবেষণার বাজার যেন সরকার, জনসাধারণ ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক আপাত বিচ্ছিন্নতা (Apparent disconnect) তৈরি করেছে । সরকারী দফতরের কর্মপদ্ধতি আর বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থার চলার পথ একই নিয়মে বাঁধলে চরম ভ্রান্তি হতে পারে। বরং উন্নত দেশগুলি যেভাবে public university-তে বিনিয়োগ করে এবং উচ্চশিক্ষাখাতে ব্যয় করে, সেই ধারা বজায় রাখলে ISI-র একালও জটিল সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে।

****

Sights and Sounds of Japan

Sarbani Palit, CVPR

It was the end of June and the rainy season in Japan had just started. My umbrella served its purpose, whether it was raining or not and for once in a foreign land, I was not alone! Europeans are usually very resilient to the sun and I am often the odd one out. There were a lot of people walking, many cycling, and a common sight was the ‘Mamachari’–a bicycle, with carriers or baskets at the back and front, to carry children as well as other items and the cyclist is often a lady. The Mamachari appears to be very popular all across Japan.

Yokohama is a quaint city with two distinctly separate parts, one is the touristic and less populated area while the other one, near the Railway Station, is the older part with lots of markets, business areas and teeming with people. My hotel as well as the Conference Venue, *The Yokohama Pacifico*, were located in the former, very close to the Yokohama Bay. During the lunch hour, we walked down to the Pier. Despite the cloudy weather, there were many persons fishing, some for their livelihood and some for sport. I paused to take the photo of a lady who had captured quite a large prize. She immediately posed for me and then released the fish back into the water! There were a crowd of pigeons and sparrows, feeding on the scraps thrown to them by a gentleman and his son, presumably. The view across the

Bay was magnificent with the Bay Bridge at a distance, resembling greatly our very own Vidyasagar Setu. We walked down a bridge skirting the Bay, for a while. At a distance was the Cup Noodles Museum which is all about the birth and subsequent growth of Cup Noodles.

On the way back, we walked past the slowly rotating Ferris Wheel – the London Eye of Yokohama. The Wheel had its own decorations of changing designs of coloured lights which made quite a show. A walk through the areas around Minatomirai, especially along the waterfront, took us to the Red Brick Warehouse near the Port at Shinto, which stood for a bygone era, adding to the charm of the city. The beautifully designed ceramic tiles in blocks of nine on many of the pavements

were a testimony to the eye for beauty of the people. At Yamashita Park, we were struck by a Drinking Fountain constructed and donated by the Indian Community of the City, on the occasion of a devastating earthquake in 1923. The fountain is housed in a structure resembling a temple accessible from all four sides but with a dome shaped roof like that of a mosque with beautiful mosaic artwork in the Mughal style on the interior.

After the Conference was over, we travelled to the town of Fujiyoshida, from where, we set out by bus in the morning, for the 5th station of Mount Fujiyama. The ascent was through forests and suddenly, we were at a clearing-our destination with shops, restaurants and offices. At the restaurant was a statue of Igarashi Teiichi, a 105 year old man who climbed Mt. Fuji in 1988, the oldest climber so far. Drawing inspiration from him and a hearty breakfast, we embarked on the Yoshida trail to the summit.

The road from the 5th station to the 6th was made of coarse gravel which seemed to suck up our energy, with each step that we took. However, the cool and crisp air and the magnificent view from the trail, considerably boosted our energy. With Mt. Fuji on our right, as we gazed to the left, there were ranges in different shades of blue, shrouded in mist and capped with white clouds above.

Nestled between the mountains were sprawling towns, glistening in the sun and large lakes with gleaming waters. While there were big trees when we started the trek, the girth and height of the foliage soon diminished. In about an hour, we reached the 6th station. As we proceeded, the landscape on the mountain changed dramatically. There were large tracts of loose soil, often strewn with rocks, some patches of grass here and there. The trail was now over huge and rough, black boulders consisting of solidified lava flows and extremely steep.

There were iron posts at irregular intervals on both sides, connected by ropes or chains. The trail had suddenly been transformed to an exceedingly arduous one. I recalled seeing people coming with tall poles and now understood why! Nevertheless, at irregular intervals there was somewhat level ground with a shop selling food, water, an oral rehydrate solution called 'Sports Water' and even an occasional bench for resting. Some people had their sticks stamped, for a fee, as a memoir of their visit there.

At about the same time that the vegetation had reduced to small scrubs and bushes and the terrain became rockier, a unique sound, waxing and waning over time, captured my attention. The sound, though melodious, was almost plaintive in nature and was like that from a wind instrument. It grew to a crescendo, stayed for some time and then died down and repeated itself some time later. The wind blowing through the rocks was probably responsible for this but it was very different from the usual sounds that strong winds give rise to. Towards the end of the 7th station, dark clouds filled the sky and a light drizzle started. Since there was no shelter on the trail, the only option was to wear rain jackets and keep moving. While this trek repeatedly tested the limits of my endurance, it also renewed my faith in my fellow beings: I was given a helping hand by a completely unknown person, more than once, a kind man offered his mittens to me, saying that he had a spare pair. Many a time I missed my footing and fell on the rocks, people were at my side instantly, helping me back to me feet. Unfortunately, the trek was taking its toll. I reached Taishikan, at the beginning of the 8th station with my body complaining on multiple counts. There was a First Aid Station there, whose personnel took very good care of me but advised against making the rest of the climb to the summit. Luckily, both food and boarding were available for the night at the mountain hut. But, I was in for a surprise -- suddenly, a man from the Station came forth with his video camera to record my opinion of the assistance received there. He

two-timed as a reporter of the local TV station and conducted my ‘interview’ through the translator on his phone. Quite an unprecedented turn of events!

The mountain hut had a team of dedicated workers, one of whom immediately took charge of our bags, helped us to insert our shoes in plastic bags and take them upstairs to our sleeping spaces. We gratefully sank into the sleeping bags provided to us and got up only when called for dinner. Dinner was served on a low table with the diners squatting on the floor instead of sitting on chairs. One of the staff noticed the plight of our weary legs in trying to sit on the floor and without a word, came forth with low stools. Dinner consisted of sticky rice, meat, a sweet and unlimited amounts of tea. We were also handed a breakfast pack for the next morning. In that tired state, the warmth shown by the mountain hut staff was quite overwhelming.

Wake-up calls were given by the staff around 4:15 am since we had to vacate by 5 am.

We watched the sunrise, amidst the stretches of mountain ranges with thick fog and clouds mostly below us and some clouds above. It was an almost surreal experience to see the glimmer of reddish-golden light, slowly spreading across the sky and finally, the sun bursting through the clouds. As the dawn broke, we started on our descent back to the 5th station. Before leaving the 8th Station, out of gratitude for the personnel at the First Aid Station (which runs on donations), I decided to make another donation.

My interviewer of the previous evening immediately pounced on me, recording my statement as to why I had decided to donate some more!

As we made our way back, the eerie, mournful music of the mountain accompanied us often, but try as I might, I could never satisfactorily record the sounds. The mountain had its secrets, which it would not give up and I had to be content with it.

At Hiroshima, we walked over to the Hiroshima Peace Memorial Park, located between two branches of the Motoyasu River which joined at the end of the Park. The Atom Bomb and the devastation it caused is a tale known to all but actually standing on the very place that it occurred, instills a sense of awe. The Park houses the Peace Pond , on one end, which has a cenotaph dedicated to the victims while a Peace Flame

continues to burn at the other, purportedly till nuclear weapons cease to exist. At the Children's Memorial nearby, we learnt of Sadako Sasaki, who was only two years old at the time of the bombing and though she was not directly affected, the radiation caused her to develop leukemia and die at the age of twelve. She was a very cheerful little girl and well loved by her friends and her fellow patients at the Red Cross Hospital which she had to frequent. She had

heard that if she could make a thousand origami paper cranes, she would be granted whatever she wished for. And so, with the hope of being cured someday, the little girl kept making cranes out of whatever paper she could lay her hands on, some of which are still preserved at the Peace Museum. Sadako's friends actually came up with the idea of the Memorial, to commemorate her tremendous spirit. Their efforts culminated into a Peace Monument with a figure of Sadako, atop a concrete structure, holding up a crane. Inside the structure is a peace bell with a bronze crane attached to the rope. There are glass cubicles behind the monument containing a multitude of brightly coloured paper cranes, regarded as a symbol of peace, the world over.

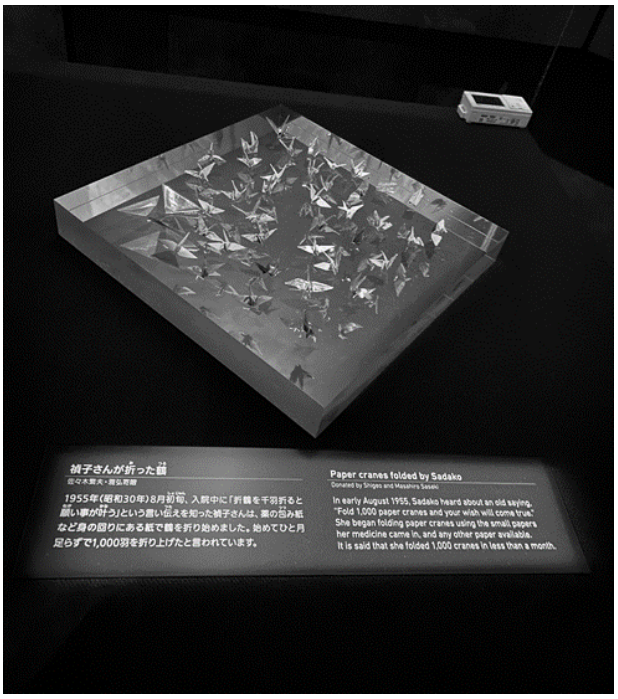

The Genbaku Dome or the Atom Bomb dome stands behind the Peace Pond, as one of the handful of buildings which remained standing after the bombing. Once upon a time it was the Industrial Prefectural Hall of the City. While almost the entire city was reduced to

rubble, a part of the infrastructure of the Hall lived on. The upper part of the dome is just its skeleton of metal but some of the walls and columns survived since it was almost directly under the blast. The building has been preserved amidst differences of opinion of the inhabitants of the city, as a grim reminder of the terrible disaster. Since there was a fence around the building, we could only peer through the openings and try to envisage what it must have been like. Some of the walls had shadowy shapes etched into them which were probably from the people standing against the walls, killed instantly as the blast hit it. The bomb had been dropped at 8:15 am. The day starts early in the land of the rising sun and the timing had perhaps been selected to maximize the damage to life.

As we walked back towards the Museum at the other end of the Park, we went into a Visitors Centre. It was, formerly, a kimono shop during the World War II from where, the owner provided free dresses for the soldiers. The building had a basement which survived the disaster and has been preserved with its cracks and deformations for all to see. The basement housed an office and its sole survivor, Eizo Nomura's

description of the aftermath is inscribed inside. The building also houses the Piano Café. It derives its name from the Grand Piano displayed there which belonged to Akiko, who was born at Los Angeles in 1926 but had moved back to Hiroshima with her family. While she died the very next day of the bombing, her

piano remains as yet another witness and with some restoration, still produces ‘peace-themed’ music.

The Peace Museum is where the story of the Atom Bomb really comes alive. There are countless stories, accounts of survivors, photographs, paintings and objects left fused, burnt or battered after the blast, on display. School students were deployed to pull down buildings in the cities of Japan during the war in order to prevent fires from spreading in the event of air strikes. When the bomb struck, these children were at work and in that half-burnt condition, had run into the river for some relief and eventually perished there. Stories and paintings of people running in tatters, blood all over them, burnt flesh ripping off, the river full of corpses bring out the enormity of the horror. A black rain had followed the blast and people had opened their mouths to receive it, hoping to soothe themselves, only to devour more of radioactive material. The marks of the black rain on a building wall have been preserved. There are bits and pieces of the uniforms of the children, a deformed tricycle and helmet of a child whose father had buried him along with it, a lunch box belonging to a schoolboy, containing a mixture of rice, barley and potato which was discovered by his mother in a scorched condition beneath his skeletal remains, the painting of a horse-cart owner who had died leaning on his horse after removing the horse’s bridle and trappings to give him some relief, innumerable accounts of people slowly succumbing to cancer on account of radiation exposure, persons becoming progressively weak and turning into burdens on their families—leave one speechless.

In another section of the Museum, was being played, the story of the Akatsuki Corps–child soldiers, in their teens who had been trained as a marine suicide attack squad but were called in to help in the wake of the dropping of the bomb. The documentary made from their accounts is chilling and touching at the same time, transporting one back in time to that fateful day. The adjoining Peace Memorial Hall is a place of quietude with a monument at the centre resembling a clock showing 8:15 – the time of the attack and a panoramic view of the bombed city on the walls around the hall, constructed using 1,40,000 tiles, the approximate number of victims.

One cannot but admire the way at which the city has risen from its ashes and recall the words of Miekichi Suzuki (hailed in Japan as the Father of Children's Literature), inscribed at the Peace

Memorial Park: I will forever dream, simply as I did in my boyhood and therefore suffer only little.

Our next destination was Oita, in Kyushu Island, to meet a long-time family friend. We visited Beppu, a haven of hot springs–Onsen in Japanese. We saw the Seven Hells (Jigoku) of Beppu–Kamado Jigoku (Cooking Pot Hell) with brilliant blue steaming pools where one can drink a cup of the hot spring water for 5 yen, Oniishi Bozu Jigoku (Shaven Head Monk's Hell) with boiling grey mud pools with bubbles emanating forming concentric circles and apparently resembling the bald head of a monk, Oniyama Jigoku (Crocodile Hell) with lots of crocodiles lazily soaking up the sun, lying in the warm waters, Tatsumaki Jigoku (Tornado Hell) which consists of a geyser erupting every half an hour or so, to name some. We were next escorted by our host to a 'Steam Kitchen'. Here, one has to order food, which arrives raw (vegetables, meat, eggs), in vertically stacked bowls made of steel mesh and has to be cooked with the assistance of the staff. The set of bowls has to be lowered into the oven, which is heated by the steam from the hot springs and retrieved after a time set by the staff, when the food is steamed and ready to be eaten.

We began the last day of our stay with a visit to Usuki, an old castle-town. Stone

sculptures of Buddha, carved into the rock wall, dating back more than 1300 years are a hallmark of this place. These are situated in an old forest amongst tall trees and lush greenery, with a lotus pool and gardens and is a frequent haunt of artists. We briefly went to the castle which has a moat

around it and as we walked up, observed a number of buildings, made partly of wood and partly of stone, inside it, including a lotus pond and a bridge across it.

The mournful melodies of Mount Fujiyama, the touching stories haunting the city of Hiroshima and the stone Buddhas, residing silently for ages to come in the forest-garden of Usuki, remain alive in my heart.

****

ইচ্ছে

সৌমেন্দ্র নাথ ভূঁইয়া, অডিও - ভিজুয়াল ইউনিট

কালের অন্তরালে সবুজ মনে আলোর ঝলকানি
ইচ্ছে হয় ...
সময়কে থামিয়ে ফিরে যাই অতীতে
পুরানো দিনগুলোকে আবারও নতুন করে ফিরে পেতে।
শৈশবের বেয়াদপি আবারও পার পেয়ে যাক।
মা-বাবার বকুনিকে উপেক্ষা করে
বন্ধুদের সাথে আড্ডা আর খেলা।
ইচ্ছে হয় ....
আবারও চেনা পথ দিয়ে হেঁটে যাই
উদ্দেশ্যহীনভাবে ...
বড় হওয়ার হাতছানি স্বপ্নের মতো লাগে!
ইচ্ছে হয় ...
আবারও ফিরে যাই স্কুলের গণ্ডীতে শুরু হোক খুনসুটি
পুরোনো বন্ধুদের সাথে।
নিঃস্বার্থ, নিষ্পাপ মনের আয়না আরও একবার ঝলকে
উঠুক স্মৃতির আলোকে।
ইচ্ছে হয় ".....

****

Night

Soumyanetra Munshi

The night never was ours
It was by them, for them, of them
Not made soft for the rest of a tired body
Not made fragrant for the ease of sleep
Lullabies didn't play for the
Happiness of the soul
The velvet wasn't spread to absorb
The sweat that smelled of duty
The lights weren't dimmed
Because eyelids were heavy
With too much exhaustion
The window wasn't opened for the
Soothing night wind to caress her face…

How many nights
Should we walk the streets
Before we can see the day?
How many times
Should we shout and cry
Before you can hear us say?
How many times
Should we wrestle with death
Before you know we want to live?
Yes and how many times

Should we swear our oaths
Before you will finally believe?
How many times
Should we close our fists
Before you know we're strong?
How many times
Should we be reborn
Before you know it's too long?

The answer my friend
Is being written right here
There's no stopping, there's no fear
The night is ours, now and forever…

****

Was

Soumyanetra Munshi

I don’t want to be nice and decent
I want to tear off my skin
And bludgeon my patience
And rip apart my smiles
I want to expose
All that’s inside of me
Rugged, sharp, torn
Shorn of all loveliness and care
Smells of fumes of anger
Layers of dreams
That melt away into nothingness
All coiled up
Boiling roiling
Like mirrors of stagnant time
That reflect something’s wrong
All that’s wrong
Like curtains of lies and deceit
That hang down heavily
On richly decorated truths
Like the cries of honesty
Begging for mercy
At the altar of vainness
I am done
More than done
Let the sun and the rain

And the storm and the seas
Wash me and tear me down…
No rosy cheeks
No dimpled chin
No powders and paints
No plasters no casts
Nothing to hide
Just unadorned fire
Raw flames
Burning down
Even the last shred of shame
Every speck of modesty
Heat and sweat
Throbbing and pulsating
Fear and danger
Absolute mess everywhere
It’s a world where
There’s no heaven no hell
Everything’s merged into
Rage
Unspeakable rage
Inexpressible fury
Nothing waits to be uttered
Because utterance itself
Has declared silence
Has silenced civility
Nothing borrows

Or lends itself
There’s absolute disregard
For propriety
There’s no me left
Just miles and miles
Of pure madness
I am writing myself down
Like a poem that
Doesn’t want to end
That keeps stitching
And mending edges
Thinking it’s done
But it’s not
So she tears them down
And starts the pattern anew
Like it just wants to
Inscribe on the melting walls of time
That she once… was…

****

একটি প্রকৃতি পর্যটন শিবিরের গল্প

সৌভিক তরফদার, স্টোর অ্যান্ড পারচেজ ইউনিট

সালটা ২০১১। সদ্য উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছি। এবার আমাদের তাঁবু পড়ল সামসিঙ বস্তিতে। পৌঁছে তাঁবু খাটিয়ে রান্নার বন্দোবস্ত করতে করতে রাত্রি হয়ে গেল।

পরদিন অর্থাৎ ঘটনার দিন ভোর বেলা থেকে শুরু হয়ে গেলো প্রস্তুতি। গন্তব্য খুব বেশি দূর নয়। মাত্র আট কিলোমিটার দূরে নেওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক অবস্থিত মৌচুকি বনবাংলো।

কিছু শুকনো খাবার, জল ও দুপুরের জন্য খিচুড়ি তৈরির উপকরণ ও বাসনপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ছয় বন্ধু। সাথে এক লোকাল গাইড। পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাত্রা শুরু হলো সকাল ৬টা ৩০ নাগাদ। ৯টা ৩০ নাগাদ প্রথম গ্রামের দেখা পেলাম। ৮-১০টি ঘর নিয়ে একটা গ্রাম। গ্রামে হলুদ ও ছোট এলাচ প্রচুর চাষ হচ্ছে। গ্রামে কোনো পুরুষ নেই। সকলেই কাজে বাইরে গেছে। ২-৩ মাস বাইরেই থাকে তারা। কাঠ কাটা, পশুপালন, চাষ আবাদ, রান্না সবই করেন মহিলারা। প্রচারবিহীন সত্যি কারের women empowerment। সেখানেই প্রাতরাশ সেরে এক বাড়িতে চা খেয়ে আবার এগোনো শুরু হলো।

চোখে পড়ল ফরেস্ট রেঞ্জারের অফিস। নাগরিক কোলাহল থেকে অনেক দূরে টালির ছাউনী দেওয়া ফুলে সুসজ্জিত অফিস। একটু এগিয়ে রাস্তা ভাগ হয়ে গেছে দুদিকে। একটি রাস্তা গেছে মৌচুকী বনবাংলো, অন্যটি গেছে নো-এন্ট্রি জোন কোর এরিয়া নেওরা ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক। যথারীতি গাইড দাদার বারণ সত্ত্বেও পাহারাহীন নো-এন্ট্রি জোনে ঢোকার লোভ সামলানো গেলো না।

ঘন্টাখানেক এগোতেই চোখে পড়ল রেড পাণ্ডা। একদম গাছের ওপরে গুঁড়ির সাথে মিশে গেছে। এত অতিথি দেখে বিরক্ত হয়ে একটু পরে নিজেই অদৃশ্য হয়ে গেলো। আমরা আবার এগোনো শুরু করলাম। একটু এগোতেই গাছের গায়ে শ্বাপদের নখের আঁচড় লক্ষ্য করা গেলো। সাথে সাথে গাইড দাদার পরামর্শে রাস্তা

পরিবর্তন। মৌচুকি পৌঁছালাম দুপুর ২টো নাগাদ। রান্না করে খেয়ে উঠতে উঠতে প্রায় ৪টে বেজে গেলো। পাহাড়ের শীতের সন্ধ্যা এগিয়ে আসছে। আমরা তাড়াতাড়ি করে নামার জন্য অন্য রাস্তা ধরলাম। প্রবল ঘন জঙ্গল। না, কোর এরিয়া নয়। ঝাঁটা গাছের জঙ্গল। নদীর পাড় দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে যখন উপত্যকা অঞ্চলে এসে দাঁড়ালাম তখন বিকেল শেষ হয়ে সন্ধ্যা নামছে।

বনবাংলো থেকে বেরোনোর পর এখনো গ্রামের দেখা পাইনি। হুড়মুড় করে হাঁটা লাগালাম গাইড দাদার দেখানো পথে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, যে করেই হোক রাতে ফিরতেই হবে। কারণ রাতে থাকার কোনো বন্দোবস্ত আমরা করে আসিনি। জঙ্গলের রাস্তায় ৭ জনের ৫টি টর্চ কাজে লাগিয়ে আমরা যখন আমাদের তাঁবুতে পৌঁছলাম তখন রাত প্রায় ৮টা। চা, মুড়ি, প্যারাসিটামল দিয়ে আমদের রাতের খাবার বন্দোবস্ত হলো। প্রবল শীতে ও ক্লান্তির মধ্যেও ক্যাম্প ফায়ার করা হলো। যথারীতি শেষ হলো "কবে তুমি ফিরা আসিবা বন্‌ধু" দিয়ে।

না, এটা আরেকটা গল্প! অন্য কোনো এক দিন।

****

জন্ম এবং মৃত্যু

শুভময় মৈত্র, এ.এস.ইউ.

"সম্প্রতি অকস্মাৎ আমার একটি বন্‌ধুর মৃত্যু হয়েছে। এই উপলক্ষে জগতে সকলের চেয়ে পরিচিত যে মৃত্যু তার সঙ্গে আর-একবার নূতন পরিচয় হল। জগৎটা গায়ের চামড়ার মতো আঁকড়ে ধরেছিল, মাঝখানে কোনো ফাঁক ছিল না। মৃত্যু যখন প্রত্যক্ষ হল তখন সেই জগৎটা যেন কিছু দূরে চলে গেল, আমার সঙ্গে আর যেন সে অত্যন্ত সংলগ্ন হয়ে রইল না।"

——— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিভিন্ন সময় মৃত্যুর ঘটনা বা দুর্ঘটনা নাড়িয়ে দিয়ে যায় আমাদের। এই লেখার সময় (অগাস্ট-সেপ্টেম্বর ২০২৪) যেমন কলকাতা শহর জুড়ে তিলোত্তমা বা অভয়াকে নিয়ে আলোচনা। আমাদের আত্মবিশ্বাসকে একেবারে কাঁপিয়ে দিয়েছে এই অস্বাভাবিক ঘটনা। মৃত্যু আসে বারবার, সময়ের সঙ্গে তা সয়েও যায়। অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে তা গোটা সমাজকে নাড়া দেয়। আর সাধারণভাবে মানুষটাকে মনে থেকে যায় খুব কাছের কিছু আত্মীয়-স্বজনের। বাকিদের কাছে বিষয়টা প্রতিদিন দাঁত মাজার মত। সকালের চোখ বোলানো সংবাদপত্র, কিংবা বিকেলের সিরিয়ালের ফাঁকে চটজলদি খবরের চ্যানেল। এর মাঝেই জাল দিয়ে দুভাগ করা ছোট্ট টেবিলে পিংপং বলের মত জীবন আর মৃত্যুর খবর। নিজের গায়ে ছ্যাঁকা না লাগলে পুরোটাই অন্য জগতের, টেবিলের অন্য পাশটার।

একটু তলিয়ে ভাবলে কিন্‌তু বিশ্বজুড়ে দুর্ঘটনায় কত মানুষ মারা যাচ্ছেন সে সংখ্যা চমকে ওঠার মত। এ দুনিয়ায় প্রতিদিন পথ দুর্ঘটনায় মারা যান তিন হাজারের বেশি মানুষ, আর তাদের আর্ধেকের বয়েস সাধারণভাবে ১৫ থেকে ৪৪ এর মধ্যে। শুধু আমাদের দেশেই প্রতিদিন পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা চারশোর ওপরে। সোজা হিসেবে নিজেকে আপনি প্রতিদিন মরতে দেখছেন না, অথবা নিজে মরার কথা ভাবছেন না একেবারেই। কিন্‌তু এদেশে প্রত্যেকটি দিন কমবেশি চারশো বাড়িতে কান্নার রোল।

অন্তর্জাল খুঁজে যা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে মার্কিন দেশে প্রতিদিন পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা একশোর কিছুটা বেশি। অঙ্কের তাতে অসুবিধে নেই, কারণ সহজ অনুপাত কষলেই বোঝা যায় ভারতের জনসংখ্যা মার্কিন দেশের থেকে যতটা বেশি তাতে ভারতে বেশি লোক মরার সম্ভাবনা বাড়বেই। আর্থসামাজিক প্রেক্ষিত আলোচনা করলে সঙ্গে আরও কয়েকটি বিষয় যোগ হবে। যেখানে খুব সহজেই অনুসিদ্ধান্তে আসা যাবে যে গরীব মানুষের জীবনের দাম কম। ঠিক সেই কারণেই বিহার বা উত্তরপ্রদেশে এনসেফেলাইটিসে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা সহজেই একশো ছাড়িয়ে যায়, যেমনটা ইউরোপ বা আমেরিকায় বছর বছর ঘটে না।

একথা তো মানতেই হবে যে মৃত্যুর সবথেকে বড় কারণ জন্ম। আপাতত বিজ্ঞানের যা অবস্থা তাতে জন্মালে মরতেই হবে। হয়ত বছর পঁচিশ পরে এমন সময় আসবে যখন যন্ত্রপাতি বসিয়ে অমর হওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে, তবে তার খরচ সাধারণ মানুষের নাগালে থাকবে না। অল্প কজন মানুষ সেই সুযোগ পাবেন। ঠিক যেমন কর্কট রোগ থাবা বসালে মার্কিন দেশে গিয়ে অনেক ভাল চিকিৎসা করানো যায়, জীবন লম্বা হয় অনেকটা। কিন্তু আমাদের দেশে ক্যানসার আক্রান্তদের মধ্যে বেশির ভাগেরই সঠিক চিকিৎসা করানোর, কিংবা বলা ভাল চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগই নেই। মার্কিন দেশ তাই স্বপ্নের চলছবিতে ঘুরঘুর করে। তবে জীবন বিজ্ঞানের প্রাথমিক স্তরের বিদ্যায় আপাতত এটুকু সহজবোধ্য যে নিজে কেঁদে ভূমিষ্ঠ হলে ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তার সঙ্গে খোদাই হয়ে যায়। তার পরের কোনো একটা সময় কেউ কাঁদুক বা না কাঁদুক, নশ্বর দেহ ত্যাগ করে পটল ক্ষেতে কাগতাড়ুয়া হতেই হবে।

বিষয়টায় সব থেকে মুশকিল হল এই যে, জন্ম আর মৃত্যু কোনোটাই মানুষের নিজের হাতে নেই। ভাটপাড়ায় গুলিবিদ্ধ ফুচকাওয়ালা তাই পুতিনের ছেলে না হওয়ার জন্যে বিধাতাকে দোষ দিতেই পারে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ি না থাকায় ভিড় মেট্রোয় কিংবা বনগাঁ লোকালে ফেরিওয়ালার মৃত্যু শেখায় পূর্ণ সংখ্যা থেকে ভগ্নাংশের অঙ্ক। সমান্তরাল লোহারেখার সারির মাঝে চাঁদের আলোয় চিকচিক করে সস্তার বয়াম-ভাঙা হিরের

টুকরো। সঙ্গে মণিমুক্তো লাল-নীল-সবুজ টাকায় দুটো আর গুণ ভুল করা দুটাকায় পাঁচটা চিনির মণ্ড। কাঁধে ঝোলা-বওয়া "চুষতে থাকুন" তখন আর কখনও না ফেরা হলুদ পাখি। গ্রুপ থিয়েটারের আঁতলামোর ফাঁকে নন্দন চত্বরে বেখাপ্পা হাওয়ায় যদৃচ্ছ উড়ে বেড়ায় পথ হারানো লিটল ম্যাগাজিনের পাতা। যেগুলো ছেঁড়েনি, যাদের ছেঁড়া হয়েছে ঝালমুড়িকে আস্তানা দেওয়ার জন্যে। সে পাতায় ভাসা মৃত্যুর গন্ধ মাখা দীর্ঘ কবিতার ছুটি নেই কোনো।

আসলে মৃত্যু তো বাড়বেই। এখনই এই গ্রহের জনসংখ্যা সাতশো কোটির বেশি। প্রতি বছর এগারোই জুলাই আসে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। নামী হোটেলে নৈশভোজের আসরে নড়েচড়ে বসেন বিশেষজ্ঞরা। জানা যায় দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় দরিদ্র পরিবারের সন্তানসন্ততির সংখ্যা চার থেকে পাঁচ। পাকিস্তানে এ সমস্যা প্রচণ্ড। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে গুরুগম্ভীর ইংরিজি আলোচনায় গাঢ় অক্ষরে লেখা হল একই অবস্থা নাকি বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ বা কাশ্মীরে। এ সমস্ত তথ্য অর্থনীতির পক্ষে ভীষণ বিপদের। বুঝতে অসুবিধে হয় না যে বিত্তশালীদের কমসংখ্যক ছেলেমেয়ে এবং নিম্নবিত্তদের বৃহৎ পরিবার অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং সামগ্রিক অসাম্যকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দেবে। উন্নত দেশে রাস্তা দিয়ে মানুষ হাঁটলে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে যায় চলমান যানবাহন। কলকাতার রাজপথে যীশু হেঁটে বেড়ায় অবলীলায়, বাস, ট্রাম, ট্যাক্সির সঙ্গী হয়ে। মানুষ বাড়লে এবং বিশেষ ভাবে নিম্নবিত্ত মানুষের সংখ্যা দ্রুতহারে বাড়তে থাকলে জীবনের দাম কমা ভাগের অঙ্কের মতই বাস্তব। সেজন্যে তো ব্যবস্থা নেবে সরকার। কাছের ভারতবর্ষই হোক কিংবা সুদূর সুদান, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সরকারের দায়িত্ব। সমর্থ সরকার সেই দায়িত্ব নেবে, জনপ্রিয়তা কমলেও। আর ভবিষ্যতের দায় যদি না থাকে তাহলে যেমন চলছে তেমনটাই চলুক। বিশ্বের জনসংখ্যা যতদিনে হাজার কোটি ছোঁবে, তার অনেক আগেই চিনকে হারিয়ে আমরা পৌঁছেছি প্রথম স্থানে। সঙ্গে থাকবে আশেপাশের অনুন্নত দেশের মানুষের চাপও। রাজনীতির কচকচিতে মিলেমিশে একাকার হবে শরণার্থী আর অনুপ্রবেশকারী। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাকে যে মানচিত্রের দেশভাঙ্গা রেখা

দিয়ে সমাধান করা যাবে না সে পাটিগণিত এখনও আত্মস্থ হয়নি বিশ্বের সেরা রাষ্ট্রনায়কদের।

তবে মৃত্যুর বাস্তবতা এবং নিশ্চয়তার সঙ্গে মনুষ্যত্বকে গুলিয়ে ফেললে খুব ভুল হবে। রাস্তায় ভিড়, পরিষেবা অপ্রতুল, পরিকাঠামো ঝরঝরে এসব কথা বলে মৃত্যুকে যৌক্তিক করার চেষ্টা বড়ই অমানবিক। যে মানুষটি আত্মহত্যা করেন, তার মৃত্যুকেও সম্মান জানানোর দায় থাকে এই সমাজের। মুহূর্তের অসতর্কতায় কেউ দুর্ঘটনায় মারা গেলে রাজনীতি হবে সেটাই স্বাভাবিক। কারণ রাজনীতির কারবারিদের এক বড় মূলধন মৃত্যু। তা বলে প্রয়াত সেই মানুষটিকে অসতর্কতার জন্যে দুষলে পৌরুষত্ব দেখানো যেতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে মননশীলতার মাথা মাছের বাজারে সস্তায় বিক্রি হবে। সেই প্রেক্ষিতেই টেলিভিশনে দৈনন্দিন মৃত্যু দেখে সাধারণ মানুষ অভ্যস্ত হয়ে গেলে মুশকিল। সরকারি হাসপাতালে কোনো এক রাতজাগা চিকিৎসক স্বপ্ন খুঁজে পান এক হতদরিদ্র শিশুর জীবন বাঁচানোর উল্লাসে। বাংলাদেশের এক জাহাজ ভর্তি মাল্লা আনন্দে গর্জন করে ওঠেন চারদিন সমুদ্রে ভাসা এ বঙ্গের এক জীবন্ত মাঝিকে উদ্ধার করে। রাস্তার মাঝে চিৎ হয়ে দিবানিদ্রায় মগ্ন বমি-মাখা মদ্যপকে মাথায় জল ঢেলে ফুটপাথে তুলে দেয় কোনো অজানা বন্ধু। তাই কার দায়, কোন রাজনীতি, নামী বেসরকারি হাসপাতালে কার ভুলে প্রসূতির মৃত্যু, মেট্রো রেলের কামরার ভেতর আর বাইরে ভাগ হওয়ার অসহায়তা, এসব মেনে নিয়েও কাজ করুক সামান্য সহমর্মিতা। একটু শিউরে উঠে ভাবা যাক অন্যের এই মৃত্যুটা নিজেরও হতে পারত। আর সেটা যে হয়নি সেখান থেকেই আর একবার জন্মাক প্রতিদিনকার জীবন। মৃত্যু থেকে মুখ ফিরিয়ে নয়, তাকে সামনা-সামনি রুখে দিয়ে—"জগৎটাকে গায়ের চামড়ার মত আঁকড়ে ধরে"।

****

বহুরূপী

সুচিত্রা বালামী, এ.সি.এম.ইউ.

মানুষ যে আজ বহুরূপীর মতো সাজছে কত সং
দেখাচ্ছে তারা মানবতা পোষণ করে দানবতা।
ক্ষণেক্ষণে তারা গিরগিটির মতো বদলাচ্ছে যে রং।

যার আছে ধন
সেই তো আপন
কাছে টেনে নেয় তাকে।
যেই জন হায়
খেতে নাহি পায়
দূরে ঠেলে দেয় তাকে।

জাতিতে জাতিতে ভেদাভেদ সব
মানুষে-মানুষে লড়াই,
দোষীরা আজ দোষ করে সব
করছে নিজের বড়াই।

গদির লোভে করছে লড়াই
মরছে শত শত,
মৃত্যু এখন তাদের নিকট,
পুতুল খেলার মতো।

পিতৃ দিবস মাতৃ দিবস
দিবস ঘরে-ঘরে

বৃদ্ধাশ্রমে পিতা মাতা
গুমরে গুমরে মরে।

ধর্ম নিয়ে বেচা কেনা
ধর্ম নিয়ে খুন
অধর্ম করেও তারা
গাইছে প্রভুর গুণ।

প্রতিবেশী কে কেমন আছে
নেয় না যারা খোঁজ ,
তারাই নাকি সমাজসেবক
করছে মিছিল রোজ।

শিশু পাচার নারী হত্যা
হত্যা মনুষত্বের,
মানুষরূপী দানবরা সব
বিরাজ এই মর্তে।

মুখোশ পরা মানুষগুলোকে
চিনতে পারি কই ?
এই সমাজে আমরা
সবাই এদের মাঝেই রই।

মানুষ যে আজ বহুরূপীর মতো সাজছে কত সং
দেখাচ্ছে তারা মানবতা পোষণ করে দানবতা,
ক্ষণেক্ষণে তারা গিরগিটির মতো বদলাচ্ছে যে রং।

****

The issue of Identity in Asian-American Diasporic Fiction with special reference to Bharati Mukherjee

Suman Rudra, Library

The beginning of European colonisation in the 19th century and the process of empire building in Asia and Africa brought with itself the problems of colonial exile and migration, both forced and unforced. Peoples across the Asian, African and Caribbean Diasporas have been ruthlessly dislocated and displaced from their native cultural roots and placed in an alien cultural and socio-political environment. Examining the themes of identity, displacement, race-relations, ethnicity, rootlessness and ultimately acceptance and assimilation, therefore, is the staple stuff of most fictions, novels and short stories alike, recounting the diasporic experience. So, in order to understand the dilemma of diasporasation, one has to understand the problematics of diasporic cultural identity.

Stuart Hall, in his wonderfully nuanced notion of identity, offers two related ways of thinking about identity in his essay "Cultural Identity and Diaspora". In the first place, Hall directs our attention to the indispensible role played in all anti-colonial struggles by a conception of "cultural identity" defined "in terms of one's shared culture, a sort of collective, one true self…….which people with a shared history and ancestry (of a colonial past) have in common". This, he adds, "continues to be a very powerful and creative force in emergent forms of representation amongst hitherto marginalised peoples."

In this context, it is best to begin with what Benita Parry says with regard to Stuart Hall's wonderfully nuanced notion of diaspora and diasporic cultural identity. "Cultural identity" according to Benita Parry, "is now perceived as multi-located and polysemic – a situation that

characterises post-coloniality and is at its most evident in the diasporic condition". How cultural identity impacts, defines and reformulates the diasporic condition, or conversely, how a diasporic condition redefines a person's identity is something that needs to be examined and anlysed.

Hall's second position on identity stresses that identities are not fixed but 'subject to the continuous "play" of history, culture and power'. From this perspective, identities are not 'grounded in a mere "recovery" of the past' but they 'are the names we give to the different ways we are positioned by, and position ourselves within, the narratives of the past'. By arguing for these two notions in the same register, Hall is able to suggest that the 'play of "difference" within identity' exceeds a binary structure of representations so that identities do not remain fixed in an essentialized past but change with place and time. Therefore, as Hall points out, it is from this second position only, which takes into account the idea of difference alongside similarity, 'that we can properly understand the traumatic character of "the colonial experience", the experience of exile and alienation, of dispersal and fragmentation'.

In all kinds of post-colonial diasporic literature, including American diasporic fiction, therefore, lies an inherent suggestion of the conflicts between the two kinds of diasporic identities. Stuart Hall puts forth 'identity as being', which offers a fictive sense of unity and communality, as opposed to 'identity as becoming', which reveals, instead, the discontinuity in the migrant identity formation. Hall was of course referring to the Afro-Caribbean, but his observations hold true for multi-ethnic and multi-cultural America as well.

South-Asian American writers in English are amongst the newest voices in a multi-cultural and multi-ethnic America. Writers of South-Asian origin are either first or second generation immigrants from India,

Pakistan, Sri Lanka or Bangladesh; some of whom have journeyed here via Kenya and Uganda, or Trinidad and Guyana, or Mexico and Canada. Bharati Mukherjee belongs to this tradition.

A first-generation immigrant who emigrated to the Unites States of America (USA) in 1980, Bharati Mukherjee might be considered as the quintessential immigrant-turned-citizen who now embraces being an "American citizen with a troubling and insistent fierceness". Born and raised in Calcutta, Mukherjee went to the United States in 1961 and then to Canada in 1966 where she met Clark Blaise, her future husband. Bharati Mukherjee lived in Canada from 1966-1980, where she was treated as an outsider and an expatriate, before emigrating to USA. Her personal essay discusses the advantages of moving from a racist Canada into the United States where she feels more racially liberated and culturally integrated. For her, the movement from racist Canada to multicultural America was like "a movement from the aloofness of expatriation to the exuberance of immigration". She became a naturalized American citizen (Green Card holder) in 1988, the year she published her best work 'Middleman', which won the National Books Critics Circle Award.

Mukherjee's adoption of an immigrant as opposed to an expatriate identity has been profoundly enabling for all her writings. In her own words, she has "joined imaginative forces with an anonymous; driven underclass of semi-assimilated Indians with sentimental attachments to a distant homeland but no real desire for permanent return". Further, Mukherjee does not see her "Indianness" as an isolated configuration that can only be at "home" with other Indian people scattered across the American diaspora : "instead of seeing my Indianness as a fragile identity to be preserved against obliteration (or worse, a 'visible' disfigurement to be hidden), I see it

now as a set of fluid identities to be celebrated." The present topic aims to assess Bharati Mukherjee's works in the light of her self-representation as an immigrant-turned-American by understanding the applicability of her characters to real life diasporists in the United States from a hybridized, post-national, de-territorialized context.

America is essentially a multicultural melting pot – a place where many cultures, identities, languages, religions and ethnicities interact with and influence each other. Though Bharati Mukherjee's diasporic identity has been gradually subsumed by her American identity, it is not necessarily unidirectional. In other words, acculturation and assimilation into the host culture, which has led to diasporists like Mukherjee becoming Americanized, had its own counter-cultural strains which has led to America becoming more globalized and universalized in the process.

She considers herself as an immigrant who has been Americanized and wishes to fall in line with the American canonical literary tradition, having adopted 'an American born sensibility'. "My stories are about conquest, not about loss", she says. She, however, ignores the existence of other immigrants , mainly illegals, refugees and working classes, and the complex issues of class, race, gender, hybridity and heterogeneity in relation to diasporic writings. In 'Middleman', however, she deals with such complex issues – how the illegal immigrants were made to work at the back of the kitchen, how a Tamil Sri Lankan almost ended up in jail in his attempt to realize a fruitless quest. She does not consider herself as a diasporic 'model minority' and with this view she has adopted an assimilationist narrative stance, though how far she has actually been integrated and assimilated into the mainstream culture is debatable.

Diaspora, as we know, is basically of two kinds – traditionalist and assimilationist. Traditionalist is the older Jewish sense of the diaspora, the

more pristine form which retains its separate identity and resists acculturation with the host culture. It always longs to return to its native roots. Assimilationist diaspora, on the other hand, is the newer form of diasporism. It adopts an assimilationist position and gradually merges with the mainstream culture of the host country, eventually ceasing to view itself as a diaspora. It is to this second category that Bharati Mukherjee belongs.

Bharati Mukherjee shows that it is the old hegemonistic notion of America as a land of limitless opportunities, inspired by the concept of the "American Dream", that is responsible for most of the migrations in the post 1950s. The novels of the first generation Asian-American women writers like Amy Tan's 'Joy Luck Club', Maxine Hong Kingston's 'Chinamen' and 'The Women Warriors' and Bharati Mukherjee's own 'Wife', 'Jasmine' and 'Holder of the World', all share common assimilatory themes. They all present the hegemonistic notion of America as a land of limitless opportunities. However, when the migrants reach there, they see that they are virtually caught 'in-between' two worlds and they can neither accept one nor reject the other. It is this 'in-betweenness' or the middle position of the diasporist; which Homi Bhabha has called the 'Third Space of Enunciation', the most problematic dialectic in the discourse of diasporism; that grabs Bharati Mukherjee's attention.

All her novels and stories deal with the problem of space in one way or the other. In 'Middleman' too, she is dealing with the problems of in-betweenness, or the middle position of the diasporic middleman. She is not so much showing the dark side of the American dream, but rather the consequences of the aspiration of working class immigrants from an Indian context. In conclusion, it can be said that Bharati Mukherjee is not so much a representative of the south Asian diasporic community in America, but

rather the champion of the very heterogeneity that diasporic culture brings with itself, creating a new identity for herself in the process which is neither diasporic nor American, but somewhere in-between.

****

বিশুদ্ধ গণিত ও যন্ত্রমেধা : এক নতুন মেলবন্ধনের গল্প

স্বাগতম দাস, ই.সি.এস.ইউ.

সারা দুনিয়াব্যাপী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এক মহাযজ্ঞের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা। স্যার রোনাল ফিশারের আমল থেকে উদ্বর্তিত হতে হতে তথ্য বা ডেটা তার নিরীহ ট্যাবুলার রূপটি হারিয়ে ফেলে হয়ে উঠেছে গণনাগতভাবে এক ভয়ঙ্কর জটিল, বহুমাত্রিক ব্যাপার। এখন ফেসবুকের প্রতিটি প্রোফাইল-ই এক এক টুকরো তথ্য, তার মধ্যে মিশে আছে লেখা, ছবি, ভিডিও এবং অন্যান্য সমমনস্ক বন্ধুদের সঙ্গে যোগসূত্র। রক্তমাংসের অস্তিত্ব নিয়ে এই পৃথিবীতে বসবাসের পাশাপাশি আমরা, অন্তত যারা স্মার্টফোন বা কম্পিউটার রোজ ব্যবহার করি, নিজেদের জানতে বা অজান্তে একটা সমান্তরাল তথ্যের দুনিয়ায় এক বিমূর্ত অস্তিত্বে অবস্থান করি। অনেক সংখ্যার জটিল বিন্যাসে সেখানে আমাদের অস্তিত্বগুলো চিহ্নিত থাকে। তথ্য যদি এই ডিজিটাল পৃথিবীর নতুন তেল হয়, তাহলে সেই তেল পুড়িয়ে চলা ইঞ্জিনটি হলো মানব স্নায়ুতন্ত্রের বেশ খানিকটা দুর্বল অনুকরণেই তৈরি কিছু জটিল এবং অনেক ক্ষেত্রে স্বনিয়ন্ত্রক কম্পিউটার প্রোগ্রাম, যাদের আমরা চিনি ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্ক হিসেবে, যারা আজকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের (সংক্ষেপে এ আই) সফলতম অধ্যায়টির নির্মাতা।

ইন্টারনেটে প্রতিনিয়ত যোগ হতে থাকা বিপুল তথ্যের সমুদ্র মন্থন করে এই প্রোগ্রামগুলো শিখে ফেলে বেশ কিছু নিয়ম। আর তারপর, সেই নিয়মের ভিত্তিতে তারা ড্রাইভার-বিহীন একটি গাড়িকে ব্যবহারকারীর নির্দেশ অনুযায়ী নিরাপদে পৌঁছে দিতে পারে তাঁর গন্তব্যে, পাইলট-বিহীন ছোট ছোট উড়োজাহাজ বা ড্রোনের সাহায্যে প্রাকৃতিকভাবে বিপর্যস্ত এলাকায় ত্রাণের কাজ চালাতে পারে কিংবা সীমান্তে চালাতে পারে নজরদারি, সুরক্ষিত করতে পারে আপনার অনলাইন লেনদেন প্রক্রিয়াকে, আপনার ফুসফুসের ডিজিটাল এক্স-রে পরীক্ষা করে বলে দিতে পারে আপনার ক্যান্সার হতে পারে কিনা, কিংবা স্রেফ আপনার মুখের কথাতেই বাড়ির আলো-পাখা থেকে স্মার্ট টিভি-সেটটিকেও

আপনার ইচ্ছে অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যেমন করে "এলেক্সা" বা "সিরি"-র মতো যান্ত্রিক সহকারীরা। বছর দশেক আগেও কম্পিউটারকে একটি প্রোগ্রামের মধ্যে পরপর নির্দেশাবলী সাজিয়ে দিয়ে একজন বাধ্য কেরানির মতো কাজ করিয়ে নেওয়াটাই দস্তুর ছিল। আজকের বুদ্ধিমান কম্পিউটার ক্রমশ কি করতে হবে সেটা বুঝে নিয়ে, নিজেরাই নিজেদের জন্য রাস্তা বার করছে বা প্রোগ্রাম লিখে নিচ্ছে।

মানব সভ্যতার করায়ত্ত গণনাশক্তিতে আর কুলোবে না, এবার কৃত্রিম মেধার এই ক্ষেত্রটি হয়ে পড়বে সম্পৃক্ত। এইসব ভেবে যেই আমরা ২০২১-২২ সাল নাগাদ একটু হাঁফ ছাড়ছি, অমনি বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমে হৈচৈ ফেলে ওপেন এআই এর মতো প্রথম সারির কোম্পানি বাজারে আনছে চ্যাটজিপিটি। বছর দশেক আগেও কম্পিউটারকে দিয়ে মনমতো কোনো কাজ করিয়ে নিতে গেলে আমাদের শিখতে হতো তার নিজের ভাষা। সি, সি-প্লাস-প্লাস, জাভা - এরকম সব অদ্ভুত নামের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে পরপর খুব সতর্কতার সাথে নির্দেশ সাজিয়ে না দিলে সে প্রায়শই 'কানের বদলে ধান' বুঝতো। আমজনতার হাতে কম্পিউটারের সাথে একেবারে আমাদের কথ্য ভাষায় না হলেও অন্তত সাধারণ ইংরিজিতে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার উপায়টি তুলে দিয়ে ২০২২-এর নভেম্বরে প্রযুক্তির জগতে সমস্ত আলোচনার কেন্দ্রে উঠে আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপেন এ. আই নামের সংস্থাটি। পক্ষে-বিপক্ষে নানা সমালোচনার মধ্যে দিয়েই ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রবল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সৃজনশীল যন্ত্রমেধা এবং চ্যাটজিপিটির নেপথ্যে থাকা জিপিটি আর তার সতীর্থরা - প্রযুক্তির ভাষায় যাদের পরিচিতি হলো বৃহৎ ভাষা প্রক্রিয়াকরণ মডেল বা এলএলএম হিসেবে। এক অবিশ্বাস্য রকমের অল্প সময়ে গবেষণা পত্রের ঠান্ডা জগৎ থেকে বেরিয়ে এলএলএম, জেন-এআই, জিরো-শট লার্নিং-এর মতো শব্দগুলো ঢুকে পড়েছে আমাদের বসার ঘরে, চায়ের আড্ডায়। মিডিয়া এবং আমজনতা কৃত্রিম মেধার এই দাপটকে অনেকটা কল্পবিজ্ঞানের আদলে দেখলেও আসলে প্রায়োগিক সাফল্যের নিরিখে ব্যাপারটা অনেকটা ঈশপের গল্পের সেই পাখিটাকে মনে করিয়ে দেয়। প্রচন্ড তেষ্টার মুখে

পাখিটা ঠোঁটে করে করে একটা একটা করে নুড়িপাথর এনে ফেলছিলো একটা লম্বা পাত্রের মধ্যে যার একদম নিচে রয়েছে কিছুটা জল। এইভাবে পাথর ফেলতে ফেলতে অনেকটা সময় পরে জল পাত্রের মুখের কাছে উঠে এলে সে পান করবে, এই ছিল তার আশা। এবার চিন্তা করুন পাখিটার কাছে যদি একটা লম্বা প্লাস্টিকের স্ট্র থাকতো তাহলে কি হতো। ঠোঁটে স্ট্র-এর ওপরটা ধরে পাত্রে ঢুকিয়ে কত সহজে সে মেটাতে পারতো তার তেষ্টা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অনেকটা এই স্ট্র-এর মতো। ফলিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যেমন কম্পিউটেশনাল ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রিতে এর প্রয়োগ অনেকটা যেন গ্যালিলিও গালিলেইয়ের হাতে একটা অত্যাধুনিক টেলিস্কোপ তুলে দেওয়ার মতো। ভাবতে শিহরণ হয় যে গ্যালিলিওর মতো মহাবিজ্ঞানী তাঁর সময়ে হাতে এইরকম একটা যন্ত্র পেলে মহাবিশ্বের কত রহস্য আরো কত আগেই উন্মোচিত হতো মানবজাতির সামনে।

কিন্তু এহ বাহ্য! মানুষের সাথে শানিত যুক্তিবোধের টক্করে কৃত্রিম মেধা কতটা এগিয়ে বা পিছিয়ে তার বিচার বিশ্বের অগ্রগণ্য বিজ্ঞানীদের অনেকেরই মতে তখনি সম্ভব যদি সে নেমে পড়ে বিশুদ্ধ গণিতের সমস্যা সমাধানের আঙিনায়, যদি শুধুমাত্র সংখ্যায় আবদ্ধ না থেকে তার বিচরণক্ষেত্রটি বিস্তৃত হয় বীজগাণিতিক চিহ্নভিত্তিক গণনার জগতেও। আর সেখানেই হবে তার অগ্নিপরীক্ষা। কৃত্রিম মেধা ও বিশুদ্ধ গণিত - দুই জগতেই এই নিরিখে ২০২৪ একটা মনে রাখার মতো বছর। এটি এমন একটা বছর যেটা এই দুটো পৃথিবীকে নিয়ে এসেছে অনেকটা কাছাকাছি। এবছরের জানুয়ারী মাসে, বিজ্ঞান দুনিয়ার অবিসংবাদী নেচার পত্রিকায় গুগল ডিপ মাইন্ডের যন্ত্রমেধা-বিশেষজ্ঞরা প্রকাশ করেছেন একটি গবেষণা পত্র যার মূল বিষয় এক বিশেষ কৃত্রিম মেধাতন্ত্র – আলফাজিওমেট্রি। আমরা জানি প্রাচীন গ্রীসের অলিম্পিক চেতনার প্রতিফলন হিসেবে, ইন্টারন্যাশনাল ম্যাথেমেটিক্যাল অলিম্পিয়াড হলো বিশ্বের উজ্জ্বলতম উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র গণিতজ্ঞদের একটি প্রতিযোগিতা। ২০২৪-এর এই প্রতিযোগিতা শুধু আমাদের নবীন প্রজন্মের গণিত মেধাকেই তুলে ধরেনি, এটি পরিণত হয়েছে সবচেয়ে উন্নত এআই

সিস্টেমগুলির জন্য যুক্তিবিন্যাসের ক্ষমতা পরীক্ষার একটি মঞ্চে। আলফাজিওমেট্রি এমন একটি এআই সিস্টেম যা জটিল জ্যামিতির সমস্যাগুলি সমাধান করে মানব অলিম্পিয়াড স্বর্ণপদক বিজয়ীর কাছাকাছি দক্ষতায়, এবং আজকের দিনে করে ইট্রিম মেধাতন্ত্রের এক বিরাট সাফল্যকে নির্দেশ করে। গত ২০ বছরের ম্যাথেমেটিক্যাল অলিম্পিয়াডের প্রশ্নপত্রগুলো থেকে বেছে নেওয়া ৩০টি জ্যামিতির সমস্যার একটি বেঞ্চমার্কিং পরীক্ষায়, আলফাজিওমেট্রি ২৫টি সমস্যা অলিম্পিয়াডের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমাধান করেছে। তুলনামূলকভাবে, পূর্বের সেরা এআই প্রযুক্তিভিত্তিক সিস্টেমটি মাত্র ১০টি জ্যামিতির সমস্যা সমাধান করতে পেরেছিল। সেখানেই একজন মানুষ স্বর্ণপদক বিজয়ী গড়ে ২৫.৯টি সমস্যা সমাধান করতে পারেন।

এআই সিস্টেমগুলো প্রায়ই জ্যামিতির জটিল সমস্যাগুলোর সামনে একটু বিপাকে পড়ে যায়। এর মূল কারণ হচ্ছে তাদের পর্যায়ক্রমে যুক্তি নির্মাণের দক্ষতার অভাব যার জন্য আবার দায়ী হচ্ছে পর্যাপ্ত উদাহরণমূলক তথ্য বা ট্রেনিং ডেটার বিরলতা। আলফাজিওমেট্রির সিস্টেমটি এখানেই অনন্য। এর এক দিকে রয়েছে একটি নিউরাল ভাষা মডেলের পূর্বাভাষ ক্ষমতা, আর অন্য দিকে একটি নিয়ম-ভিত্তিক ডিডাকশন ইঞ্জিন। এই দুটো মডিউল হাতে হাত রেখে খুঁজে ফেলে জটিল জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান। কারণ ভাষার মডেলগুলি ডেটাতে সাধারণ প্যাটার্ন এবং সম্পর্কগুলি চিহ্নিত করতে অত্যন্ত দক্ষ, তারা দ্রুত সম্ভাব্য কার্যকর গঠনগুলি পূর্বানুমান করতে পারেয যেমন একটি বিশেষ জ্যামিতিক প্রমাণের ক্ষেত্রে কি ধরণের কনস্ট্রাকশন বা অঙ্কন সবচেয়ে কার্যকরী হবে সেটা তারা দ্রুত বুঝে নিতে পারে। তবে তাদের প্রায়ই কঠোরভাবে যুক্তি করার বা তাদের সিদ্ধান্তগুলি ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা থাকে না। অন্য দিকে, প্রতীক-চিহ্ন ভিত্তিক ডিডাকশন ইঞ্জিনগুলি আনুষ্ঠানিক যুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং এরা স্পষ্ট নিয়ম ব্যবহার করে উপসংহারে পৌঁছায়। এরা যৌক্তিক এবং ব্যাখ্যাযোগ্য, কিন্তু একই সাথে ধীর এবং অনমনীয় হতে পারে,বিশেষ করে যখন তারা বড়, জটিল সমস্যাগুলির সাথে একা মোকাবিলা করে। আলফাজিওমেট্রির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকটি হল এর বিশাল পরিমাণে

সিন্থেটিক ট্রেনিং ডেটা তৈরি করার ক্ষমতা। কল্পনা করুন, ১০ কোটি অনন্য উদাহরণ তৈরি করা হয়েছে, যা ব্যবহার করে আমরা আলফাজিওমেট্রিকে কোনও মানুষ গণিতজ্ঞের হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রশিক্ষণ দিতে পারি। ডেটার সংকীর্ণতা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল!

আসলে বিশুদ্ধ গণিতের বিশ্লেষণে কম্পিউটারের প্রয়োগ মোটেই নতুন নয়। বিংশ শতাব্দীর গণিতজ্ঞরা যখন ২০০০ বছর ধরে প্রচলিত ইউক্লিডের অন্তর্দৃষ্টি ভিত্তিক ডিডাক্টিভ লজিকের রাস্তা থেকে একটু সরে ফর্মালিজমের রাস্তা ধরলেন, তখন গণিতের বেশ কয়েকটি কাঠামোকে সুনির্দিষ্ট প্রতীকী উপস্থাপনার মাধ্যমে যান্ত্রিক কিছু নিয়মে বেঁধে ফেলা সম্ভব হলো। এই আনুষ্ঠানিকীকরণ অবশেষে বিশুদ্ধ গণিতে কম্পিউটার প্রোগ্রামের ব্যবহারকে বাস্তবায়িত করেছিল। সেই পথে ১৯৭৬ সালে কম্পিউটেশনাল ব্রুট ফোর্স পদ্ধতি প্রয়াগ করে প্রমাণ করা প্রথম গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বটি ছিল বিখ্যাত ফোর-কালার থিওরেম,যা বলে যে চারটি রঙ যথেষ্ট একটি মানচিত্র পূরণ করতে যাতে দুটি সন্নিহিত অঞ্চল একই রঙের না হয়।

এরপর আরো বহুদূর হেঁটে এসেছি আমরা। ২০১৯ সালে, ক্রিশ্চিয়ান সেজেগেদি, যিনি আগে গুগলের বিজ্ঞানী ছিলেন এবং এখন বে-এরিয়ার একটি স্টার্ট-আপে কাজ করছেন, ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে একটি কম্পিউটার সিস্টেম আগামী দশকের মধ্যে সেরা মানব গণিতবিদদের সমাধান দক্ষতার সাথে মেলাতে বা অতিক্রম করতে পারবে। গত বছর তিনি লক্ষ্যমাত্রাটির তারিখ পরিবর্তন করে ২০২৬ করেছেন। বিশুদ্ধ গণিতের রহস্য সন্ধানে এআই-এর প্রয়োগ নিয়ে প্রত্যাশিতভাবেই আশা ও আশংকার দোলাচল এখনো থেকে গিয়েছে প্রথম সারির গণিতজ্ঞদের মধ্যে। কম্পিউটারকে কাজে লাগিয়ে সংখ্যার সমুদ্রমন্থন মানবমস্তিষ্ক সঞ্জাত গাণিতিক যুক্তিজালের সৌন্দর্যকে নষ্ট করে দেবে কিনা এই তর্কও চলছে। কিন্তু এঁরা কেউই বিশুদ্ধ গণিতের গবেষণায় এআই-এর সুদূরপ্রসারী প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারছেন না আজকের দিনে দাঁড়িয়ে। অক্ষয় ভেঙ্কটেশ, প্রিন্সটনের ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডির অগ্রগণ্য তরুণ গণিতবিদ এবং ২০১৮ সালের ফিল্ডস মেডেলের বিজয়ী, বর্তমানে গণিত

গবেষণায় এআই ব্যবহার করার ব্যাপারে তেমন আগ্রহী নন, কিন্তু তিনি এ নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী। "আমি চাই আমার ছাত্ররা বুঝতে পারুক যে তারা যে ক্ষেত্রে কাজ করছে তা অনেক পরিবর্তিত হতে চলেছে", তিনি গত বছর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন। সম্প্রতি তিনি যোগ করেছেন, "মানুষের বোঝাপড়া সমর্থন করার জন্য প্রযুক্তির চিন্তাশীল এবং সযত্ন ব্যবহার নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতনতা অপরিহার্য।"

২০২৪-এরই ফেব্রুয়ারিতে, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লস অ্যাঞ্জেলেস ক্যাম্পাসে অবস্থিত ইনস্টিটিউট ফর পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্সে অনুষ্ঠিত হয় গেলো "যন্ত্রমেধা-সহায়ক প্রমাণ" সম্পর্কে একটি কর্মশালা। এই ব্যতিক্রমী সমাবেশটিতে ভিড় করেছিলেন অনেক বিশুদ্ধ গণিতবিদ এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানী। আজকের পৃথিবীর সেরা একজন গণিতজ্ঞ এবং ২০০৬ সালের ফিল্ডস মেডেল বিজয়ী টেরেন্স টাও ছিলেন এই কর্মশালার একজন প্রধান সংগঠক।

গণিতের গবেষণায় এআই-এর ভূমিকা নিয়ে যখন এতো আলোচনা তখন এর উল্টোটাও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্ক ঠিক কীভাবে কাজ করে? কীভাবে সে অতিমাত্রিক ও জটিল ডেটার সমুদ্র থেকে খুঁজে পায় কিছু প্যাটার্ন বা নকশা? গবেষণা চলছে, কিন্তু স্পষ্ট উত্তর জানা নেই কারোরই। হিট ইঞ্জিন বাজারে আসার প্রায় ৫০ বছর পরে ক্লাউসিয়াস ও কেলভিনের মতো প্রথম সারির পদার্থবিদদের হাত ধরে তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রটি প্রণীত হয় এবং ইঞ্জিনের কার্যকারিতার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা মেলে। কিন্তু এই পঞ্চাশ বছরে ভারী শিল্পক্ষেত্রে ওই ইঞ্জিনের ব্যবহার রীতিমতো বিপ্লব এনে দিয়েছিলো। ডিপ লার্নিং-এর ব্যাপারটাও অনেকটা এরকম। এই সিস্টেমগুলোর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এই বিশুদ্ধ গণিতের প্রয়োগ ভবিষ্যতে অনেক রকম সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে। বৃহৎ ভাষা প্রক্রিয়াকরণ মডেল বা এলএলএম-এর মানুষী ভাষা বোঝার যে তাক লাগিয়ে দেওয়া ক্ষমতা, তার রহস্য বুঝে নিতে আজ গুগল ডিপমাইন্ডের বিজ্ঞানীরা বিশুদ্ধ গণিতের গবেষকদের সাথে হাত মিলিয়ে ক্যাটাগরি থিওরির মতো গণিতের অন্যতম

অ্যাবস্ট্রাক্ট একটি শাখা থেকে তুলে আনছেন নানা উপাত্ত। এই ধরণের গবেষণায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফান্ডিং-এর অভাব হচ্ছে না কোনো। কাজ চলছে দুনিয়া জুড়েই এটা আশার কথা। ভারতে এই ধরণের আধুনিক ও মিশ্র গবেষণার পরিসর তেমন নেই এখনো, এটা নিরাশার।

শেষ করি একটা ছোট্ট হিসেবে দেখিয়ে। দশমিক সংখ্যার ওপর প্রতি সেকেন্ডে কতগুলো যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের মতো গণনা করতে পারে তাই দিয়ে নির্ধারিত হয় বহু গবেষণা ও অর্থব্যয়ে তৈরী সুপারকম্পিউটারের গণনাশক্তি। প্রতি সেকেন্ডে এরকম একটি গণনাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে ১ ফ্লপ। জাপানের ফুগাকুর মতো প্রথম সারির সুপারকম্পিউটার একটি গোটা বহুতলের ব্যবহার্য বৈদ্যুতিক শক্তি খরচ করে ৪৪২ পেটাফ্লপ গণনা করতে পারে প্রতি সেকেন্ডে – যেখানে এক পেটাফ্লপ বোঝায় একের পিঠে ১৫টা শূন্য বসিয়ে পাওয়া একটা ধারণাতীত সংখ্যা। সেখানেই আমাদের মস্তিষ্কের বহুধাবিভক্ত কার্যকলাপকে একটা কম্পিউটারের মতো ভেবে নিলে, সেই কম্পিউটার একটা মাঝারি মানের বাল্ব জ্বালাতে যেটুকু বিদ্যুৎ লাগে তাই ব্যবহার করে প্রতি সেকেন্ডে আনুমানিক এক এক্সাফ্লপ গণনা করতে পারে। এই এক্সাফ্লপ হলো পেটাফ্লপের চেয়ে এক হাজার গুণ বড়ো একটা সংখ্যা। চ্যাটজিপিটির পেছনে নিয়োজিত গণনাশক্তি এর থেকে বলাবাহুল্য ঢের কম। আজকের কৃত্রিম মেধার গবেষণা কিন্তু মানব মস্তিষ্কের অনুকরণের পথে শিশুর পদক্ষেপে হলেও হাঁটা শুরু করেছে। আমাদের আশা স্নায়ুবিজ্ঞান এবং বিশুদ্ধ গণিতের হাত ধরে এই পদক্ষেপগুলো অদূর ভবিষ্যতে হয়ে উঠবে আরো অনেক মজবুত।

****

বৃত্ত

তন্ময় দাস, টি.এস.এম.ইউ.

তিতলির মা প্রায় রীতিমতো শাষানোর ভঙ্গিতে বলে গেল, শোনো, মেয়েকে নিয়ে ঠাকুর দেখতে যাচ্ছ যাও, কিন্তু সাবধানে। অমলবাবু আড়চোখে মায়ের পিছনে দাঁড়ানো তিতলির দিকে একবার দেখে নিল। সে একেবারে সেজেগুজে রেডি। ক্লাস ফোরে পড়া তিতলি এই প্রথম মাকে ছাড়া বাবার সাথে ঠাকুর দেখতে যাচ্ছে। মায়ের থেকে এইরকম একটা সম্মতি পেতে তিতলিকে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। বহু দিন অনেক উল্টো পাল্টা বায়না (যেমন দিনে পঞ্চাশটা অঙ্ক করা, সেদ্ধ সবজিগুলো জল দিয়ে গিলে খাওয়া, মোবাইল আর টিভির থেকে দূরে থাকা ইত্যাদি) সহ্য করে তবে এই সম্মতি পেয়েছে। ফলে তিতলি যে ওভার এক্সসাইটেড, সেটা বলাই বাহুল্য। অমলবাবু ভালো করে খেয়াল করলেন মেয়েকে। চোখে কাজল, কানে ঝোলা দুল, অপটু হাতে লাগানো ঠোঁটে লিপ্সটিক, কাঁধে ঝোলানো ভ্যানিটি ব্যাগ, পুজোর নতুন জামা, মাথায় হেয়ার ব্যান্ড। সে এক এলাহি কান্ড!

এদিকে তিতলির মা বলেই চলেছে, বাপ বেটি বেড়াতে যাবে। সকাল থেকে মেয়ের সাজের ঠেলায় আমি অস্থির। একবার বলে এই দাও, আবার বলে ওই দাও। যেই বলছি আমিও যাবো তোদের সাথে, অমনি মেয়ের মুখ হাঁড়ি।

একটু হলেও অমলবাবু আপত্তি করলেন, এইরকম একতরফা ফাঁকা মাঠে খেলতে দিলে পরে সামলানো মুশকিল, আরে, হ্যাঁ রে বাবা! আমার একটা দ্বায়িত্ব নেই! আমি ঠিক খেয়াল রাখবো! তা মেয়েকে তো সুন্দর করে সাজালে, কিন্তু বাবা কি ফেলনা নাকি? আমার জামা দাও!

ওষুধে কাজ হয়েছে। মুহূর্তেই সুতপা, মানে তিতলির মা, নতুন জামা নিয়ে হাজির। হাসতে হাসতে বললো, শোনো, ভয় আমার তোমাকে নিয়ে বেশি। দেখা গেল ঠাকুর দেখতে গিয়ে মেয়ে সিংহের লেজ খুঁজছে আর তুমি মহিষের লেজ। তুমি খেয়াল রাখবে যে মেয়ে কি খুঁজছে, আর নিজেও সেটাই খুঁজবে। ওকে হেল্প করবে। আলাদা করে নিজে অন্য কিছু খুঁজতে যাবে না।

অমলবাবু বুঝলেন বেশি কথা বাড়ালেই মুশকিল! অতএব শুভস্য শীঘ্রম! তিতলিকে বেরোতে বলে নিজে তাড়াতাড়ি গিয়ে রাস্তায় অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিতলি টলমল করতে করতে হাজির। বাবার দিকে তাকিয়ে আকর্ণ হেসে হাত বাড়িয়ে দিলো, আমার হাত ধরে থাকবে, মা বারবার বলে দিয়েছে, আমি যাতে হারিয়ে না যাই।

তুই যাতে হারিয়ে না যাস, সেটা তো তোকেই মনে রাখতে হবে। এমন টলমল করে হাঁটছিস কেন?

তিতলি বাবার মুখের দিকে না তাকিয়েই উত্তর দিলো, উফফ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। দেখছো তো নতুন হিল জুতোটা পরেছি। টলমল তো করবোই। আর আমি হারালে কিন্তু তুমি বেশি বকা খাবে আমার থেকে। ব্যাগ থেকে একটা কাগজ বার করে বাবাকে দিলো। এইটা দেখে নাও ভালো করে।

অমলবাবু চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার। মেয়ের হাতের লেখা ওনার চেনা। সব সময় হাত ধরে থাকবে, তাড়াতাড়ি আগে আগে হেঁটে যাওয়া যাবে না, ফুচকা, সিঙ্গারা, ঘুগনি, আইসক্রীম, আলুকাবলি, চিকেন রোল, এছাড়া যা যা খেতে চাইবো খাওয়াতে হবে। না বলা যাবে না। একটু অবাক হলেন, আজকালকার বাচ্চা কেক, পিজা, চাইনিজ ছেড়ে ঘুগনি, ঝালমুড়ি, ফুচকা খেতে চাইছে!

এরপর আর কিছু বলার থাকে না। অমলবাবু বুঝলেন সামনে সমূহ বিপদ। তবে মনে মনে বেশ মজা পাচ্ছেন, এটাও অনস্বীকার্য। কোনো রকমে মেয়ের হাত ধরে দশ মিনিটের রাস্তা কুড়ি মিনিট লাগিয়ে করুণাময়ী অটো স্ট্যান্ড পৌঁছলেন।

অটো ড্রাইভার আগেই জানালো যে উল্টোডাঙা ভাড়া কুড়ি থেকে বেড়ে চল্লিশ হয়েছে, পুজোর কয়েক দিনের জন্য। অটোতে পিছনের সিটে তিনজন। অমলবাবু খেয়াল করলেন মেয়ে এতক্ষণে হাত ছেড়েছে, আর চারিদিকের পুজোর আনন্দ চোখ দিয়েই যতটা সম্ভব লুটেপুটে নিতে চাইছে।

শোনো মা, আমরা প্রথমে উল্টোডাঙা থেকে আর একটা অটো করে হাতিবাগান চলে যাবো। তারপর হাতিবাগান সার্বজনীন, নলিন সরকার স্ট্রিট পুজো দেখে সোজা মুচিবাজার। ওখানে তেলেঙ্গাবাগান, যুববৃন্দ, করবাগান দেখে বাড়ি চলে আসবো।

তিতলি ভালো মেয়ের মতন ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলো, কিন্তু আমরা গৌরীবাড়ির ঠাকুর দেখবো না?

অমলবাবু বেশ অবাক হলেন, বাহ্, তুই কি করে জানলি ওই রাস্তায় গৌরীবাড়ি পড়ে, তবে তুই হাঁটতে পারলে সেটাও দেখবো।

মাঝে মাঝে কিছু অসময়ে বিপদ অমলবাবুর জীবনে এসেই যায়। ঠিক যেমন এখন। অটো ড্রাইভার উল্টোডাঙা নামিয়ে দিয়েছে ঠিকই, তবে বিপদ বাড়ছে। অমলবাবু মেয়ের হাত ধরে রয়েছেন আর এদিক ওদিক দেখছেন। চারিদিকে গিজগিজ করছে লোক, সবাই পুজোর আনন্দে মশগুল।

কী হয়েছে? তিতলি বাবার অসুবিধা আন্দাজ করেছে।

অমলবাবু অপরাধীর মতন মুখ করে আছেন, আমাকে একটু টয়লেট যেতে হবে।

তিতলি হাঁটা থামিয়ে দিলো, সেকি, তুমি টয়লেট করে আসোনি? মা যে বেরোবার আগে পইপই করে বলে দিলো।

ধুর, সে তো তোকে বলেছে। আমাকে তো বলেনি। যাই হোক, দাঁড়া, কিছু ব্যবস্থা করছি।

মেয়ে বাবাকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে বিধাননগর স্টেশনের সামনে সৌরভ'স-এ। ওই দ্যাখো, চাইনিজ সিঙ্গারা। আমি ওটা খাবো। তুমি আমাকে ভিতরে বসিয়ে দিয়ে টয়লেট করতে যাও। আমি খেতে খেতে চলে আসবে, দেরি করলে কিন্তু মাকে বলে দেব।

প্রস্তাব না করার মতন অবস্থায় অমলবাবু ছিলেন না। রাজি এতে হতেই হতো। তিতলি এবং চাইনিজ সিঙ্গারা, দুজনকে ফেলে রেখেই টয়লেট যেতে হলো।

এই তো ভালো লোক, তাড়াতাড়ি চলে এসেছো। চাইনিজ সিঙ্গারা ভালো লাগেনি আমার। আমি বাঙালি সিঙ্গারা খাবো।

অমলবাবু দেখলেন প্লেটে আধখাওয়া চাইনিজ সিঙ্গারা কেমন যেন অসহায়ের মতন তার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন ওকে না পছন্দ হওয়াতে খুব লজ্জিত। ইতিমধ্যে বাঙালি সিঙ্গারা এসে হাজির। তিতলির চোখে মুখে তৃপ্তির হাসি। মেয়ে খুশি মানে বাবাও খুশি।

দোকান থেকে বেরিয়েই তিতলি অদ্ভুত কান্ড করলো, বাবার হাত জড়িয়ে ধরলো, আমাকে কিন্তু দাদুর মতন করে ঠাকুর দেখাবে?

অমলবাবু চমকে উঠলেন, মানে?

তিতলি নির্বিকার, একমনে বলেই চলেছে, তোমাদের দুজন ভাই বোনকে দাদু যেমন ছোটবেলায় হাত ধরে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যেত আমি চাই তুমি আমায় সেভাবেই ঠাকুর দেখাও।

অমলবাবু খেয়াল করলেন চারদিক কেমন অস্পষ্ট হচ্ছে ওনার কাছে। উনি ঠিক দেখতে পাচ্ছেন একজনকে। সেই ঢোলা পায়জামা, সাদা পাঞ্জাবি, মুঠো করে সিগারেটে টান দেয়ার নিজস্ব স্টাইল, আর পাশে দাঁড়িয়ে রঙিন কাঠি আইসক্রিম খাওয়া ওনারা দুই ভাই বোন।

তিতলি অনর্গল কথা বলেই চলেছে আর হাঁটছে, তাড়াতাড়ি চলো, অনেক কিছু করতে হবে।

অমলবাবু সম্বিত ফিরে পেলেন, কী কী করতে হবে শুনি?

তিতলি বিরক্ত,তোমার বয়স হয়ে গেছে। সব ভুলে যাচ্ছো। কতগুলো ঠাকুর দেখবো, কত কিছু খাবো, সময় তো লাগবে নাকি!

অমলবাবু হেসে ফেললেন, ঠিক, ঠিক! তাড়াতাড়ি চলো মা। বলতে না বলতেই আবার চোখে পড়লো তাকে। রাস্তার উল্টোদিকে হাঁটছেন। ভালো করে খেয়াল করলেন, হ্যাঁ, ঠিকই দেখছেন! সেই পাঞ্জাবি, দুই হাতে শক্ত করে ধরা দুই ভাই বোন। মনে হচ্ছে পূর্ব জন্মের চেনা।

তিতলি যে হাত জড়িয়ে আছে সেটা প্রায় ভুলে মেরে দিলেন। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে সোজা রাস্তার উল্টো দিকে। যাক বাবা, এই তো ছিলেন এই দিকে, ভাইবোনগুলোই বা গেল কোথায়!

মেয়ের দিকে তাকালেন, মা, শক্ত করে হাত ধরে থাকো, ভিড় হবে।

এইটা কোথাকার ঠাকুর?

তেলেঙ্গাবাগান। জানিস মা, আমরা যখন এই সব জায়গায় ছোট বেলায় আসতাম তখন মণ্ডপের ভেতরে ঢুকলেই আমরা বাবার কোলে উঠে পড়তাম। বাবা একসাথে আমাদের দুই ভাই বোনকে কোলে নিয়ে ঠাকুর দেখাতো।

অমলবাবু বুঝলেন তিতলি হাত ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, আমি আর যাবো না।

সেকি রে! ঠাকুর দেখবি না?

দেখবো তো! but তোমার কোলে উঠে দেখবো।

এ বাবা! লোকে বলবে এত বড় মেয়ে কোলে উঠেছে।

আমি জানি না, হয় তুমি কোলে নাও নাহলে আমি আর যাবো না। তিতলি গোঁ ধরে আছে।

অমলবাবু মেয়েকে কোলে নিয়ে মণ্ডপে ঢুকলেন। মেয়ে বাবার গলা জড়িয়ে ঠাকুর দেখছে, বাবা, গণেশ আর তোমার ভুঁড়ি কিন্তু প্রায় কাছাকাছি। বি কেয়ারফুল!

ভালোই তো, বাড়িতে একটা জ্যান্ত গণেশ থাকলে তোর লাভ হবে! লাড্ডু খেতে পারবি যখন খুশি!

তিতলি বাবার নাক ধরে টেনে দিল,ভালো কি করে হলো! তুমি কি পুরো গণেশ নাকি! তাহলে ঐরকম কিউট শুঁড়, কান সেগুলেকেও লাগাতে হবে শরীরে।

মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে একটু হেঁটে মুচিবাজারের ভিড়! কর বাগানের ঠাকুর দেখার লাইন দিতেই তিতলি একজন ফুচকাওয়ালার সামনে।

মাঝবয়সী ফুচকাওয়ালা ভিড় সামলাতে ব্যস্ত। পাশে একটি বাচ্চা মেয়ে, পরনে আধ ময়লা জামা, দুটো বিনুনি, বড্ডো মায়াবী মুখ, আমরা যে ওকে খেয়াল করছি তাতে ওর বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। তিতলি মেয়েটির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, মুহূর্তেই বাচ্চা মেয়েটি শালপাতার বাটি এগিয়ে দিলো ওর হাতে । আমি তিতলির অস্বস্তি হওয়ার কারণ বুঝতে পারছি । এর আগে যতবার ফুচকা খেতে বায়না ধরেছে, মা বারণ করেছে। আজকে ও প্ল্যান করেই এসেছে ফুচকা খাবেই। আমি সম্মতি দিলাম। মাঝে মাঝে বেলাগাম হওয়ার মধ্যে যে অনির্বচনীয় আনন্দ থাকে তার থেকে ওকে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

ওরে বাবা কি ঝাল! চারটে কি পাঁচটা ফুচকা খেয়ে তিতলির চোখ দিয়ে জল ঝরছে, মুখ হাঁ করে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

কিরে, বলবি তো ঝাল আছে?

আমার ব্যাগে ভাগ্যিস জল আছে, বলেই ব্যাগ থেকে বের করে জল খেয়ে নিলো।

অমলবাবুর মজাই লাগছে,যাহ! কি হবে? তোর লিপস্টিক তো ধুয়ে গেল।

খুব মজা লাগছে না তোমার!কপট রাগে মেয়ে বলে উঠলো।

তিতলি ঝালের চোটে প্রায় লাফাচ্ছে। জল খেয়ে খুব একটা লাভ হয়নি। অমলবাবু চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিলেন, কাছেই "রাতুল সুইটস", ঠিক গৌরী বাড়ি ব্রিজ শুরুর মুখেই, ভালোই ভিড় আছে। আবার ওই ঢোলা পায়জামা পরা চেনা লোকটাকে ভিড়ের মধ্যে দেখতে পেলেন। মেয়েকে বললেন, তুই মিষ্টি খা, দেখবি কমে যাবে।

তিতলি রাজি হলো । ফুচকা দিচ্ছিলো যে বাচ্চা মেয়েটা তাকে বললো, আমার সাথে মিষ্টি খাবি, চলে আয়।

মেয়েটি প্রথমে একটু সময় নিলো, যাবো না! বাবা বকবে, ভিড় আছে।

অমলবাবু মেয়েকে বোঝালেন যে ও বললেই চলে আসবে না।

তিতলি শালপাতায় দুটো রসগোল্লা নিয়ে খাওয়া শুরু করেছে । অমলবাবু হঠাৎ শুনলেন কানের কাছে কে যেন ওনাকে ফিসফিস করে বললো, মেয়ে তো বাবার মতন দেখছি, মিষ্টি পাগল, তুই ওকে সরভাজা, চিত্রকূট এইসব খাওয়া, মজা পাবে।

অমলবাবু সটান পিছনে ঘুরলেন, কে আপনি? দেখলেন একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু ইনি আর যাই হোক উনি নন।

মেয়ে আপন মনে মিষ্টি খেয়েই চলেছে। কিরে, দুটো রসগোল্লা খেতে এত সময় লাগে?

তিতলি হাসছে। সেতো কখন পেটে চলে গেছে, আমাকে দাদু বললেন তুমি সরভাজা আর চিত্রকূট খাও, আমি তাই খাচ্ছি।

অমলবাবু জোরে বলে উঠলেন, কোথায় সেই দাদু?

তিতলি বাবাকে উত্তেজিত হতে দেখে অবাক হলো, উনি তো এইমাত্র এখানেই ছিলেন। আমি তো চিনি ওনাকে! চেনো মানে!

উনি তো মাঝে মাঝে আমার স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। আজকে সিঙ্গারা খাওয়ার সময় তুমি যখন টয়লেট গেলে উনিই তো আমাকে পাহারা দিলেন।

অমলবাবু এখনো খুঁজছেন তিতলির দাদুকে।

আমি কিন্তু ওর জন্য মিষ্টি নিয়ে যাবো।

কার জন্য? অমলবাবু বিরক্ত ভাবে বললেন।

ওই মেয়েটা, ও সবাইকে ধরে ধরে ঝাল খাওয়াচ্ছে আমি ওকে মিষ্টি খাওয়াবো।

অমলবাবু খুশি হলেন। শিশু মনের কাছে আমরা বড়োরা সত্যিই খুব নগণ্য, বলো, কী মিষ্টি ওকে খাওয়াতে চাও তুমি।

তিতলি আনন্দে লাফাচ্ছে। মনের খুশি মতন মিষ্টি নিল ওর জন্য। একগাল হেসে বললো, আমি দিয়ে আসি ওকে।

দূর থেকে অমলবাবু খেয়াল করলেন এক আশ্চর্য দৃশ্য। যে দান দাতা আর গ্রহীতার সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নির্ভেজাল ভালোবাসায় দুই শিশুর বন্ধুত্ব।

তিতলি ফিরে এলো যুদ্ধ জয়ের আনন্দ নিয়ে, চলো বাড়ি চলো। আজকে আর ঠাকুর দেখবো না।

কেন রে?

এই দ্যাখো, বলেই হাতে তুলে নিলো ওর নতুন কেনা হিল জুতো। অমলবাবু দেখলেন, সে বেচারার যারপরনাই খারাপ অবস্থা।

অতঃপর অটো করে সোজা করুণাময়ী। অমলবাবু হাঁটছেন, তিতলি হাঁটছে, কেউ কিছু বলছে না। তিতলির এক হাত বাবার হাত ধরে, আর এক হাতে জুতোজোড়া। খালি পায়ে হাঁটছে বলে হয়তো অস্বস্তি আছে কিন্তু অভিযোগ নেই।

অমলবাবু মেয়েকে বললেন, আইসক্রিম খাওয়া হলো না যে?

তুমি ভেবো না, ও আমি ঠিক খেয়ে নেবো। তারপর বাবার মুখের দিকে চেয়ে বললো, আজকে খুব জ্বালিয়েছি তোমায়, তাই না?

অমলবাবু নিরুত্তর।

তিতলিও ছাড়ার পাত্রী নয়, কী হলো! রেগে আছো আমার ওপর?

অমলবাবু মেয়েকে কোলে তুলে নিলেন, না রে মা!

তিতলি বাবার কোলে করে বাড়ির দরজায়, গলা জড়িয়ে বললো, থ্যাংক ইউ!

অমলবাবুও থ্যাংক ইউ বললেন মেয়েকে, তবে মনে মনে। এত অবলীলায় মেয়ে আজকে তাকে তার ছোটবেলায় ফিরিয়ে দিলো। অনেক বছর বাদে আবার কত বছর আগের পুজো ফিরে এলো।

জীবন সত্যি বৃত্তাকার!

****

Poems and Songs and Much More: Celebrating Womanhood

Soumyanetra Munshi, ERU

Not a Poem or a Song

Hamraaz

Yesterday, you asked me to write a poem
or a song about the women of Shaheen Bagh,
and I laughed and said,
that's not possible -
the women of Shaheen Bagh
are a poem *and* a song-
but last night as I drifted
off to sleep in my warm bed,
it came to me that I'd been wrong-
the women of Shaheen Bagh
are not a poem or a song,
they are *women* who have been sitting
for weeks, night and day, on a *road*—
in spite of cold wind and hard pavement,
in spite of the threat of lathis,
tear gas and jail—
they've been sitting because they won't stand
to see students beaten by police,
to see unjust laws divide the land—
because they are stubborn and right and strong-
and that, my friend, is more powerful and beautiful

than any poem or song anywhere.

Not just protesting women. All women - be it in their domestic spheres or in their occupational ambit - are not just poems and songs. They are certainly these - and much more. So Women's Day is not just 8th March but all days - because every day in our lives is shaped by innumerable contributions of all kinds of women.

On 8th March, internationally recognised as Women's Day, we at ISI, fondly remember and express our sincerest appreciation and acknowledgment for all such contributions of women by organising various kinds of events.

This year, on the lovely spring evening of 8th March 2024, we celebrated International Women's Day (IWD) 2024, in the Platinum Jubilee Auditorium (PJA) at the Kolkata Campus. Under the able directorship of Professor Sanghamitra Bandyopadhyay, ISI, has been ardently celebrating International Women's Day on or around 8th March for many years now.

As a prelude to the main event, several competitions are organised in the preceding weeks. This year we had organised three contests - a photography contest, a poetry and essay writing contest, and an art contest, as part of this year's IWD celebration.

The theme for this year's IWD was "Inspire Inclusion". Hence the writing contest was titled "Left Out: Tales of Women's Struggles for Inclusion". And this is how the call for submission read:

"In all spheres of life, women have been marginalised and relegated to the fringes and borders of mainstream dominance. Their voices have been

muffled, their protests choked, their complaints ignored, and their scars covered. Their very existence has been taken for granted wherever necessary, and simply forgotten whenever convenient. Often their outbursts and rebellion have been smothered under disgrace, dishonour, shame and fear. Their tears of pain and sighs of sorrow have been brushed away by the arrogance and high-handedness of the powers that be.

But we stand in solidarity with them — in spirit and thoughts. Let us bring to the fore these unforgettable tales of struggle that women have undertaken in all walks of life to get their voices heard and opinions counted. Their feelings shared and concerns cared for."

We received many submissions, in spite of midterm exams of the students that was going on even till the deadline. And needless to say, the judges had quite a hard time selecting a few as the winners. I was humbled, overwhelmed, touched and deeply moved by reading some of the pieces.

We are very glad, therefore, that we could come together with the Lekhon team, and are now able to share the winning entries for wider dissemination of their deeply-felt experiences. Here are the winning submissions for everyone to cherish and rejoice - to celebrate the creation that is more enduring and beautiful than all songs and poems - womanhood!

****

মূলস্রোত

কৌশিকী রায়, এস.আর.এফ., ই.আর.ইউ.

পুলিশের গাড়িটা হালদারবাড়ির দরজায় এসে থামলো। এবাড়ির সত্তর বছরের জীবনে এই প্রথম। ভেবে দেখলে অবশ্য এমনটা অনেক আগেই হতে পারত, আর অনেকবার হতে পারত, তবে হয়নি। এবার হল।

তা পুলিশ এল, সুজয় আর সুজয়ের বউকে জিজ্ঞেসও করল অনেক কিছু, রীতিমতো ভয়ে সিঁটিয়ে রইল দুজনে। ভয় তো হবারই কথা, তাই না? হচ্ছেও। আর ভয় যখন একটু কমছে তার জায়গা নিচ্ছে বিরক্তি। এত বয়সেও মা'র কোনো কাণ্ডজ্ঞান হল না! দু'দিন আগের সামান্য একটা ঘটনা, তার জন্য এতকিছু! হ্যাঁ, সুজয়রা ভালোই জানে যে ওই একটি ঘটনাই সবকিছুর জন্য দায়ী। পুলিশকে অবশ্য ওরা বলেনি সে কথা। কী দরকার ঝামেলা বাড়িয়ে! এমনিতেই যা অবস্থা!

সুজয় সুচরিতার একমাত্র সন্তান। বয়স? চল্লিশের কাছাকাছি তো হবেই। সেই তুলনায় সুচরিতার বয়সটাই যেন কম বেড়েছে। রিটায়ার করেছে বছর ঘুরতে চলল, বোঝাই যায় না। আজকের সুচরিতাকে দেখে বোঝাই যায় না কত বছর ধরে কত ওকে সামলাতে হয়েছে। নাকিহচ্ছে? নইলে এমন ঘটনা ঘটবে কেন!

তাও এত বছর পরে। আগে হলে- যেমন অনেক হয়েছেও- এক রকম তাও মেনে নেওয়া যেত। মেনে নিতেই হত। সে কি আজকের কথা! না মেনে তখন উপায় কী! দেখতে ভালো নয়, গায়ের রং কালো, বাপের টাকাকড়ি নেই- বিয়ে হয়েছে এই কত! তা ছেলে যেমনই হোক।

ছেলের বাড়ির লোক যেমনই হোক মেয়ের বাড়িসুদ্ধ সবাই সৌভাগ্যের ঠ্যালায় কী করবে বুঝতে পারত না। মেয়ে নিজেও না। তাই শুরুর দিনগুলোয় যে যাই বলুক মনে হত এ আর এমন কি! এমন তো শুরুতে সবাইকেই শুনতে হয়। আস্তে-আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।

সুচরিতাও কি কিছু কম শুনেছে? বাবা মা তো সেভাবে কিছুই দিতে পারেনি, ওপর-

ওপর অবশ্য সেসব কেউ বলত না, কিন্তু বুঝিয়ে দিত সবই। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত মেয়েটিকে গায়েগতরে খেটে মা-বাবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। ওর ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি। উপরি জুটে গিয়েছিল আরো অনেক কিছু।

কিছুদিনের মধ্যে ও নিজেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে ওর চিন্তা অনর্থক, কথা অসংলগ্ন এবং কাজ অপ্রয়োজনীয়। বিছানার চাদরের রং থেকে বিস্কুটের ব্র্যাণ্ড, ছেলের স্কুলে ভর্তি থেকে নিমণ্ত্রণের উপহার, সবকিছুতেই ওর ভূমিকা বাড়ির বিড়ালটির মত- সবার সামনেই বসে আছে অথচ কারোর খেয়াল পড়ছে না। যখনই ও কাজের লোক রেখেছে সে লোক চুরি করে পালিয়েছে, যতবার বরের শার্ট কিনেছে সেটা একবারের বেশি পরা যায়নি, যে ক'বার দোকানে গেছে দোকানদার বিশ্রীভাবে ঠকিয়েছে এবং শেষটায় মানিব্যাগ ছিনতাই হয়েছে।

এভাবেই চলছিল। বিয়ের আগের রীতিমতো মেধাবিনী ছাত্রী প্রায় নিজের নামখানাই ভুলতে বসেছিল। ততদিনে সে সুজয়ের মা হয়ে উঠেছে। তারপরই হঠাৎ সবকিছু বদলে গেল। সে বদল না হলে হয়তো আজও সুজয়ের মা বহাল তবিয়তে থাকত, আর হালদারবাড়িতে পুলিশ ঢুকত না।

সুজয়ের বাবা হঠাৎ চলে যাওয়ায় ও কি দুঃখ পেয়েছিল? পাড়াসুদ্ধ লোকে অবাক হয়ে দেখেছিল বউয়ের চোখে একফোঁটা জল নেই। চুপচাপ দেখেছিল বললে মিথ্যে বলা হবে।

তারপরই সুচরিতা বুঝল, পৃথিবী সত্যি ঘোরে। ভাত দেবার ভয়ে পুরনো চোখগুলো আড়ালে যেতে শুরু করল, সুচরিতা বুঝল আজ ওর কথাই শেষ কথা। বুঝল ছেড়ে দেবার আগেই যত ভয়, একবার কোনোক্রমে ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারলে আর ভয় নেই। সে ছাড়া সব সময় নিজে-নিজে ছেড়ে ওঠা যায় না, ভাগ্য ছাড়িয়ে না দিলে।

তারপর শুরু হল লড়াই। সুজয়ের তখন ক্লাস থ্রি। অনেক খুঁজে-পেতে একটা-দুটো করে টিউশনি শুরু হল- তখন টিউশনি পাওয়া এখনকার মত কঠিন ছিল না। তারপর এই চাকরিটা হল। চাকরি হতে

অনেকে অনেক কথা বলেছিল, মজা হচ্ছে সবার কথাগুলোই ছিল এক। সকলেই বলেছিল, ত্রিদিববাবুর জন্যই সুচরিতা চাকরিটা পেয়ে গেল। ত্রিদিববাবু তখন কাউন্সিলর, স্থানীয় স্কুলের নিয়োগে তার হাত থাকবে না! ভদ্রলোক আবার সুজয়ের পিতৃবন্ধু। তবে? নিশ্চয়ই ভিতরে কিছু গণ্ডগোল আছে।

এই নিয়ে ফিসফাস চলতে-চলতেই একদিন সুজয় ক্লাসে ফার্স্ট হতে শুরু করল। ফিসফাসকারীরা অবাক হয়ে দেখল, তাদের ফিসফাসের ফাঁক গলে সুচরিতা এবং সুজয়ের মা, দুজনেরই অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। বাইরে থেকে তেমন বোঝা যাওয়ার কথা নয়, সুচরিতা সেই আগের মতই প্রাইমারী সেকশনে অল্প মাইনের চাকরি করে আর দুবেলা তিন-চারটে পাড়া হেঁটে-হেঁটে টিউশনি করে, তবুও কোথাও যেন কিছু বদলে গেছে। মুখে বলা যায়না, চোখে ধরা পড়ে।

আজকাল শ্বশুরবাড়ির দিকের আত্মীয়রা রাস্তায় দেখা হলে দাঁড়িয়ে কথা বলে। কেউ হয়তো কোনোদিন এসে বলে, "কোনো দরকার হলে বোলো মা"। তা দরকার তো লেগেই আছে, কিন্তু তা নিয়ে সুচরিতা কাউকে ব্যস্ত করে না। যে বাড়ি থেকে একদিন বেরিয়ে যেতে হয়েছিল সে বাড়িতে ওকে মানুষ বলে মানলেই ও আর কিছু চায় না।

সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে ওর সব চাওয়াই পূর্ণ হয়েছে। ছেলে বড় হয়েছে, মানুষ হয়েছে, ছেলের বিয়েতে শ্বশুরবাড়ির দিকের সবাই এসেছে, কেউ-কেউ সুচরিতাকে বলেছে আবার সে বাড়িতে গিয়ে আরাম করে থাকতে- দেখতে গেলে সুচরিতার আর কিছুই পাওয়ার বাকি নেই। অন্তত থাকার কথা নয়। তাহলে বাড়িতে পুলিশ কেন?

ত্রিদিববাবুকে মনে আছে? দিনতিনেক আগে তিনি এবাড়িতে এসেছিলেন। আগেও এসেছেন কখনো-সখনো। এক সময় রাজনীতি করতেন বলেই হয়তো এখনো জনসংযোগের ঝোঁকটা রয়ে গেছে। প্রায়ই এর-ওর বাড়ি ঘুরে বেড়ান।

সুজয় বাড়িতেই ছিল, সুচরিতা ওকে দিয়ে শিঙারা-মিষ্টি আনিয়ে খাওয়ালো ভদ্রলোককে। চলে যাওয়ার পর সুজয়

বলল, "মা, একটা সত্যি কথা বলবে? সুজয়বাবু তোমার ঠিক কে হয়?" "মানে? কী বলতে চাইছিস তুই?" সুচরিতা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। "না মানে, আমি তোমার রেজাল্ট দেখেছি, এমন কিছু আহামরি নয়। তাই দিয়ে এত সহজে একটা চাকরি জোগাড় করা- তাই বলছি। এটা ঠিক আমার কথা নয়, অনেকেই বলে। আমি ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি"।

সুজয় বোধহয় আরো কিছু বলেছিল, সুচরিতা শুনতে পায়নি। ওর কান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মাথাটাও কি খারাপ হয়ে গিয়েছিল? জানা নেই। আমরা শুধু জানি যে পরদিন সকাল থেকে সুজয়ের মাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওরা পুলিশে খবর দিয়েছে, বিজ্ঞাপনও দিয়েছে, লাভ হয়নি। খোঁজ চলছে। আপনিও খুঁজতে পারেন। সুচরিতা হালদার, বয়স বছর পঁয়ষট্টি, গায়ের রং কালো, উচ্চতা মাঝারি, নিখোঁজ হবার সময় পরনে কী ছিল জানা নেই, তবে শেষবার তাকে সবুজ পাড় সাদা শাড়িতে দেখা গেছে। খুঁজে পেলে জানাবেন।

****

अधिकार और समावेश महिलाओं की जंग की कहानी

केशव सावर्ण

समावेशन ऐसा प्रयास है जिसमें सभी मनुष्य को मुख्यधारा में लाया जाए। परन्तु यदि हम विश्व के सभी देशों को देखे तो वहाँ पुरुषों और महिलाओं की आबादी लगभग समान है, यही किसी भी देश के संसद को देखे तो महिलाओं की संख्या अत्यंत कम है। यह उस देश के नीति-निर्माण में महिलाओं की स्थिति का प्रदर्शन करता है।

वैश्विक परिदृश्य को भी अगर हम देखते हैं तो हम महिलाओं को अपने प्राकृतिक, संवैधानिक, एवं समानता के अधिकार के लिए संघर्ष करते पाते है। समाज जिन्होंने अपने अंदर पितृसत्ता तथा पुरुष प्रधानता का चोला ओढ रखा है तथा केवल एक लिंग विशेष में जन्म लेने के कारण लोगों ने खुदको सर्वोच्च मान लिया। साथ ही साथ इस सर्वोच्चता को कायम रखने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रयास के द्वारा विभिन्न प्रथाओं जैसे- बुर्का प्रथा, पर्दा प्रथा आदि के माध्यम से ढोंग रचा।

हम अपने आसपास, सामान्य रूप से लोगों को गौरवान्वित स्वर में यह कहते हुए सुना है कि "हम अपने घर की लड़कियों को जो भी चाहे करने की आजादी देते हैं।" और यह कहते हुए वह पल भर भी नहीं सोचते की यह वाक्य हीं समाज में महिलाओं की स्थिति एवं उनकी सर्वोच्चता प्रदर्शन करता है। जहाँ महिलाओं को उनकी प्राकृतिक अधिकार (स्वतंत्रता) के लिए भी किसी और पर निर्भर होना परता है।

पूरे वैश्विक परिदृश्य में हमने देखा है कि जब भी महिलाओं ने इन सामाजिक बंधनों को तोड़कर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की तब-तब रुढीवादी लोग जो समाज की जड़ता के समर्थक है उन्होंने इन महिलाओं के लिए – बेहाया, चालू, चरित्रहीन जैसे विशेषण गढ़े।

महिलाओं का मुख्यधारा में जुड़ने के लिए उनके संघर्ष का एक व्यापक स्वरूप उनके कार्यस्थल पर भी देखने मिलता है, जहाँ उनके मेहनताना में भेदभाव किया जाता है, हमने कई बार विभिन्न इंटरव्यू में विभिन्न महिलाओं तथा बॉलीवुड सेलिब्रिटी को यह कहते हुए सुना है कि उन्हें पुरुष अभिनेता के मुकाबले 50% या उससे सी कम भुगतान किया जाता है जबकि पूरी प्रक्रिया में उनकी उनका भी वही योगदान

है। कॉरपोरेट सेक्टर में भी महिलाओं के वेतन में भेदभाव किया जाता है। कार्यस्थल पर कई बार महिलाओं के साथ यौन-शोषण आदि की भी समस्याएँ सामने आती है।

विभिन्न रूढ़ीवादी धार्मिक विचार को ग्रहण किया हुआ देश जैसे-अफगानिस्तान, साउदी अरब, ईरान आदि देशों में महिलाओं पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध आरोपित किए हुए है। मलाला युसूफ जब अफगानिस्तान में स्त्री शिक्षा की पक्षधार बनी तो उनके ऊपर बम से जानलेवा हमला हुआ। ईरान में आज भी महिलाएं अपने स्वतंत्रता जैसे मानवाधिकार के लिए संघर्षरत है तथा साउदी अरब में महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार नहीं है।

हाल ही में सर्वोच्य न्यायलय ने अपने एक निर्णय में कहा कि घरेलू कार्यों का भी उतना ही महत्त्व है जितना बाहर काम कर वेतन प्राप्त करने वालों का महत्व है। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि सदियों से महिलाओं द्वारा किए जा रहे घरेलू काम को समाज ने महत्वपूर्ण माना ही नहीं।

आज भी महिलाओं के साथ यौन हिंसा, घरेलू हिंसा हो रहा है। महिलाएँ आज भी घरेलू हिंसा को चुपचाय सह रही है, इसका कारण मुख्य रूप में दूसरे पर उनकी आर्थिक निर्भरता है। क्योंकि बेटी पराई धन होती है कहकर अक्सर लड़कियों को उच्च शिक्षा तथा व्यवसायिक शिक्षा से माँ-बाप द्वारा वंचित कर दिया जाता है तथा विवाह के बाद उनकी निर्भरता उनके पति पर होती है परिणामस्वरूप वह अत्याचार सहने पर विवश हो जाती है।

यदि कोई स्त्री इस अत्याचार के खिलाफ आवाज भी उढाना चाहे तो समाज द्वारा विभिन्न प्रकार के भय तथा भविष्य के विभिन्न प्रकार का डर दिखाकर उनके आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। इन तमाम समस्याओं के बावजूद महिलाओं ने संघर्ष का दामन नहीं छोड़ा, उन्होंने निरंतर अपने हक के लिए अपनी आवाज बुलंद की तथा कई सारी कुर्बानियाँ दी। इस मुहिम में सावित्री बाई फूले, रमा बाई जैसी समाज सुधारकों ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया क्योंकि वह जानती थी शिक्षा उन्हें स्वावलंनी तथा अपने अधिकार के प्रति संघर्ष करने का साहस देगा। इसके परिणामस्वरूप आज हम प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति के पद तक, सेना से लेकर कॉपरेट तक महिलाओं को पाते है।

समाज की कोई भी भावना हो, उसे सबसे बेहतर तरिके से अगर किसी ने प्रस्तुत किया है तो वह महिलाएँ है। इसलिए हम पुरुष को अपने अंदर "स्त्रीत्व" की भावना जाग्रत करनी चाहिए ताकि यह समाज समवेशन को सार्थक कर सका।

अंतत: "राम मनोहर लोहिया" का कथन है कि – इस देश बने में स्त्रीयों का आदर्श सावित्री या सीता नहीं बल्कि द्रौपदी होनी चाहिए जो कभी पुरुषों के सामने दिमागी हार नही खाई। महिलाओं को अपनी आजादी और गरिमा चाहिए, नैतिकता का पाठ या देवी का दर्जा नहीं। अंत में कैफ़ी आजमी साहब के रचना "औरत" की चंद पक्तियाँ:

"उठ मिरी जान मेरे साथ ही चलता है तुझे
तू फ़लातून ओ अरस्तू है तू जहरा परवीं
तेरे क़ब्ज़े में है गर्दूं तिरी ठोकर में जमीं
हाँ उठा जल्द उठा पा-ए-मुक़धर से जबीं
मैं भी रुकने का नहीं वक़्त भी रुकने का नहीं
लड़खड़ाएगी कहाँ तक कि सँभलना है तुझे
उठ मिरी जान मिरे साथ ही चलना है तुझे "

****

Juggling Responsibilities and Shaping the Society: A Tribute to All Working Mothers and A Call for Societal Change.

Neelarka Roy, MSQE

It's 6:00AM in the morning. No sooner did the alarm ring in Mrs. Verma's phone than she put it off. Her husband and children had complained the other day that their sleep was being disturbed because of her loud alarm.

Mrs. Verma actually had no other choice but to set a loud alarm. Of late she has been suffering from knee and back pain. Every morning, there is a duel between her body and her mind, with her body ravenously demanding a bit more rest and sleep, and her mind reminding her that she has to cook breakfast and pack tiffin for her husband and children, and most importantly, that there is nobody else to do the same. Hence, as a way to stop this duel and get the body to work for another long and tiring day, a loud alarm works just fine.

Mrs. Verma wakes up and gets to work. After making the necessary arrangements, she sits in front of her laptop to go through the presentation she has to deliver today in front of 10 high profile investors who will be coming from the USA. She goes through her presentation that she had to work upon till 1AM the previous night while not for once forgetting to count the number of whistles made by the pressure cooker.

Around an hour later, after food has been prepared, her husband and children wake up. They take a bath, have breakfast while grumbling that the food tasted less than what they had expected, get ready and leave.

Mrs. Verma has no time to rest. She has to reach her office by 9AM. She too gets ready quickly, packs her bag, and leaves.

At her office, hardly had she settled down at her desk when she is called upon by her boss to make the presentation. As she entered the conference room, she could sense 10 pairs of eyes gazing rather weirdly at her. In all probability, they had not expected a woman in her mid-40s, a mother of two, and someone who only

until a few hours ago was busy cooking food, to deliver such an important presentation.

Mrs. Verma delivered the presentation to the best of her ability. Questions, and counter-questions were thrown at her, all of which she felt she could answer correctly and confidently. After the tiring job got over, she realised she was hungry. She had to eat, make a phone call to her home to the maid to enquire whether her children have returned home safely from school in time, and then complete her remaining task of the day.

She heads for the office canteen, where food is prepared with proportions of salt, sugar and oil which are often not in sync with each other. Employees, however, mostly eat without complaining because searching for better food outside is something their crunch schedule cannot afford, and also because the prices of food items in the canteen are lower than those in food outlets outside.

As Mrs. Verma orders her food, she tries to recall the last time she had brought food cooked at home to her workplace. It was back in her pre-marriage days that her late mother used to cook and pack her lunch lovingly. Post-marriage, she was allowed to continue with her job on the condition that the entire responsibility of cooking breakfast and dinner for the family would be bestowed upon her shoulders. Her in-laws are fundamentally against the idea of hiring a cook. According to them, it's the duty of the women of the family to cook and do other household jobs as much as possible.

Pondering over the past is something Mrs. Verma can't afford to do for long. She takes her meal and returns to her desk without wasting a second. She then makes a phone call to her home, learns that her children have reached home safely from school in time, heaves a sigh of relief, and gets engrossed in her work.

It's 5:30PM now by the clock. Mrs. Verma felt that she should leave a bit early (the official working hours being till 6PM) so that she could take some rest before cooking dinner at home. As she was about to leave, she could see her boss, Mr. Poonawallah, apparently not in the best of moods, approaching towards her."Mrs.

Verma, can you just stay back for an hour longer, and prepare a nice Excel file of the data that Ihave mailed to you? It's urgent, I have to submit it to the higher authorities by the end of the day."

Mrs. Verma unconsciously nods her head with a sigh. Saying 'no' is something that needs to be taught from early childhood, and a vast majority of women are not taught the same. After all, how can a woman say 'no'? According to societal definitions, a 'good' woman with 'proper' upbringing is someone who adjusts according to the whims of her surrounding people, and always remains at the beck and call of seniors and superiors, both at work and at home.

As she was logging into her email, Mr. Poonawallah walked a few steps before turning back towards Mrs.Verma, and said," By the way, Mrs. Verma, today's presentation of yours was probably not the best of presentations our company has made before investors. We had expected at least 6 of them to invest in our company, and only 4 of them have agreed. We do not want to let go prospective investors henceforth. Hence, there won't be any room for slip-ups from here on."

Saying so, Mr. Poonawallah gives a wry smile and leaves. Mrs. Verma lets out another sigh and getsbusy with her work.

Thus is a quintessential day in the life of thousands of working mothers like Mrs.Verma who contribute to the country's GDP, lead to the empowerment of women in the society, positively influence people around(after all, there is hardly a better way to observe and imbibe the qualities of resilience, dutifulness, dedication, perseverance, and love than to watch closely the life of a working mother), as well as raise a generation of citizens, who, unless heavily influenced otherwise, will be more empathetic towards women and the problems faced by them, having seen the struggles of their mothers first-hand.

However, we, as a society, still have a long way to go in being satisfactorily accommodative of the needs of working mothers, and addressing the day-to-day problems, stress and immense pressure faced by them. Sharing household responsibilities is the least we all can do to

ease the lives of working mothers. Apart from that, however, the responsibility to look into their welfare lies on the Government, CEOs, and people occupying positions of authority as well. In the intense race for more and more materialistic achievements and economic prosperity, calls by billionaires and CEOs for a 70- hour workweek do not make the future look very promising. While reports saying that Indian employees are among the least productive in the world garner all the attention, reports to which most of our eyes are shut include the likes of the one made by the office commute platform MoveInS ync which says that Indians spend more than 7% of their day in commuting to office, one of the highest in the world, another by the National Library of Medicine which says that 32.9% of married, working women in Bhubaneshwar, Odisha suffer from chronic depression and only about 10% of them sought professional help, and yet another titled "Predicament of Returning Mothers" by Ashoka University in 2018 which stated that a staggering 73% of working women in India leave their jobs after giving birth to a child, and among the ones who return afterward,48% leave their jobs within 4 months.

A society can't claim itself to be a modern and progressive society if a substantial portion of its working women are forced to opt out of the labour force after giving birth to a child, and the ones who remain have to undergo undue stress, pressure and resulting physical and mental health issues. As India embarks on its vision to become a 5 trillion dollar economy within the next few years and marches ahead in the quest for economic prosperity and gaining greater global power and recognition, we as citizens do count on our Government, CEOs, and other people occupying positions of authority to ensure that the holistic well-being of one and all, especially of working mothers, who play such a pivotal role in the overall development of the society, is duly taken care of.

****

তোমাকে দেখেছি যেমন

সত্যজিৎ নস্কর, অ্যাকাউন্টস সেকশন

সাত সকালে তাঁতের শাড়ী স্কুলের দিদিমনি
নরম আঙুল কুঁচি ধরে আজন্ম কৈশোর।
কোনের ঘরে সাদা কালো শনিবারের ছবি
নীল খামেতে সুখেই আছে সবকটা অক্ষর।
গহীন ছায়া নতুন নারী
ভালোবাসা আলো বদল।
এখন শাড়ী রেশমী সুতো
আদুরে আলো কোলাহল।
খবর আমি দিতেই পারি
রিক্সা এলে মেঠো পথে।
এখন মেয়ে স্কুটার নীল
শহর জোড়া গাড়ীর সাথে।
খুন্তি নাড়ে বাংলা-ভাষা ভাতের গন্ধ মুগের ডাল
সময় এখন তপ্ত হয় খুনসুটিতে টাল মাটাল।
বারোজনের সংসারে মা টুকরো মাছ পড়লো কি?
সারাদিনের হাঙর খিদে মেয়ের পক্ষে ভালো নাকি!
শিরদাড়াঁটি ছুঁয়ে গেলে পাঁজর ফুঁড়ে শব্দ ঘোর
একা মেয়ে শহর আসে হেলান দিয়ে ট্রেনের ভোর।
শহর তখন সারি সারি সবুজ গাছ সবুজ গাছ
সারাদিন চাকরি মানেই মিষ্টি মেয়ে সর্বনাশ!
ঘরে ফেরা নিশুত রাতে একটা যদি নরম বালিশ!
কোল বেছানো সুখের হদিস বলতে পারিস বলতে পারিস?

****

Silenced Wings: Echoes of Women's Struggles

Sevantee Basu, B.Stat III year

She, denied the light of equal birth
where brothers thrive in unfair demands,
yearning for wisdom, freedom, and mirth
lived a childhood marred by biased hands.

She, forced to wed in tender bloom,
whose dreams were shadowed by the Darth of gloom;
In the streets, she who fell prey to vilest sin,
left with scars wrenching her heart, soul, and skin!

She, who screamed in flames beside her husband's pyre
Her life's worth, denied by the Society's desire!
Violence and abuse, a constant within
left alone battering, hopes wearing thin.

In the workplace, where discrimination stung,
Unequal pay, harassment, undue advantages sung
Crossing education barriers, independence she sought,
Single-handed her children she brought.

Underrepresented, in all phases of life
A neglected daughter to an unappreciated wife;
In all trials set by resilience's art,
She prayed for ears to heed her heart.

Today, She, the writer of this plea still keen;
Wonders why the disparity persists, unseen.
And in her words a chorus rings;
Echoes of women's silenced wings!

****

ফটোগ্রাফি ও কৃত্রিম বুদ্ধি: সৃজনশীলতার ভবিষ্যৎ

তাপস বসু
রিপ্রো ফোটো ইউনিট,লাইব্রেরী

ফটোগ্রাফির মতো প্রগতিশীল ও পরিবর্তনশীল ক্ষেত্র খুবই বিরল। আমার মত যারা মধ্য পঞ্চাশে পৌঁছে বছরের পর বছর ধরে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত আছেন, তারা অবশ্যই এর ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনশীলতাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। শুধু তারাই নয়, বর্তমান প্রজন্মের নবীন ফটোগ্রাফাররাও এই পরিবর্তনের স্রোতে নিজেদের অবিচ্ছিন্নভাবে মিশিয়ে চলেছেন।

আজকের আলোচনার মূল বিষয় হলো ফটোগ্রাফিতে কৃত্রিম-বুদ্ধির (আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এ.আই."AI"-এর) প্রভাব। AI কি প্রকৃত ফটোগ্রাফির সমাপ্তি ঘটাচ্ছে, নাকি এটি এক আশীর্বাদ হিসেবে উদ্ভাসিত হচ্ছে? এই প্রশ্নটি এখন ফটোগ্রাফি সমাজকে দ্বিধাগ্রস্ত করছে। একজন সাধারণ ফটোগ্রাফির শিক্ষার্থী হিসেবে আমার মতামত প্রকাশের আগে চলুন ইতিহাসের দিকে একটু নজর দিই।

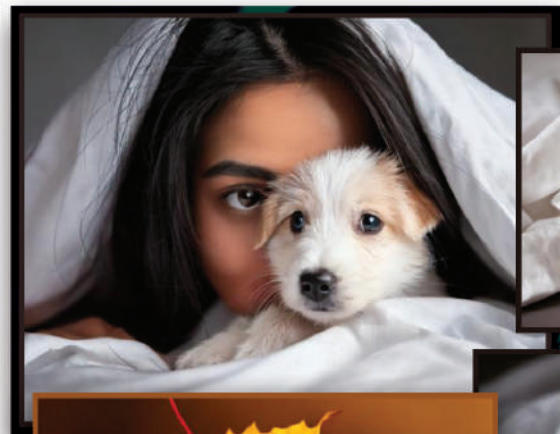
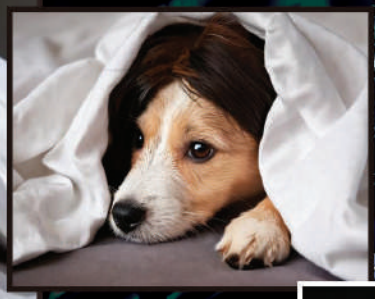

ফটোগ্রাফির যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৮২৬ সালে "নিপ্স(Niépce)"-এর হাত ধরে। সেই সময় থেকে ক্যামেরা ও প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে বহু পরিবর্তন এসেছে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছর গুলোতে। আমি বিশ্বাস করি, ফটোগ্রাফি কেবল ক্যামেরার কারিগরি নয়, বরং সঠিকভাবে ছবি তোলা ও প্রক্রিয়াকরণ করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ফটোগ্রাফির প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে। কয়েক বছর আগেও সাদাকালো প্রিন্ট আর ডার্করুম ছিল একমাত্র উপায়। আজ সেই ডার্করুম ডিজিটালে রূপান্তরিত হয়েছে, আর কেমিক্যালের প্রয়োজনীয়তা অনেকটাই কমে গেছে। ক্যামেরার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। ফিল্ম ক্যামেরা থেকে SLR, ডিজিটাল কম্প্যাক্ট থেকে DSLR এবং মিররলেস ক্যামেরা পর্যন্ত ফটোগ্রাফি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে। এখন ক্যামেরার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধি(AI)।

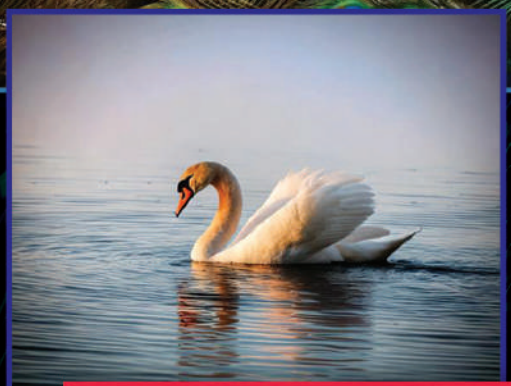

AI কি এবং এটি কীভাবে ফটোগ্রাফিতে প্রভাব ফেলে? সহজ ভাষায়, AI হলো যান্ত্রিক বুদ্ধি, যা যন্ত্রকে মানুষের মতো চিন্তা করতে শেখায়। ফটোগ্রাফিতে AI মূলত দুটি ক্ষেত্রে কাজ করে, ১)"ক্যামেরা-প্রযুক্তি" ও ২)"প্রক্রিয়াকরণ"।

প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে AI সফটওয়্যার বিশ্লেষণ করে এবং ছবির ত্রুটি যেমন শার্পনেসের অভাব, ফোকাসিং সমস্যা বা কম আলোতে অতিরিক্ত গ্রেন দূর করে। AI এমনকি জেনারেটিভ ফিলের মতো প্রযুক্তি দিয়ে ছবির ঘাটতি পূরণ করে নিখুঁত ছবি তৈরি করতে সক্ষম।

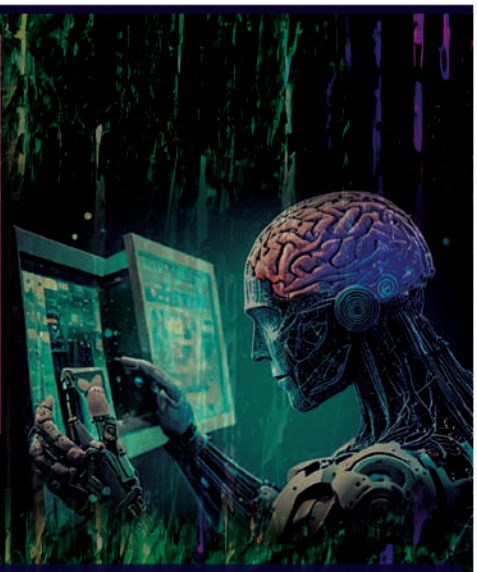

ক্যামেরায় AI চিপ যুক্ত হওয়ার ফলে ক্যামেরা নিজেই বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে পারে, যেমন চোখ বা মুখ। এতে ছবি হয় আরও নিখুঁত ও নির্ভুল।

আমি অ্যানালগ যুগ থেকে ফটোগ্রাফির যাত্রা শুরু করেছি। তাই প্রশ্ন আসতে পারে, এই AI কি ফটোগ্রাফিকে সত্যিই ভালো দিকে নিয়ে যাচ্ছে? আমার মতে, AI প্রযুক্তি আমাদের আরও নিখুঁত ছবি তোলার সুযোগ করে দিয়েছে। যখন আমরা ক্যামেরায় অটোফোকাসকে গ্রহণ করেছি, তখন AI ফোকাসকেও স্বাগত জানানো উচিত।

অনেকে মনে করেন AI ফটোগ্রাফারের সৃজনশীলতাকে কমিয়ে দেবে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি ফটোগ্রাফারের সৃজনশীলতা সবসময়ই মূল চালিকাশক্তি হয়ে থাকবে। AI ফটোগ্রাফারকে সাহায্য করবে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করবে না।

AI প্রযুক্তি ফটোগ্রাফিকে আরও সহজ করে তুলছে। ভবিষ্যতে লেন্সবিহীন ক্যামেরার মাধ্যমে AI সম্পূর্ণভাবে ফটোগ্রাফির নতুন যুগের সূচনা করতে চলেছে। প্রযুক্তির সঙ্গে আমাদের সৃজনশীলতাকে একত্রিত করে আমরা ফটোগ্রাফির আরও উন্নততর দিগন্তে পৌঁছাতে পারব।

ফটোগ্রাফি হলো বিজ্ঞান ও শিল্পের এক অনন্য মেলবন্ধন। প্রযুক্তিকে সঙ্গে নিয়ে শিল্পকে আরো বেশি করে বিকশিত করা আমাদের সময়ের দাবি।

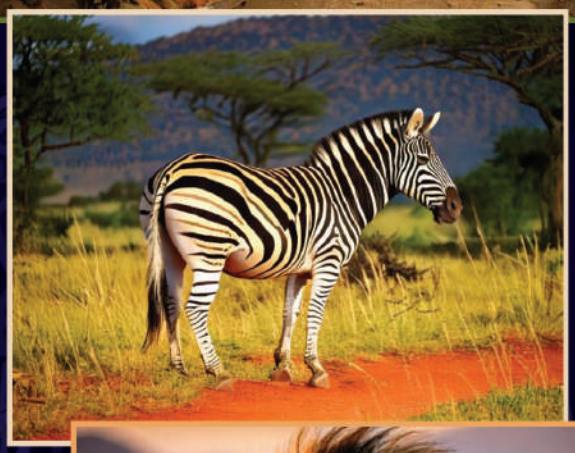

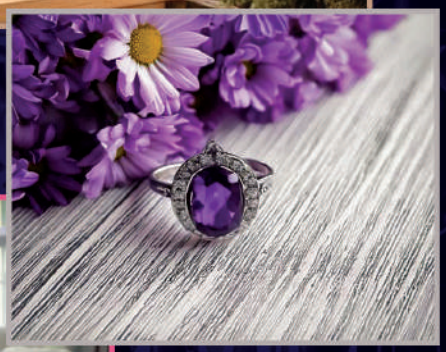

এখানে কিছু সম্পূর্ণভাবে AI দ্বারা (ক্যামেরা ছাড়া) তৈরি ছবি দেওয়া হয়েছে এবং সঙ্গে কিছু ওয়েব লিংকও সংযুক্ত করা হয়েছে।

https://www.adobe.com/products/firefly.html

https://gencraft.com/?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI27mMiva-jiQMV8qRmAh30bQ4wEAAYAiAAEgL8N_D_BwE

https://www.midjourney.com/home

Different Activities of ISI Club

Different Activities of ISI Club

Different Activities of ISI Club

Different Activities of ISI Club

ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট ক্লাব
২০৩, বি. টি.রোড ,কলকাতা -৭০০১০৮

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪

আই. এস. আই. ক্লাবের ৬৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার প্রাক্কালে কার্যকরী সমিতির পক্ষ থেকে আমরা সকল সদস্য ও সদস্যাদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। বিগত বছরগুলিতে যে সমস্ত সদস্য / সদস্যাদের আমরা চিরকালের জন্য হারিয়েছি তাঁদের এবং দেশের যে সমস্ত কৃতী কলাশিল্পী, ক্রীড়াবিদ ও রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব যাঁরা প্রয়াত হয়েছেন তাঁদের পরিবারবর্গকে জানাই আমাদের আন্তরিক সমবেদনা। করোনা মহামারিতে যে সকল নাগরিক দেশ তথা বিশ্বে প্রাণ হারিয়েছেন ,আই.এস .আই .ক্লাব তাদের প্রতি জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

আন্তর্জাতিক মানের এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কর্মীবন্ধু,ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের নিয়ে আমাদের এই আই.এস .আই .ক্লাব এবং এই ক্লাবের সমস্ত সদস্যদের একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে তা হল আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনকে আরও সমৃদ্ধিশালী ,বর্ণময় ও জীবনমুখী করা। আমরা তাই সবসময় চেষ্টা করি শুধুমাত্র আমরা ক'জন সদস্যই নই, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচী, খেলাধুলা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে আমাদের পরিবারবর্গকেও এই সামাজিক দায়িত্বের অংশীদার করি। তাই এই মূহুর্তে আই.এস.আই ক্লাব প্রতিটি প্রজন্মের সঙ্গে একটা সুন্দর মিলন সেতুর ভূমিকা বহন করে চলেছে ।

বর্তমানে ক্লাবের সদস্য ও সদস্যা সংখ্যা ৪৬৮ জন। এছাড়াও Students, Agency Staff, Deceased Dependent, Contractual Staff, Co-operative staff etc. এদের সহযোগিতায় বছরের পর বছর আই এস আই ক্লাব বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি এবং খেলাধূলা সুষ্ঠভাবে সুসম্পন্ন হয়। আশা রাখি আগামী দিনেও আমরা এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারব।

ক্লাবের বিভিন্ন কর্মসূচী, পৰিকল্পনা ও বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে এই বছর আমরা সাংস্কৃতিক বিভাগে মোট ৪ টি উপাসমিতি এবং ক্রীড়া বিভাগে মোট ৫ টি উপাসমিতি গঠন করি। এই বছরগুলিতে (২০২৩- ২০২৪ এবং ২০২৪-২০২৫) কার্যকরী সমিতির মোট ১১ টি সভা হয়েছে।

আমরা এই ৬৯ তম বর্ষে ক্লাবের তরফ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়েছি। যে সমস্ত কর্মসূচী বিভিন্ন উপসমিতির মাধ্যমে রূপায়ণ করতে পেরেছি তা নিম্নে উল্লিখিত হলো।

সাংস্কৃতিক বিভাগের উপসমিতি

* ছাত্র ছাত্রী এবং গবেষকদের অনুরোধে ০৫/০১/২০২৪ তারিখে একটি Motivational Talk এর আয়োজন করা হয়েছে। প্রধান বক্তা ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন এর স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দজি মহারাজ।

* ২০২২- ২০২৩ এবং ২০২৩-২০২৪ এর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ (০৮/০৮/২০২৪) ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (০৯/০৮/২০২৪) এর আয়োজন যথা সময়ে করা হয়েছে।

*** সঙ্গীত ও সন্তান-সন্ততি উপসমিতি :**

ক) ২৯/১১/২০২৩ এবং ২৭/১০/২০২৪ তারিখে এই উপসমিতির দ্বারা আয়োজিত ক্লাবের বিভিন্ন সদস্য/সদস্যা/ ছাত্র /গবেষকদের দ্বারা পরিবেশিত গান, আবৃত্তি , নৃত্য ইত্যাদির মাধ্যমে ঁবিজয়া সম্মিলনী অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

*** ভ্রমণ উপসমিতি :** এ-বছর এই উপসমিতি (২৭/০১/২০২৪) ব্যারাকপুর গান্ধীঘাট এ বনভোজনের আয়োজন করেছিল। এই বনভোজনে ক্লাবের সদস্য-সদস্যা এবং তাদের পরিবার বর্গের যোগদানে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়। বনভোজনে ২০০ জনের অধিক সদস্য-সদস্যা ও তাদের পরিবারবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

*** রক্তদান উপসমিতি :** এ-বছর এই উপাসমিতি ৬৯ তম রক্তদান শিবিরের (১৭/০১/২০২৪) আয়োজন করে। মোট ৭২ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। আশাকরি, রক্তদানের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা উপলব্ধি করে আগামী বছরগুলিতে রক্তদাতার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে।

*** লেখন উপসমিতি :** বহু প্রতীক্ষার পর সকলের সহযোগিতা নিয়ে এ বছর আমরা আবার লেখন পত্রিকা প্রকাশ করতে চলেছি । এবার লেখনের e -version আই এস আই ক্লাবের website এও সবাই দেখতে পাবেন।

ক্রীড়া বিভাগের উপসমিতি

*** শরীর চর্চা / মাল্টিজিম উপসমিতি:** এই উপসমিতি ক্লাবের মাল্টিজিম ঘরে (রানী কুঠিতে) ছাত্র /ছাত্রী , গবেষক, বিজ্ঞানী এবং সমিতির কর্মী , কর্মী পরিবারবর্গের সদস্যদের নিয়ে প্রশিক্ষক শ্রী অঞ্জন পাল ও রক্ষণাবেক্ষণকারী শ্রী রামলাল প্রসাদ - এর তত্বাবধানে মাল্টিজিম প্রশিক্ষণ সুন্দরভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

*** বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা:** গত ১৬/০২/২০২৪ তারিখে মোট ৪০০ - এর অধিক সদস্য/ সদস্যা, ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক ও worker -দের সন্তান সন্ততিদের মাধ্যমে ক্লাবের ৭০ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সফলভাবে সম্পন্ন হয়। প্রতি বছরের মত Retired worker- দের অংশগ্রহণ বিশেষভাবে প্রশংসার দাবি রাখে।

*বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আই.এস .আই ক্লাবের সভাপতি,সহ সভাপতি ,সহ সম্পাদক ,সাংস্কৃতিক সম্পাদক,ক্রীড়া সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং কার্যকরী সমিতির প্রত্যেকটি সদস্য - সদস্যাকে ।

আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও আই .এস .আই .ক্লাব যেভাবে নানা সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যে দিয়ে বিগত বছরগুলি অতিক্রান্ত করে আসছে তা অন্যান্য অফিস ক্লাবগুলির তুলনায় যথেষ্ট উন্নতমানের ,এই দাবী আমরা করতে পারি। আমরা প্রতিটি কর্মী ও তাদের পরিবারবর্গকে যেভাবে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে একই ছত্রছায়ায় আনতে পেরেছি তাতে আমরা বলতে পারি যে আমরা শুধু একই প্রতিষ্ঠানের কর্মী নই,আমরা সবাই একই পরিবারের। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করেছি সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনাকে সমৃদ্ধ করতে ,আমরা ক্লাব পরিচালনা করতে গিয়ে যে সব ইউনিট -এর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ,সেগুলো হলো - ট্রান্সপোর্ট, অ্যাকাউন্টস, সি.ই. অফিস, ক্যান্টিন, সিকিউরিটি ইউনিট, পি .পি .ইউনিট, ডিন অফ স্টাডিস, অডিও ভিজ্যুয়াল ইউনিট, ডিরেক্টরস অফিস, রিপ্রো ও ফটো ইউনিট ,ই. এম. ইউনিট, এস্টেট অফিস, মেডিক্যাল ওয়েলফেয়ার ইউনিট, ই .সি .এস .ইউ, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট ইত্যাদি। সর্বোপরি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ প্রশাসনের কাছে। সুষ্ঠভাবে ক্লাবকে পরিচালনা ও সমৃদ্ধ করার জন্য আমাদের কিছু প্রস্তাব :

*২০২৩-২০২৪ বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যেমন দাবা , তাস, ক্যারাম, টেবিল টেনিস, PCM Football tournament এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন রবীন্দ্র জন্ম -জয়ন্তী , বসন্ত উৎসব, শ্রুতি নাটক, নাটক ইত্যাদি আর্থিক তহবিলের অনুদানের অভাবে সম্পন্ন করা যায়নি।

* আই এস আই ক্লাবের প্রথাগত রেজিস্ট্রেশনের পুনঃনবীকরণ করার ব্যবস্থা করতে হবে, এছাড়া নথিভুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের প্রয়োজনীয় তথ্যের পুনঃনবীকরণ করতে হবে, এর ফলে ভবিষ্যতে ক্লাবের আর্থিক লেনদেন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হবে।

* আই এস আই ক্লাবের সদস্যের সংখ্যা যে ভাবে বছরের পর বছর কমে যাচ্ছে তাতে আই এস আই ক্লাবের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং খেলেধুলাতে প্রতিযোগীর অভাব দেখা দিচ্ছে। তাই আমরা মনে করি সদস্য / সদস্যার সংখ্যা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করতে হলে Agency Staff, Deceased Dependent, Contractual Staff, Co-operative Staff ইত্যাদি সংস্থার কর্মীদের সদস্য পদে নাম নথিভুক্ত করার প্রস্তাব রাখছি।

* সাংস্কৃতিক সকল বিষয়ের (নৃত্য, সংগীত, নাটক) অনুশীলনের জন্য স্থায়ীভাবে একটি ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে।

* আমাদের একটি ঐতিহ্যশালী খেলা হত সেটি হল টেবিল টেনিস। বর্তমানে স্থান ও টেবিল টেনিস বোর্ডের অভাবে খেলাটি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ আছে। এই খেলাটি পুনরায় চালু করবার জন্য স্থান ও টেবিল টেনিস বোর্ডের ব্যবস্থা করতে হবে।

* সকল ছাত্র/ ছাত্রী/ গবেষক/ অধ্যাপক/ কর্মী বন্ধুদের অনুরোধে আমরা একটি নতুন খেলা (Billiards) চালু করতে চাই। এই কারণে আমাদের Billiards খেলার স্থান ও সামগ্রীর ব্যবস্থা করতে হবে।

* TV দেখবার কোন ঘর নেই। ফলে আমাদের মূল্যবান TV নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেই কারণে TV দেখবার জন্য একটি বড় ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে।

* বিভিন্ন প্রকার সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক সামগ্রী রাখবার জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে।

* আই এস আই ক্লাবের বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য সমস্ত সুবিধাযুক্ত আধুনিক নির্দিষ্ট ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে।

* সমগ্র Gym-এর জায়গাটি মহিলা ও পুরুষদের জন্য আলাদা করতে হবে। সমগ্র জায়গাটি Floor Mat-এর ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও মাইল ও পুরুষদের জন্য Toilet -এর ব্যাবস্থা করতে হবে।

* PCM Football Tournament, Intersection Football Tournament, Cricket Tournament, Volley ball Tournament, Badminton Tournament & Annual Athletic Sports ইত্যাদি খেলা পরিচালনার সময় অসুবিধা হয়। এই কারণে মাঠেরপাশে স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে।

* একটি Swimming Pool -এর ব্যবস্থা করতে হবে।

আমাদের ক্লাবে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা এবং কর্মীদের সন্তান-সন্ততিরা অংশগ্রহণ করে। সেই কারণে আমাদের অনুরোধ অংশগ্রহণকারীদের ও ক্লাব পরিচালনার সুবিধার্থে প্রস্তাবিত ঘরগুলি Ground Floor- এ ব্যবস্থা করতে হবে। ঘরগুলি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে ।

আগামী কমিটিতে উপরোক্ত সকল প্রস্তাবগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য আবেদন রাখছি।

সভায় উপস্থিত সকলকে আরও একবার আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি।

ধন্যবাদান্তে

(অমিত দাস)

সাধারণ সম্পাদক

69th Annual Athletics Sports 2022-2023

Position	Event Name	Name
1st	**100 Mtrs. Flat Race**	SARTHAK SARAR
2nd		ARUNAV BHOWMIC
3rd		ARKAPRAVA SANKI
1st	200 Mtrs. Flat Race	DIPTANIL SATRA
2nd		SUVANKAR SAHA
3rd		SARTHAK SARAR
1st	400 Mtrs. Flat Race	ARUNAV BHOWMIC
2nd		DIPTANIL SATRA
3rd		SUVANKAR SAHA
1st	Running High Jump	SARTHAK SARAR
2nd		SUVANKAR SAHA
3rd		SOHAM MAJUMDER

1st	Running Long Jump	MANAS PATTANAYAK
2nd		DIPTANIL SATRA
3rd		ARKAPRAVA SANKI

1st	100 Mtrs. Flat Race (30+ to 45 Years Male)	AKSHAYA KR. GHOSH
2nd		ABHISHEK ROY
3rd		UTSAV CHAUDHURY

1st	Kicking the Football (30+ to 45 Years Male)	PUSPAK CHAKRABORTY
2nd		UJJWAL MONDAL
3rd		RIJU BISWAS

1st	Kicking the Football into the Net (Goal) (30+ to 45 Years Male)	TAPAN SARKAR
2nd		ABHISHEK ROY
3rd		NAYAN MAJEE

1st	Hitting the Target (Cricket Ball) (30+ to 45 Years Male)	ALPIN MONDOL
2nd		SUBHAS ORAON
3rd		BIJAY KR. BALMIKI

1st	Kicking the Football (45+ and above Male)	PRASANTA KR. SAU
2nd		BISWAJIT GHOSH
3rd		TARUN BERA

1st	Breaking the Jar (45+ and above Male)	SWARUP MONDAL
2nd		TARAK KR. TA
3rd		GOURI SANKAR ACHARYA

1st	Kicking the Football into the Net (Goal) (45+ and above Male)	TARAK NATH PANDIT
2nd		CHIRANJIB DEY
3rd		SOUMEN MONDAL

1st	Hitting the Target (Cricket Ball) (45+ and above Male)	PRABIR DAS
2nd		SHYAMAL PATRA
3rd		AJAY KR. DAS

1st	100 Mtrs. Flat Race (18+ to 30 Years Female Including Wards of the Works)	SAHELI DAS
2nd		KASHISH TIBREWAL

1st	Balance Race (Spoon & Marbel) (18+ to 30 Years Female Including Wards of the Works)	DEBARPITA BAG
2nd		SAYANTANI MONDAL
3rd		SAHELI DAS

1st	Balance Race (Spoon & Marbel) (30+ and above Female)	EKTA BHATTACHARYA
2nd		PAYAL SANA
3rd		RINKU MAJUMDER

1st	Needle & Thread Race (30+ and above Female)	EKTA BHATTACHARYA
2nd		SOMA ADHIKARI
3rd		MANASHI MONDAL

1st	Breaking the Jar (30+ and above Female)	SAMPA PAL

2nd		MINU DAS & NUPUR PAL
3rd		SUCHITRA BALAMI

1st	50 Mtrs. Flat Race (Boys & Girls) (Age upto 6 Years)	SOUMIT DAS
2nd		ARAV MALLICK
3rd		SHIVAM TANTI

1st	50 Mtrs. Orange Race (Boys & Girls) (Age upto 6 Years)	HRITIK KUMAR
2nd		SOUMIT DAS
3rd		SHIVAM TANTI

1st	75 Mtrs. Flat Race (Boys) (Age 6+ to 10 Years)	RAJIB MAHATO
2nd		AYUSH BISHOI

1st	75 Mtrs. Orange Race (Boys) (Age 6+ to 10 Years)	RAJIB MAHATO
2nd		AYUSH BISHOI

1st	100 Mtrs. Sum Race (Girls) (Age 10+ to 14 Years)	SRIJANI DUTTA
2nd		TAPASHYA PAL
3rd		SUVAMITA PORE

1st	100 Mtrs. Flat Race (Girls) (Age 10+ to 14 Years)	TAPASHYA PAL
Consolation		SRIJANI DUTTA

1st	Kicking the Football into the Net Goal (Boys) (Age 14+ to 18 Years)	AVHAY MALLICK

1st	Eating the Fuchka (For Female)	SUMEDH GHOSH
2nd		NILIMA PAUL
3rd		ARUNIMA DAS

1st	Musical Chair (For Female Including Worker's Wife)	SAMPA PAL
2nd		SUCHITRA BALAMI
3rd		RINKU MAJUMDER

1st	Musical Ball (For Female Including Worker's Wife)	RUPA DEVI
2nd		NILIMA PAUL
3rd		MINU DAS

1st	50 Mtrs. Slow Race for Male	RITES KR. TIWARY
2nd		SUDHANSHU MALLICK
3rd		SWARUP GHARA

1st	Scooter/Motor Cycle Race (Jig-Jag) (For Male)	CHANDA SEKHAR DAS
2nd		TAPAS BASU
3rd		RAJESH NATH

1st	Throwing the Ball (Shot Put) (For Male)	AVINASH BHAWNANI
2nd		SOUMYA DAS
3rd		TAPAS BASU

1st	Kicking the Football into the Net (Goal) (ISI Retired Worker's)	RAJAT KANTI CHATTERJEE
2nd		PRABIR KR. CHATTERJEE

1st	Hitting the Target (Wicket) (ISI Retired Worker's)	RABINDRA NARAYAN DAS
2nd		VIJOY OJHA
3rd		BHOLANATH PAL

1st	Walking (400 Mtrs.) Retired worker's	SASANKA SEKHAR

1st	Relay Race (100×4)	SARTHAK TEAM
2nd		DIPTANIL TEAM
3rd		CHANDRA TEAM

1st	Intersection Football Tournament	BOYS C
2nd		BOYS B

1ST	Sit & Draw (Section A)	KRITI SAHOO
2nd		AYUSH MISHRA
3rd		SOUMIT DAS & PROSIDDHA BANERJEE

1ST	Sit & Draw (Section B)	OISHI CHAKRABORTY & DEBANJANA DAS

1ST	Sit & Draw (Section C)	AMRITA DAS & RESHMI ORAON
2nd		NAINA VERMA & PRAMUGDHA BANERJEE
3rd		MEGHNA DUTTA & SUBHAMITA PORE

1st	Recitation (Section A)	KRITI SAHOO
2nd		PRACHURJYO BERA
3rd		PROSIDHYA BANERJEE

1st	Recitation (Section B)	AARSHI MUKHERJEE

1st	Recitation (Section C)	PARAMUGDHA BANERJEE
2nd		MEGHNA DUTTA
3rd		SUBHAMITA PORE

1st	Intersection Volleyball Tournament	CRYPTOLOGY SOUMYA CAPTAIN
2nd		R.S SANDEEP CAPTAIN

1st	Intersection Cricket Tournament	EMU
2nd		RC BOSE

1st	Intersection Batminton Tournament (Men Singgle's)	SOHAM MAJUMDER
2nd		SOUMYA DAS

1st	Intersection Batminton Tournament (Men Double's)	NIKHIL ANAND & TEJAS PUJARI
2nd		ARUN A & PRATUSH KUMAR SAHOO

1st	Intersection Batminton Tournament (Women Singgle's)	SEMANTHI DUTTA
2nd		DIKSHITA SATPATHY

1st	Intersection Batminton Tournament (Mixed Double's)	NIKHIL ANAND & SERENE RASHEED
2nd		NITHYADEV ALL & SEMANTHI DUTTA

70th Annual Athletics Sports 2023-2024

Position	Event Name	Name
1st	**100 Mtrs. Flat Race (18+ to 30 Years Male Including Wards of the Works)**	SARTHAK SARKAR
2nd		TANMAY KARMAKAR
3rd		ARUN A
1st	**200 Mtrs. Flat Race (18+ to 30 Years Male Including Wards of the Works)**	TANMAY KARMAKAR
2nd		ARUN A
3rd		SUVANKAR SAHA
1st	**400 Mtrs. Flat Race (18+ to 30 Years Male Including Wards of the Works)**	ARUNAV BHOWMIC
2nd		ARUN A
3rd		MANAS PATNAYAK
1st	**Running High Jump (18+ to 30 Years Male Including Wards of the Works)**	SARTHAK SARKAR
2nd		AASHIRWAD MOHAPATRA

1st	**Running Long Jump (18+ to 30 Years Male Including Wards of the Works)**	TANMAY KARMAKAR
2nd		AASHIRWAD MOHAPATRA
3rd		SARTHAK SARKAR

1st	**100 Mtrs. Flat Race (30+ to 45 Years Male)**	AKSHAYA KR. GHOSH
2nd		SUNEET GUPTA
3rd		PRAVEEN KUMAR

1st	**Kicking the Football (30+ to 45 Years Male)**	UJJWAL MONDAL
2nd		JAYANTA KR. MISHRA
3rd		LAMIN FADERA

1st	**Kicking the Football into the Net (Goal) (30+ to 45 Years Male)**	LAMIN FADERA
2nd		ABDOUL RACHID ALIO MAHAMANE
3rd		RIJU BISWAS

1st	**Hitting the Target (Cricket Ball) (30+ to 45 Years Male)**	CHANDAN ORAN
2nd		DESTA YOHANNIS HEMADE
3rd		PANCHANAN TANTI

1st	**Kicking the Football (45+ and above Male)**	SUJAN DUTTA
2nd		CHANDRA SEKHAR DAS
3rd		BISWAJIT GHOSH

1st	**Breaking the Jar (45+ and above Male)**	SHIO SHANKAR YADAV
2nd		RAJESH NATH
3rd		TAPAS BASU

1st	**Kicking the Football into the Net (Goal) (45+ and above Male)**	TANMOY DAS
2nd		SATYA NARAYAN ORAON
3rd		TARAK NATH PANDIT

1st	**Hitting the Target (Cricket Ball) (45+ and above Male)**	BIRJU MALLICK
2nd		DILIP GHOSH & PRASANT PAUL
3rd		AJAY KR. DAS

1st	**100 Mtrs. Flat Race (18+ to 30 Years Female Including Wards of the Works)**	PRIYANKA JANA
2nd		SRIJANI DUTTA
3rd		SUPARNA DAS

1st	**Throwing the Ball (Shot Put) (18+ to 30 Years Female Including Wards of the Works)**	**SNEHA TIWARI**
2nd		**PRITI PARAMANICK**

1st	**Balance Race (Spoon & Marbel) (18+ to 30 Years Female Including Wards of the Works)**	**SNEHA TIWARI**
2nd		**CHANDRADIPA NAG**
3rd		**DIPANKANA BANERJEE**

1st	**Balance Race (Spoon & Marbel) (30+ and above Female)**	**MI SI SI SAN**
2nd		**MANASHI MONDAL**
3rd		**RINKU MAJUMDER & ELIZABETH MBATHA**

1st	**Needle & Thread Race (30+ and above Female)**	**MANASHI MONDAL**
2nd		**MI SI SI SAN**
3rd		**NUPUR PAL**

1st	**Breaking the Jar (30+ and above Female)**	**RINKU MAJUMDER**
2nd		**SAMPA PAL**
3rd		**MINU DAS & ELIZABETH MBATHA**

1st	**50 Mtrs. Flat Race (Boys & Girls) (Age upto 6 Years)**	**SHIVAM TANTI**
2nd		**PRACHURJYO BERA**
3rd		**CHIRAG SINGH BISHT**

1st	**50 Mtrs. Orange Race (Boys & Girls) (Age upto 6 Years)**	**SHIVAM TANTI**
2nd		**LAKSHMAN KUMAR**
3rd		**TANUJA SAMANTA**
Consolation		**CHIRAG SINGH BISHT**
Consolation		**PRACHURJYO BERA**
Consolation		**REYANSH MALLICK**

1st	**75 Mtrs. Flat Race (Boys) (Age 6+ to 10 Years)**	**SUBHRA PORE**
2nd		**NAMAN KUMAR**
3rd		**SRIJAN MOHANTA & SAUMIT DAS**

1st	**75 Mtrs. Orange Race (Boys) (Age 6+ to 10 Years)**	**SUBHRA POREY**
2nd		**SRIJAN MOHANTA**

3rd		**NAMAN KUMAR & SAUMIT DAS**

1st	**75 Mtrs. Flat Race (Girls) (Age 6+ to 10 Years)**	**DISHA BISHT**
Consolation		**AYUSH MISHRA**
Consolation		**AHANA BANIK**

Consolation	**75 Mtrs. Orange Race (Girls) (Age 6+ to 10 Years)**	**DISHA BISHT**
Consolation		**AHANA BANIK**

1st	**100 Mtrs. Flat Race (Boys) (Age 10+ to 14 Years)**	**NAITIK THAKUR**
Consolation		**SRIJAN MOHANTA**
Consolation		**RAJIB MAHATO**
1st	**100 Mtrs. Race (Girls) (Age 10+ to 14 Years)**	**SRIJANI DUTTA**

	100 Mtrs. Sum Race (Boys & Girls) (Age 10+ to 14 Years)	**SRIJANI DUTTA**

1st	**Eating the Fuchka (For Female)**	**MINU DAS**
2nd		**MANASHI MONDAL**

3rd		**NUPUR PAL**

1st	**Musical Chair (For Female Including Worker's Wife)**	**SAMPA PAL**
2nd		**ARCHANA KUMARI SHAW**
3rd		**PAYAL SANA**

1st	**Musical Ball (For Female Including Worker's Wife)**	**PRITI PARAMANICK**
2nd		**RUKMINI SHAW**
3rd		**SUNITA ORAON**

1st	**50 Mtrs Slow Cycle Race (For Male)**	**SAMIR DAS**
2nd		**ABDUR RAHAMAN**
3rd		**PRATYUSH KR. SAHOO**

1st	**Scooter/Motor Cycle Race (Jig-Jag) (For Male)**	**TAPAS BASU**
2nd		**ABDUR RAHAMAN**
3rd		**RAJESH NATH**

1st	Throwing the Ball (Shot Put) (For Male)	ABHIDEEP MITRA
2nd		TAPAS BASU
3rd		ABHISHEK ROY

1st	Kicking the Football into the Net (Goal) (ISI Retired Worker's)	BHOLANATH PAL
2nd		TAPAN DHARA
3rd		RABINDRA NATH DAS

1st	Hitting the Target (Wicket) (ISI Retired Worker's)	SANTOSH KUMAR MONDAL
2nd		BHOLANATH PAL
3rd		TAPAN DHARA

1st	Walking (400 Mtrs) (ISI Retired Worker's)	SASANKA SEKHAR SAHOO
2nd		SANTOSH KUMAR MONDAL

1st	Go-as-you-like (Open to All)	DEBANJANA DAS
Consolation		TAPASYA PAUL
Consolation		PRACHURJYO BERA

LIST OF BLOOD DONORS, 2023-24

Sl. No.	NAME
01	GOBINDA BHATTACHARYA
02	PUSPAK CHAKRABORTY
03	SHOVAN KHATUA
04	SATADAL SAWDAGAR
05	SANDEEP
06	SOURAV CHAKRABORTY
07	CHIRANJIB DEY
08	DEBANJAN CHAKRABORTY
09	CHANDRA SEKHAR DAS
10	RAJIB SARKAR
11	SOUMENDRA NATH BHUNIA
12	KHUSHAL TUNGHARE
13	VAIBHAV SHEKHAR
14	PRITAM BHATTACHARJEE
15	VINEET KUMAR
16	SANJU
17	SOMENATH DAS
18	NUSHRAT HUSSAIN
19	TUSHAR KANTI DAS
20	PRIYA GUPTA
21	BIMAN ROY
22	SATYA NARAYAN ORAON

23	PARTHA BHATTACHARJEE
24	ARGHYA MANDAL
25	SAUVIK BHATTACHARJEE
26	SEEMANTA PAUL
27	AISHIK CHANDA
28	MRITTIKA CHAKRABORTY
29	ASHMITA DEY
30	PAULOMEE GUHA
31	NAYAN CHANDRA MAJEE
32	SOVAN MONDAL
33	DHRITI SUNDAR DANDAPAT
34	ANIL GHOSH
35	SATYAJIT DASGUPTA
36	PRIYOBRATA MONDAL
37	DIPRANJAN PAL
38	ALPIN MONDAL
39	ADITYA SHANKAR PAL
40	YASH JAIN
41	RITESH HELA
42	RAJIB BARDHAN
43	PUSPAL KUNDU
44	AMAN SINGH
45	AVIK MITRA
46	PRABIR KR CHAKRABORTY

47	SUBRATA BANERJEE
48	AMIT DAS
49	SNAKAR ROY
50	ABHISHEK MAITY
51	ARUN SOUMYA BASU
52	SUDESHNA MITRA
53	GOURAB NATH
54	MANAS KR PAN
55	NEERAJ KR SINGH
56	DEBANJAN DUTTA
57	SANKARSAN SEAL
58	SHUBHRA SANKAR ROY

ISI

Co-operative Credit Society Ltd.

Enjoy the stay on cheapest rate

PURI

Hotel New Blue View

Renuka Lane, Swargadwar, Puri - 521001

We are offering three (03) double beded airconditioned rooms near sea beach.

Contacts

Office: (033)-2575-3083, Mobile: 8017160433, 9038075153

INDIAN STATISTICAL INSTITUTE CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

203 B.T. Road, Kolkata - 700108

(Registered under the Multi State Co-operative Societies Act, 1984)

Regd. No.CR-7 of 2nd August 1975

Indian Statistical Institute Club

Executive Committee, 2023-2024